

রাহুল সাংকৃত্যায়ন



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

ইরান

রাহুল সাংকৃত্যায়ন



সাইটলিট লিমিটেড
১২ বক্সিং চ্যাটার্জী হটেল • কলকাতা ৭০০০৭৩

IRAN
Bengali translation of Rahula Sankrityayan's travelogue
Iran

© কমলা সাংকৃত্যায়ন

অনুবাদ
মলয় চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ
আগস্ট ২০০৩ শ্রাবণ ১৪১০

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অক্ষর বিন্যাস
কম্পোজিট
৩৪/২ বাজে শিবপুর রোড, হাওড়া ৭১১ ১০২

মুদ্রাকর
ইমপ্রিন্ট
দূরভাষ : ২৪৪১-৩৫২৩

প্রচ্ছদ
রাহুল কুণ্ডু

ISBN 81-85696-53-5

দাম : ৪০.০০ টাকা
(Rs. 40.00)

বিষয় সূচি

প্রাক কথন ... ৭

গ্রন্থপ্রসঙ্গে ... ৯

প্রাচীন ইরান [১১ - ৪৪]

আরম্ভিক কাল ... ১১

মদ্রবংশ ... ১২

অখামেনশী বংশ ... ১৪

ইউনানি (গ্রিক) শাসন ... ২০

অশকানি বংশ ... ২৪

সাসানি বংশ ... ২৮

অনু-ইরানী ইরান ... ৩৬

ইরানী রাজবংশ ... ৪১

নবীন ইরান [৪৫ - ৯০]

বাকু থেকে ফেরা ... ৪৫

তেহরান ... ৪৮

ইস্পাহানে ... ৫০

সিরাজ ... ৬১

তেহরানে ফেরা ... ৬৬

মশহদে ... ৭১

ভারতে ... ৮৪

ইরানে দ্বিতীয়বার [৯১ - ১০৫]

ইরানে তৃতীয়বার [১০৬ - ১২৭]

প্রাক কথন

১৯৩৪ সালে জাপান থেকে সোবিয়ত প্রজাতন্ত্র হয়ে ফেরার পথে আঠাশদিন (১২ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর) আমি ইরানে ছিলাম। সেই ভ্রমণ এত তাড়াহুড়ো করে শেষ করতে হয়েছিল যে, ইরানে প্রধান সমস্ত জায়গা ও ইরানীদের জীবনযাত্রার সমস্ত দিক দেখে উঠতে পারিনি। এজন্য এই ভ্রমণচিত্র সুন্দর নাও হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই ভ্রমণলিপি লেখা আরম্ভ করি ফিরে আসার এক বছর পর। ততদিনে কিছু স্মৃতি ঝাপসা হতে শুরু করেছিল। আধুনিক ইরানের জাগৃতির পিছনে ইরানের প্রাচীন ইতিহাসের অবদান প্রচুর। এজন্যই গ্রন্থের প্রথম ভাগে সেই ইতিহাসকেই সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। গ্রন্থটি পড়ে পাঠকদের মনে হতে পারে, যে লেখক বড়ো বেশি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করেছেন, কিন্তু যেটুকু সময় আমার কাছে ছিল, তাতে এর চেয়ে আরও উন্নত কিছু করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ অবসর পেলে লিখব, এই ভেবে যদি ফেলে রাখতাম, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াত, বইটি কোনোদিনই না লেখা। *

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে লেখক তৃতীয়বার ইরানে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সেই ভ্রমণলিপি তাঁর আত্মজীবনী 'মেরি জীবন-যাত্রা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সেই ভ্রমণ বৃত্তান্তটিও এই গ্রন্থে সংযোজিত হলো।

প্রকাশক

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

ইরান ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন প্রতিবেশী দেশ। অখণ্ড ভারতবর্ষের সঙ্গে তার অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে অভিন্ন সীমান্ত ছিল। ভারতের শিল্প সংস্কৃতিতে পারসিক তথা ইরানীদের অবদানের কথা আমাদের জানা। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই প্রতিবেশী দেশে তিনবার ভ্রমণ করেছেন। তাঁর প্রথম বারের ইরান যাত্রা হয়েছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ফেরার পথে আজারবাইজানের রাজধানী বাকু হয়ে কাস্পিয়ান সাগর নামের বিশাল হ্রদটিকে জাহাজে পার করে ইরানের পহলবী বন্দরে এসে নেমেছিলেন। ফিরেছিলেন অবিভক্ত ভারতের বালুচিস্তানের বোলান গিরিপথ হয়ে ক্বেয়েটার পথে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার ইরান ভ্রমণের সময় রাহুলজি বালুচিস্তানের পথটিকেই বেছেছিলেন, তিনি তাঁর প্রথম দুবারের ইরান ভ্রমণের কাহিনি নিয়ে ‘ইরান’ নামের গ্রন্থপ্রকাশ করেন যেখানে নিছক ভ্রমণ ছাড়াও ইরানের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর তৃতীয় ইরান ভ্রমণ কাহিনি সংকলিত হয়েছে তাঁরই জীবনী মূলক গ্রন্থ ‘মেরি জীবন যাত্রা’তে। ইরানের সুদীর্ঘ ইতিহাসকে রাহুলজি প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে তাঁর ভাষায় মহান ইরানী রাজবংশ, যাদের পতাকা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বহুকাল ধরে উড্ডীন ছিল। দ্বিতীয় খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে ইসলামিক আগ্রাসনের পরবর্তী কালের ইরান, এবং তৃতীয় রজা শাহর শাসনকালের নবীন ইরান। গ্রিক আক্রমণের মুখে ইরান বহুকালের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ছিল কিন্তু তার সংস্কৃতি, সভ্যতা যেভাবেই হোক অটুট ছিল, এবং গ্রিক পরবর্তী কালে তার ওপরে ভিত্তি করে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। কিন্তু ইসলামি আক্রমণে ইরান শুধুমাত্র তার রাজনৈতিক স্বাধীনতাই হারায়নি, হারিয়েছিল তার ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি সব কিছু। ইরানিরা সংখ্যাগুরু ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মতবাদ ‘সুন্নি’ মত পরিত্যাগ করে ‘শিয়া’ মতবাদ গ্রহণ করেছে, এমনকি তাদের ‘খোদা’ শব্দটি আল্লাহ শব্দের সমর্থক রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জেনারেল রজাশাহ ইরানের শাসন ক্ষমতা অধিকার করে এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই রাজবংশকে ঐতিহাসিক ‘অখামেনশী’ কিংবা ‘সাসানী’ বংশের উত্তরসূরী বলে ঘোষণা করেন। দেশের সর্বত্র বিশেষ করে প্রশাসনিক স্তরে আরবি ভাষাকে দূরে সরিয়ে ফারসি ভাষাকে মর্যাদা দিতে থাকেন এবং সমাজজীবন থেকে ইসলামি কট্টরপন্থা দূর করার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি পুরুষদের পাগড়ির বদলে বাধ্যতা মূলকভাবে হ্যাট পরার নিয়ম চালু করেন এবং মেয়েদের বোরখার অঙ্ককার থেকে মুক্ত করেন। বিভিন্ন শহর পুনর্গঠন ও রাস্তা তৈরির প্রয়োজনে অসংখ্য কবর মাজার উচ্ছেদ করেছেন, অনেক মসজিদ ভেঙেছেন। কট্টরপন্থীরা বাধা সৃষ্টি করলে সৈন্যবাহিনী দিয়ে তাদের মোকাবিলা করেছেন। ইরানের তবুগ সমাজ নতুন জাতীয়তাবোধের আবেগে তাঁর পিছনে জড়ো হয়েছিল। ধর্মকে একান্তভাবে ব্যক্তিগত বিষয় করে তিনি মহরমের সময় প্রকাশ্যে সাময়িকভাবে বুক চাপড়ানো কিংবা মেয়েদের কৃত্রিম কাল্পনা ইত্যাদি বে-আইনী ঘোষণা করেছিলেন। ধর্ম পালনের বিষয়ে মেয়েরাও তখন কিরকম অবোধে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করত তার একটা চমৎকার উদাহরণ এক কথোপকথন

থেকে রাহুলজি উদ্ধৃত করেছেন। রমজান মাসের রোজার উপবাস প্রসঙ্গে জনৈক ইরানী রমণীর উক্তি— ‘পুরুষেরা রোজা পালন করতে চায় করুক, মরার পর বেহেস্তে গিয়ে অনেক হুবী পরী পাবে কিন্তু মেয়েরা রোজা রাখতে যাবে কেন? নিরানব্বইটা সতীন নিয়ে ঘর করার জন্য?’ রজা-শাহর আমলে ইরানে বিবাহে প্রাক ইসলাম যুগের ইরানে প্রচলিত প্রথা আবার চালু হয়েছিল, ইসলামের দেব-দেবী বিরোধিতাকে অস্বীকার করে প্রচণ্ড শীতে ইরানী ছেলে মেয়েরা সূর্যদেবীর কাছে রোদদুর প্রার্থনা করত। শাসন ব্যবস্থা ছিল অভিজাত যেঁসা স্বৈরতন্ত্র। জনগণের অধিকার বলে কিছু ছিল না। প্রতিবেশী সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তিনি ভীত ছিলেন, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি অক্ষশক্তির প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে ফেলেন। ফলে তাঁকে রাজ্য ছাড়া এবং দেশ ছাড়া হতে হয়, যদিও তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশটি টিকে যায়, বলা বাহুল্য অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায়। প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। ইতিহাসের চাকা পিছনে গড়াতে থাকে, ফিরে আসতে থাকে ইসলামি কটরপন্থা, বোরখা ইত্যাদি। এরকম সময়ে রাহুলজি তৃতীয়বার ইরান যান। এই পর্যায়ে তিনি দীর্ঘকাল এক ইরানী পরিবারের অতিথি হয়ে বাস করেন, যার ফলে সেই সময়ের সমাজের প্রকৃত চিত্র সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের ‘ইরান’ এক ভ্রমণ কাহিনি ছাড়াও ইরানের ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থার মূল্যবান দলিল।

প্রাচীন ইরান

আরম্ভিক কাল

ভৌগোলিক দিক থেকে ইরান দেশটি তিন ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণের সাগরতট অঞ্চল বেশ উষ্ণ। মধ্যভাগ পার্বত্য মালভূমি যার উচ্চতা কোথাও কোথাও তিন থেকে পাঁচ হাজার ফুট এবং এই উচ্চতার জন্যই সেখানে বেশ ঠান্ডা। চারদিকে পর্বতমালা বেষ্টিত থাকার জন্য মেঘের অনায়াস যাতায়াত পথ এখানে বৃদ্ধ, তাই বর্ষাও এতদঞ্চলে কম। এই সমতল এলাকা তেহরানে, সমুদ্রতট থেকে তিনহাজার ফুট উঁচু, আবার দক্ষিণের সিরাজ ও উত্তর পশ্চিমের তব্রিজ নগরে চারহাজার ফুট উঁচু। উত্তরের গিলান ও মাজেন্দরানের এলাকা, যার অবস্থান কাস্পিয়ান সমুদ্রতটে হওয়ার জন্য অনেক বেশি শ্যামল-সবুজ এবং ৩৫°-৩৬° অক্ষাংশে থাকার জন্য সেখানকার আবহাওয়াও ঠান্ডা। এছাড়া চতুর্থ একটা ভাগও আছে, যাকে আজারবাইজান বলা হয় এবং ওই অঞ্চলটি ককেশাস (কোহকাফ) পর্বতশৃঙ্খলারই একটি অংশ।

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে ইরানে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল দক্ষিণের সমুদ্রতট ভূমিতে। এখানকার অধিবাসীদের ওপরে বাবুল এবং অসুর (আসিরিয়) সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল। সেই সময়, মধ্য ইরানের উচ্চ মালভূমি অঞ্চল ভবঘুরে পশুপালকদের চারণভূমি ছিল। দক্ষিণ ইরানের মানুষ কিন্তু তখন, কৃষিকাজ ও নাগরিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। যারা এই দেশের নাম দিয়েছিল ইরান, সেই জাতি, ইন্দো-ইরানী জাতি গোষ্ঠীর পশ্চিমের শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এই জাতি, প্রথমে মধ্য ইরানের সমতল ভূমিতে তাদের বসতি গড়ে তোলে এবং পরবর্তী কালে তারাই ইরানী সভ্যতার ধারক ও বাহক রূপে পরিচিত হয়।

আদিম ইরানী জাতি কখন, কোথা থেকে এসেছিল সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, এই সমগ্র জাতি, যাদের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার প্রচুর মিল দেখতে পাওয়া যেত, এবং এদের মধ্যে ভারতীয়, ইরানী ও ইউরোপীয় জাতির মানুষও সামিল ছিল। তারা বহুকাল একই অঞ্চলে বাস করত। যদিও তাদের মধ্যে ইউরোপীয় গোষ্ঠী নিজেদের জন্য 'আর্য' শব্দটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেনি, আবার ইরানী ও ভারতীয় গোষ্ঠী ওই শব্দটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে, তবুও আমরা সুবিধার জন্য সকলকেই আর্য বলে মেনে নেব। আর্যদের আদিভূমি ছিল দক্ষিণ রুশ থেকে পামির অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এটা ছ-হাজার বছর আগেকার ঘটনা। তখন সমস্ত আর্যরা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে নিজেদের ছাগল-ভেড়া-গোবু-ঘোড়া নিয়ে ওই অঞ্চলে বিচরণ করত। পাঁচ হাজার বছর আগে তারা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একভাগ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় এবং তারা জীবনের প্রতি পদে পদে 'আর্য' শব্দটিকে ব্যবহার করতেন। এদের বংশধরেরাই ইরানী এবং ভারতীয় আর্য। চার হাজার বছর আগে এই পূর্বা আর্যরাও দুভাগে ভাগ হয়ে একদল ইরানে এবং অন্যদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। যেখান থেকে আর্যরা দুভাগে ভাগ হয়েছিল সেটা বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের হিরাত।

মদ্রবংশ (৬৫০ - ৬৪৪ খ্রিঃ পূঃ)

ইরানী আৰ্যদের প্রাচীন দুটো শাখার মধ্যে একটি হলো পশু (পারসি) এবং আরেকটি মদ্র (medes)। পারসিরা ইরানের দক্ষিণ ভাগকে নিজেদের নামে চিহ্নিত করে এবং আজ পর্যন্ত ওই অঞ্চল ‘সুবা ফারস’ নামে পরিচিত। ইরানী উচ্চারণে অবশ্য পারস বলা হয়। আরবি লিপিতে ‘প’ অক্ষরের অভাবে ‘ফারস’ উচ্চারিত হয়। আরবি ভাষায় যথোপযুক্ত শব্দের অভাবে অনেক ইরানী শব্দের উচ্চারণেই গণ্ডগোল বাধে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় — যেমন প্রকৃত উচ্চারণ ‘গিলান’ কিন্তু আরবিতে হয়েছে ‘জিলান’। ইরানের নাম আগে ছিল পারস (পারস্য), কিন্তু যেহেতু এই নামে ইরানেরই একটি প্রদেশ আছে, সেজন্য সমগ্র দেশের পক্ষে ওই নাম যথার্থ নয় মনে করে; নতুন নাম রাখা হয় ইরান। ইরানকে পারস্য বলার অভ্যাস ইওরোপীয়রা গ্রিকদের কাছ থেকে পেয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পারস কিংবা পারসিক শব্দের দেখা মেলে। ইরানের দুই প্রভাবশালী রাজবংশ অখামেনশী এবং সাসানি, উভয়েরই শাসনকেন্দ্র ছিল পারস প্রদেশে এবং তারা দেশের ওই নামই রেখেছিল। ভারতীয়দের সম্বন্ধে ‘হিন্দু’ শব্দের প্রয়োগ ইরানীরাই সর্বপ্রথমে করে ছিল। সিদ্ধু নদের তটভূমি অঞ্চলে বাস করার জন্য, তারা ভারতীয়দের নদীর নামেই নামকরণ করেছিল। কিন্তু উচ্চারণ বিভ্রাটে ‘স’-এর জায়গায় তারা ‘হ’ শব্দ ব্যবহার করত।

পারসিক প্রাধান্যের আগে ইরানে মদ্রদের প্রাধান্য ছিল। মদ্রদের রাজধানীর নাম ছিল ইখওয়াতন যার বর্তমান নাম হামদান। অসুর সাম্রাজ্য খুব কাছে থাকায় এখানেই সভ্যতার বিস্তার আরম্ভ হয়। পরবর্তী কালে ইরানীরা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে আরম্ভ করে এবং একসময় সেই সাম্রাজ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ইওরোপ, এই তিন মহাদ্বীপ জুড়ে প্রসারিত হয়।

জরদুস্ত (জরথুস্ত্র)—মদ্রদের সম্বন্ধে কিছু বলার আগে জরদুস্ত অথবা জরথুস্ত্র এবং তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ ইরানে যতদিন পর্যন্ত, ইরানীদের নিজেস্ব শাসন ছিল ততদিন পর্যন্ত সমাজ জীবনে জরথুস্ত্রের মতবাদের বিশাল প্রভাব ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৬৬০ সালে, বুদ্ধের জন্মের একশো বছর আগে ককেসাস পর্বতমালা বেষ্টিত আজারবাইজান প্রদেশে জরথুস্ত্রের জন্ম হয়। জরথুস্ত্র তৎকালীন প্রচলিত ধর্মমতগুলোর কিছু কিছু মতকে যার মধ্যে ভারতবর্ষের বৈদিক ধর্মও ছিল — সরিয়ে নিজের এক স্বতন্ত্র চিন্তাধারার প্রয়োগ করেন। অনেক বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও যজ্ঞ, সোম ইত্যাদি বিষয়ে বৈদিক ধর্মের সঙ্গে জরথুস্ত্রের মতবাদের কিছু মিল ছিল। তিনি মনে করতেন যে ভালোত্বের প্রবাহ যেমন অর্জুঁর-মজদা (অসুর মেঘ)-তেমনই মন্দত্বের প্রবাহ হল অয়মেন্যু (অহমান)। এই অহমানই পরবর্তী কালে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলমান ধর্মে শয়তান নামে পরিচিত হয়েছে। জরথুস্ত্রের মতবাদ বুদ্ধ জন্মেরও একশো বছর আগে প্রচারিত হয়েছিল। এবং বর্তমানে তাঁর মূল গ্রন্থের সামান্য কয়েকটি গাথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যেগুলো জরথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার একটি ভাগ। সব ধর্মের পয়গম্বরদের মতো তিনিও বলতেন যে, তিনি জ্ঞান লাভ করেছেন, এলহামের (শেষ বাণী) মাধ্যমে আর্জুঁর-মজদার কাছ থেকে। তাঁর প্রধান বাণী হলো হুমত (সুমত = সত্য মনন) হুখত (সুকত = সত্যবচন) এবং হবস্ত (সুকৃত) অর্থাৎ কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক এই তিন ক্ষেত্রে সত্যকে অবলম্বন করা। জরথুস্ত্র প্রথমে তাঁর নিজের দেশে ধর্মমত প্রচারে বিশেষ সাফল্য পাননি। তখন তিনি পূর্ব ইরানের খোরাসান প্রদেশে চলে যান এবং সেখানকার রাজা বিস্তাস্পকে (শাহনামা মতে গুস্তাস্প) তাঁর ধর্মে দীক্ষিত

করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে এই বিস্তার্ত্ত এবং প্রথম দারায়োশের পিতা হিষ্টার্প্প একই ব্যক্তি।

মদ্রদের দেশ প্রথম দিকে আসিরিয় সাম্রাজ্যের একটা অংশ ছিল। অসুরেরা বহুবার মদ্রদের ওপরে হামলা চালিয়েছে। সর্বশেষ হামলা হয়েছিল অসুররাজ হদনের সময়ে। খ্রিস্টপূর্ব ৬৭৪ সালে। হদন পাহাড়ি চড়াই অতিক্রম করে দমানন্দ পর্বত (তেহরানের কাছে) পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

মদ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়উক্কু (দেবক) মদ্রদের একজন গোষ্ঠীপতি ছিলেন। ন্যায়ের জন্য তাঁর সংগ্রামের কাহিনি তাঁর গ্রাম ছাড়িয়ে আরও অনেক গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে লোকে তাঁকে মান্য করতে থাকে। গ্রামবাসীরা নিজেদের কলহ বিবাদ মীমাংসার জন্য তাঁর কাছে যেতে থাকে। এই সমস্ত কাজের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ক্ষতি হতো দেখে দেবক এসমস্ত থেকে কিছুকাল নিজেকে সরিয়ে রাখেন। যথাযথ ন্যায় ব্যবস্থা না থাকার ফলে, গ্রামে অশান্তি শুরু হয়ে গেলো। তখন সকলে মিলে ভাবল — যদি এরকম অব্যবস্থা চলতে থাকে তাহলে দেশে বাস করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। তার চেয়ে আমরা সকলে মিলে যদি একজনকে রাজা বানাই, সে রাজ্যে ন্যায় ব্যবস্থা চালু করবে, আমরাও শান্তিতে আমাদের ঘর সংসার দেখব। অবশেষে সকলে ঐক্যমত্য হয়ে দয়উক্কুকেই রাজা নির্বাচিত করল এবং ইখওয়াতন (হামদান) হল তার রাজধানী। বর্তমান ইরানের প্রাচীনতম শহর হল হামদান, সেখানে এখন মাত্র ত্রিশহাজার লোক বাস করে।

আবেস্তা সম্বন্ধে বলা হয় যে তার ভাষা ছিল মাদ্রী। গ্রিক লেখকেরা লিখেছেন যে মাদ্রীর সঙ্গে পারসি এবং তুয়ারি ভাষার অনেক মিল আছে।

দয়উক্কুর পর খ্রিস্টপূর্ব ৬৪৪ সালে ফার্বর্তিশ রাজা হন। তিনি পারস্যের অনেকটা অঞ্চল জয় করে রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেন। পার্শ্ববর্তী অসুর সাম্রাজ্য মদ্রদের এই প্রগতিককে ভালো চোখে দেখেনি, হয়তো তারা মদ্রদের ওপরে হামলাও করত, কিন্তু ইতিমধ্যে হুয়ছত্র (মৃত্যু ৫৮৪ খ্রিঃ পূঃ) রাজ সিংহাসনে বসেন। হুয়ছত্র মদ্রদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি রাজা হয়েই নিজের সৈন্যবাহিনীকে সুসংগঠিত করতে থাকেন। তিনি ধনুর্ধারি ঘোড়া ও সৈন্যদের নিয়মিত অভ্যাস করিয়ে এত সুনিপুণ করে তুলেছিলেন যে যুদ্ধের সময় অসুর বাহিনী তাঁর সৈন্যদের সামনে ঝিকতেই পারেনি। পরাজিত অসুর সেনাদের পিছু ধাওয়া করে হুয়ছত্র অবশেষে অসুরদের রাজধানী নিনেব অবরোধ করেন। তিনি অসুরদের রাজধানী দখল করতে পারতেন কিন্তু তখনই উত্তর মদ্রে সিথিয়ানরা (শক) উপদ্রব বাধায়। হুয়ছত্রকে এদিককার যুদ্ধ স্থগিত রেখে সিথিয়ানদের দিকে যেতে হলো। সিথিয়ানরা যুদ্ধে পরাজিত হলো। হুয়ছত্র খ্রিস্টপূর্ব ৬০৭ সালে আবার নিনেব অবরোধ করেন। অসুররাজ বীরত্বের সঙ্গে মদ্র আক্রমণ রোধের চেষ্টা করেন, কিন্তু যখন দেখলেন আর কোনো উপায় নেই, তখন এক বিশাল অগ্নিকুন্ড জ্বেলে, সপরিবারে তাতে আত্মাহুতি দেন। নিনেব মদ্রদের অধিকারভুক্ত হলো। নিনেবের পতনের ফলে একদিকে সাম্যীয় সভ্যতার পতন হলো অন্যদিকে আর্যদের ভাগ্যের উত্থান আরম্ভ হলো।

অখামেনশী রাজবংশ

মহান কোরোশ (৫৫০ - ৫২৯ খ্রিঃ পূঃ)

পারসের রাজবংশকে ওই বংশেরই এক প্রভাবশালী গোষ্ঠীপতি অখামেনশ (Achaemenes) এর নামে 'অখামেনশী' বলে উল্লেখ করা হয়। যখন মদ্রদেশে ইস্তবেগ (Astyags) নামে এক দুর্বল শাসক রাজ্যশাসন করতেন, তখনই অখামেনশী কোরোশ (Cyrus) দক্ষিণে নিজের শক্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তখন পারস এবং মদ্রদের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলত এই নিয়ে, যে কে কার ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করবে। অনশন-রাজ কোরোশ তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে মদ্রদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন, এবং খ্রিঃ পূঃ ৫৫০ সালে মদ্র রাজধানী ইখওয়াতনের পতনের মধ্য দিয়ে ইরানে মদ্র শাসনেরও অবসান হয়। খ্রিঃ পূঃ ৫৪৯ সাল পর্যন্ত কোরোশকে অনশনের রাজা বলা হতো। অখামেনশী বংশের দুটি শাখা ছিল, একটি পারস ও অন্যটি অনশন। কোরোশ উভয় শাখাকে একত্রিত করে নিজেকে সমস্ত পারসের রাজা ঘোষণা করেন। পৃথিবীর অন্যান্য মহান বিজেতাদের সঙ্গে কোরোশের নামও গণ্য হয়। রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর কোরোশ আফগানিস্তান ও বালুচিস্তান জয় করে সিন্ধু নদের দিকে আসেন এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের অনেকাংশ জয় করে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পশ্চিমদিকে অনেক ছোট ছোট রাজ্য জয় করে কোরোশ তাঁর রাজ্যসীমা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। উত্তরদিকে তাঁর রাজ্যসীমা বর্তমানের সোবিয়েত তুর্কিস্তান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সেই অঞ্চলেই, যুদ্ধক্ষেত্রে কোরোশের মৃত্যু হয়।

শাহনামাতে ফিরদৌসী ইরানের অনেক রাজা ও রাজপরিবারের কাহিনি লিখেছেন, তার মধ্যে কোরোশ পূর্ব ইরানের কাহিনির অধিকাংশ ভাগই কিংবদন্তিনির্ভর। শাহনামাতে কোরোশের নাম বলা হয়েছে কৈখুশ্রী। কোরোশের রাজধানীর নাম ছিল পর্সোপলিস (পর্শুপুরী)। এক সামান্য গোষ্ঠীপতির পদ থেকে উঠতে উঠতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। কোরোশের মতো অত বৃহৎ সাম্রাজ্য তাঁর আগে কোনো ইরানী শাসক প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে বাবুল আর লিদিয়া রাজ্য ঝড়ের মুখে পড়া কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিল। কোরোশ তিরিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন, এবং অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েও একজন সাধারণ সৈনিকের মতোই সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের কাছে তিনি ছিলেন ভয়ংকর আবার শান্তির সময় তাঁর ব্যবহার এত নমনীয় হতো যে তাঁর অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হওয়া বিদেশিরাও প্রশংসা না করে পারেনি। স্ত্রী কসন্দানীর মৃত্যুতে কোরোশ এতই শোকগ্রস্ত হয়েছিলেন যার তুলনা পাওয়া যায় ভারতীয় কাব্যে যেখানে রাজা অজ, ইন্দুমতীর মৃত্যুতে শোকাবুল হয়ে বিলাপ করেছেন। কোরোশ রাজসভার সভাসদ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ প্রজা, সকলের সঙ্গেই সমব্যবহার করতেন। যতদিন ইরান তার ইরানী রূপ নিয়ে স্বাধীন ছিল ততদিন সাধারণ ইরানবাসীদেরও কোরোশের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা ছিল। ইরানীরা তাঁকে জাতির পিতা এবং মহান আখ্যা দিয়েছিল এবং বর্তমানের নবীন ইরানও তাঁকে গুরুজন (বুজুর্গ) কোরোশ এই নামে স্মরণ করে। ঐতিহাসিক সারিস্বের ভাষায় — আমরা সেই মহান আর্থর জন্য গর্ব বোধ করি, যাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ এবং যাঁর মধ্যে সমস্ত মানবিক গুণের সমন্বয় ঘটেছিল।

কন্সজ (৫২৯ - ৫২১ খ্রিঃ পূঃ)

কোরোশের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয় তাঁর পুত্র কন্সজ। যোগ্য পিতার পুত্রও তেমনই যোগ্য হয়েছে, এরকম সর্বত্র দেখা যায় না। কন্সজ তেমনই এক অযোগ্য পুত্র ছিল। সিংহাসনে বসেই তার বাসনা হলো যে পিতার সাম্রাজ্যকে সে আরও বড়ো করে তুলবে। তার প্রথম লক্ষ্য হয় মিশর। সেজন্য সে এক বিশাল বাহিনী গঠন করে। খ্রিস্টপূর্ব ৫২৪ সালে বিশ্বের অবশিষ্ট তৃতীয় সাম্রাজ্য মিশর, ইরানের কাছে পরাজিত হয়। কন্সজ তার বিজয় পতাকা নুবিয়ার মরুভূমি অঞ্চলেও ওড়াতে সক্ষম হয়। কিন্তু পিতার মতো তার শাসন চালানোর এবং সৈন্য পরিচালনার গুণ ছিল না। যখন রাজ্যের অভ্যন্তরে সুব্যবস্থা কায়ম করে অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিল, তখন সে আফ্রিকার মরুভূমিতে হাজার হাজার ইরানী সৈন্য বন্দি দিচ্ছিল। ফলে রাজধানীতে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং কন্সজ-যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসছিল। কিন্তু সমস্ত ঘটনা তাকে এত হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছিল যে, দেশে ফেরার পথেই সে আত্মহত্যা করে।

মহান দারয়োশ (৫২১ - ৪৮৫ খ্রিঃ পূঃ)

কন্সজের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ বাধে। অবশেষে দারয়োশ সিংহাসনে বসেন। তিনি অখামনশী বংশের পারসদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। বংশের সংস্থাপক অখামনশের তিনি পঞ্চম পুরুষ। দারয়োশ যখন সিদ্ধ ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বিজয় অভিযান করেন তখন ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মমত প্রচার করছিলেন। দারয়োশ এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ এই তিন মহাদ্বীপেই তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীন করে ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম বিজয় তখনও ভারতবর্ষের কিছু অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিন মহাদ্বীপে বুদ্ধের বার্তা পৌছাতে তখনও আড়াইশো বছর বাকি ছিল।

দারয়োশের আগের শাসকদের অবিমুখ্যাকারিতার জন্য দেশে অশান্তি এবং অব্যবস্থার এক চূড়ান্ত অবস্থা চলছিল। তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা দেখে অধীনস্থ রাজ্যগুলো স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা শুরু করেছিল। মোটের ওপর সমস্ত অবস্থাই দারয়োশের প্রতিকূল ছিল। কোরোশের জয় করা রাজ্যগুলোকে আবার তাঁকে জয় করতে হয়েছিল। এমনও সময় এসেছিল যখন কয়েকটি মাত্র প্রদেশ আর সামান্য কিছু সৈন্য তাঁর অধীনে ছিল। এলম এবং বাবুলে প্রথমে বিদ্রোহের সূচনা হয়। এলমকে আবার বশ্যতা স্বীকার করাতে দারয়োশের খুব কষ্ট করতে হয়নি, কিন্তু বাবুল তাঁকে প্রবল প্রতিরোধের মুখে ফেলেছিল। দারয়োশ যখন তাদের পরাজিত করে রাজধানী বাবুল অবরোধ করেন তখনই আবার মদ্রদের বিদ্রোহের খবর এল। দারয়োশ বাবুলের অবরোধ না তুলেই কিছু সৈন্য পাঠালেন মদ্র এবং আর্মেনিয়ার বিদ্রোহ দমন করতে। যখন চারদিকে এরকম অবস্থা তখন খোদ পারসের মধ্যেই বিদ্রোহের ভাব দেখা গেলো। অন্য কেউ হলে হয়তো হাল ছেড়ে দিত, কিন্তু দারয়োশ ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এক বছর নয় মাস অবরোধের মধ্যে থাকার পর (খ্রিঃ পূঃ ৫১৯) বাবুল আত্মসমর্পণ করে। এবার দারয়োশ পূর্ণরূপে অন্য বিদ্রোহীদের দিকে দৃষ্টি দিতে পারলেন। মদ্রদের নেতা ফার্বর্তশকে পরাজিত করলেন। পারস ও আর্মেনিয়ার বিদ্রোহকে কঠোরভাবে দমন করলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫১৮ সালের মধ্যে দারয়োশ আবার তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে

শান্তিস্থাপনে সক্ষম হলেন। অনেক বিদ্রোহী ক্ষত্রপদের (প্রাদেশিক শাসনকর্তা) প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছিল। দারয়োশ স্বয়ং মিশরে গিয়ে সেখানকার ক্ষত্রপের প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে মিশরবাসী প্রজাদের অনেক কর ছাড়ও দিয়েছিলেন।

এতকাল ইরানের শাসনব্যবস্থা আসিরিয় সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার অনুকরণে চলত। দারয়োশ প্রদেশগুলোকে পুনরায় সংগঠিত করলেন। সমস্ত ক্ষমতা যাতে একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়, সেজন্য প্রত্যেক প্রদেশে, ক্ষত্রপের সঙ্গে একজন করে সেনাপতি এবং মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। প্রদেশের শাসন বিষয়ে ওই তিনজনই সমভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জবাবদেহি ছিলেন। তার ওপরেও একজন রাজ মহামাত্য নিযুক্ত করলেন যার কাজ ছিল বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করা। তাঁর হাতে ক্ষত্রপ কিংবা সেনাপতিদের দণ্ডিত করার অধিকারও ছিল। এভাবে দারয়োশ তাঁর সাম্রাজ্যে ২৮ জন ক্ষত্রপ নিয়োগ করেছিলেন। গান্ধারের ক্ষত্রপও ওই ২৮ জনের একজন ছিলেন, এবং সম্ভবত তার রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। রাজকর নগদ অর্থ অথবা বস্তুর বিনিময়ে নেওয়া হতো। পারস প্রদেশে কোনো ক্ষত্রপ ছিল না, সেটা ছিল সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। দারয়োশের জন্মভূমি হওয়ার সুবাদে পারসের প্রজাদের রাজকর মুকুব ছিল। তবে সম্রাট দারয়োশ রাজ্য পরিভ্রমণে বের হলে প্রজাদের তাঁকে নজরানা দিতে হতো। সাম্রাজ্যের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় তিরিশ কোটি টাকা। সে আমলের জনসংখ্যা ইত্যাদি বিচারে ওই পরিমাণকে যথেষ্ট বলা যায়। দারয়োশই প্রথম ইরানী রাজা যিনি মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করেন। রাজচিত্র সহ মুদ্রা নির্মাণেও তিনিই ছিলেন প্রথম। তাঁর আমলের স্বর্ণমুদ্রা (ওজনে ১৩০ গ্রেন) ধাতু শুদ্ধতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দারয়োশ তাঁর শাসন বিভাগ এবং সামরিক বিভাগ উভয়কেই যথোচিতভাবে সুসংগঠিত করেছিলেন।

যাতায়াতের সুবিধার জন্য দারয়োশ তাঁর রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণ করেন। তাঁর আমলেই প্রথম ডাক ব্যবস্থা চালু হয়। দারয়োশের রাজ্যশাসন ব্যবস্থাকে এজন্যই মহত্বপূর্ণ বলা হয়, কারণ দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার তাঁর রাজ্য শাসন প্রণালীতে দারয়োশের নিয়মকেই অনুকরণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন আরবেরা ইরান জয় করে, তখন খলিফা উমরও রাজ্য শাসনের জন্য দারয়োশ প্রথারই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে মৌর্য এবং তদপরবর্তী শাসনের মধ্যেও দারয়োশের শাসনব্যবস্থার প্রচুর প্রভাব পড়েছিল। এককথায় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যত শাসনব্যবস্থা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার সবই কোনো না কোনোভাবে দারয়োশের শাসন প্রণালীর কাছে ঋণী।

গ্রিস আক্রমণ (৫১৪ খ্রিঃ পূঃ)

দেশে শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হওয়ার পর দারয়োশের মনে দিগ্বিজয়ের ইচ্ছা জাগে। তাঁর প্রথম লক্ষ্য হলো গ্রিস (ইউনান) এবং সিথিয়া (কৃষ্ণসাগর তটভূমিতে অবস্থিত বর্তমানের ইউক্রেন)। কিছু ঐতিহাসিকেরা অবশ্য বলেন যে দারয়োশ শুধু সিথিয়া জয় করতে চেয়েছিলেন, গ্রিস নয়, কারণ উত্তর ইরানে সিথিয়ানদের পক্ষ থেকে সর্বদাই হামলার আশংকা থাকত। ককেসাসের দুর্গম শৃঙ্গ অতিক্রম করে সিথিয়া আক্রমণ করা খুব কঠিন কাজ ছিল। দারয়োশ সেনাপতি হিসেবেও যথেষ্ট দূরদর্শী ছিলেন। তিনি ককেসাসের পথ এড়িয়ে বসফরাস প্রণালী দিয়ে যাওয়া মনস্থ করলেন। খ্রিঃ পূঃ ৫১৪ সালেই ক্ষত্রপদের আদেশ পাঠালেন সৈন্য সমাবেশ করার জন্য। বসফরাস প্রণালীতে

নৌকা দিয়ে সেতু বানালেন এবং খ্রিঃ পূঃ ৫১২ সালে তিনি ইওরোপে পদার্পণ করেন। তাঁর বিশাল বাহিনীকে থ্রেসের পথে সিথিয়ার দিকে আসতে দেখে, সিথিয়ান সৈন্যরা পালিয়ে গেলো। অশ্বারোহী সিথিয়ান সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করা সহজ ব্যাপার ছিল না, দারয়োশের সৈন্যরা সেই কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো। সিথিয়া আক্রমণের আগে দারয়োশ যদি সে দেশের ভৌগোলিক অবস্থা এবং আবহাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ খবর করতেন, তাহলে হয়তো তখন যুদ্ধ করতেনই না। সিথিয়ায় দারয়োশ ব্যর্থ হন। যদিও তাঁর এই ব্যর্থতার পিছনে সিথিয়ানদের যত না ভূমিকা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ভূমিকা ছিল সেখানকার পাথরে ভরা বন্ধুর ভূমি এবং দুরন্ত শীতের। রুশ অঞ্চলের এই প্রাকৃতিক কঠোরতা পরবর্তী যুগে নবম চার্লস ও নেপোলিয়নকেও শূন্য হাতে ফিরিয়েছিল। তবু বলতে হবে যে পরবর্তীদের তুলনায় দারয়োশের ভাগ্য কিছুটা ভালো ছিল কারণ ইরানী সৈন্য যখন পিছিয়ে আসে তখন সিথিয়ানরা তাদের পিছনে হামলা করেনি। ফেরার পথে দারয়োশ থ্রেস ও ম্যাসিডোনিয়া জয় করে ইওরোপে তাঁর বিজয় পতাঁকা উড্ডীন করেন। ঠিক তখনই দারয়োশের সেনাপতি শাহলাখ (যে জাতিতে গ্রিক ছিল) ভারতবর্ষে অভিযান চালান। সিঙ্কুনদ পার হয়ে তিনি পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বিস্তৃর্ণ অঞ্চলকে ইরানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে ওই অঞ্চল শাসনের জন্য তিনি একজন ক্ষত্রপ নিযুক্ত করেন এবং এক বিরাট নৌবহর তৈরি করে সিঙ্কুনদ ধরে আরব সাগর এবং আরব সাগরের তটভূমি ধরে ইরানে গিয়ে পৌঁছান। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই সমুদ্র যাত্রা এক মহত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমে আরব সাগর পাড়ি দেবার কৃতিত্ব আলেকজান্ডারকে দেওয়া হতো কিন্তু এখন ঐতিহাসিকেরা অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে আলেকজান্ডারের অন্তত দুশো বছর আগে ইরান অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই অভিযান করেছিল। এইভাবে দারয়োশ সিঙ্কু থেকে ম্যাসিডোনিয়া এবং বক্ষু (Oxus - আমুদরিয়া) থেকে নীল নদ পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। মানচিত্রে ওই বিশাল সাম্রাজ্যকে দেখে, তার বিজয়ের ইতিহাস জেনে, আজও আমাদের স্তম্ভিত হতে হয়।

রাজধানীতে ফিরে এসে দারয়োশের প্রথম কাজ হয় দেশের সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করা। পুনরায় গ্রিস আক্রমণ করার কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল না কিন্তু এমন কিছু ঘটল যা ইরানকে গ্রিস আক্রমণ করতে প্ররোচিত করল। এশিয়ার তটভূমিতে অনেক ছোট ছোট গ্রিস উপনিবেশ ছিল এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সেগুলো ইরানের অধীন ছিল। নিজেদের গৃহবিবাদের জন্য গ্রিসের এথেন্স প্রজাতন্ত্র থেকে বিদ্রোহীরা পালিয়ে ওই গ্রিক উপনিবেশে আশ্রয় নিত। আবার এশিয়া ভূখণ্ডের ইরান বিরোধী গ্রিকরা প্রয়োজনে এথেন্সে পালিয়ে যেত। এই দুই ধরনের পলাতকদের নিয়ে ইরান ও গ্রিস উভয়েই বিরত ছিল। ইরান থেকে আগত পলাতকদের গ্রিসরা উৎসাহ দিত আবার গ্রিস থেকে যাওয়া পলাতকদের ইরান বাহবা দিত। ইরান থেকে পলাতকদের গ্রিসে আশ্রয় নেওয়া ইরানের কাছে অপমানজনক মনে হতে লাগল। বস্তুত এ বিষয়ে দারয়োশের নিজের যতটা না ক্ষোভ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষোভ ছিল তাঁর ক্ষত্রপদের। তারাই নানাভাবে সভ্যটাকে গ্রিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার জন্য প্ররোচিত করছিল। ইতিমধ্যে ইরান গ্রিস সীমান্তের কাছে, থ্রেস থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এশিয়ার তটভূমিতে অবস্থিত গ্রিক উপনিবেশগুলি যদিও ইরানের অধীনতা মেনে নিয়েছিল, কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা প্রজাতান্ত্রিক ছিল। থ্রেস থেকে সৈন্য প্রত্যাহার হওয়ায় এই সব উপনিবেশগুলি দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল এবং একের

পর এক ইরানের বিবুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে। তারা এক সময় ওই অঞ্চলের ইরানী ক্ষত্রপের রাজধানী সারদেশ আক্রমণ করে এবং একমাত্র ক্ষত্রপের দুর্গটি ছাড়া নগরের সমস্ত এলাকা দখল করে নেয়। বিদ্রোহী উপনিবেশগুলোকে এথেন্স এই সময় কুড়িটি যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেছিল। উপনিবেশগুলোর এই জয়োদ্ভাস বেশি দিন থাকেনি। সম্রাটের বাহিনী এসে সারদেশকে মুক্ত করে এবং বিদ্রোহীদের পরাজয় অনিবার্য বুঝে এথেন্স যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ফিরে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৪ সালে ইরানীদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের এক ভয়ানক নৌ-যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গ্রিক (উপনিবেশ) পক্ষে ছিল ৩৫৩টি যুদ্ধ জাহাজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধে ইরানীরাই জয়লাভ করে এবং এশিয়ার তটভূমিতে অবস্থিত গ্রিক উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ শেষ হয়। বস্তুত পক্ষে এই গ্রিকদেরই 'যবন' বলা হতো এবং সম্পর্কের দিক থেকে এরা গ্রিসের গ্রিকদের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব ছিল, যার ফলে এশীয়বাসীরা সমস্ত গ্রিসদেরই যবন বলত।

লেদ-এর নৌ-যুদ্ধে সফল হবার পর দারয়োশ আবার থ্রেস ও ম্যাসিডোনিয়ার ওপরে চড়াও হন। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে বিদ্রোহী উপনিবেশগুলোকে এরা সাহায্য করেছিল। ইরানী সৈন্য থ্রেস এবং ম্যাসিডোনিয়া পুনরায় জয় করে এবং ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আলেকজান্ডার তার পিতার মতোই ইরানের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। ইরান গ্রিস আক্রমণেরও পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু এক বিধ্বংসী ঝড়ে ইরানের নৌবহরের বিপুল ক্ষতি হয়। গ্রিস আক্রমণ তখনকার মতো স্থগিত থাকে। তিন বছর পর খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ সালে আবার গ্রিস আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু হয়, অনেকগুলো ছোটখাটো যুদ্ধে ইরানীরা জয়লাভ করে কিন্তু নির্ণায়ক যুদ্ধ হয়েছিল ম্যারাথনে। বস্তুত এই যুদ্ধ শুধু ইরান আর গ্রিসের মধ্যে ছিল না, এই যুদ্ধ ছিল এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে। যুদ্ধে যদি ইরান জয়লাভ করত তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হতো এবং ইউরোপের জায়গায় এশিয়া বিশ্বশাসন করত। ম্যারাথনের যুদ্ধে ইরান একলক্ষ সৈন্য নিয়োগ করেছিল যাদের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার ছিল পদাতিক। অপর পক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র দশ হাজার। তবে সংখ্যায় অল্প হলেও যবন সেনা অনেক বেশি সংগঠিত ও শিক্ষিত ছিল। তাদের একটা সুবিধা ছিল এই যে তারা নিজ ভূমিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করছিল এবং যে ভূমির প্রতিটি অঞ্চল ছিল তাদের নখদর্পণে। তদুপরি তারা জানত যে এই যুদ্ধে পরাজয়ের অর্থ তাদের জাতির এবং দেশের অবলুপ্তি। দুপক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষী গ্রিকদেরই জয়মাল্য দেয়। যুদ্ধ জয়ের সংবাদ দেশে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এক আহত দূতকে। বিজয়ের আনন্দে সেই দূত আহত অবস্থাতেই ছাব্বিশ মাইল পথ দৌড়ে এথেন্সে পৌঁছায় এবং — যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে এই কথা কাটি বলেই প্রাণ ত্যাগ করে। (এই ঘটনার স্মৃতিতেই আধুনিক যুগের অলিম্পিক ক্রীড়ায় একটি দীর্ঘ পথ দৌড়ানোর প্রতিযোগিতা হয় যার নাম ম্যারাথন — অনু) এই যুদ্ধে প্রচুর ইরানী সৈন্য প্রাণ হারায়। দারয়োশ ব্যর্থ হয়ে ইরানে ফিরে এলেন। বাকি জীবনে আর যুদ্ধ যাত্রা না করে তিনি রাজ্যের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৫ সালে দারয়োশের মৃত্যু হয়।

ক্ষয়ার্শ (৪৮৫ - ৪৬৬ খ্রিঃ পূঃ)

দারয়োশের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ক্ষয়ার্শ (Xerxes) অখামনশী বংশের সিংহাসনে বসেন। তাঁর

সুন্দর চেহারার প্রশংসা শত্রু মিত্র সকলেই করত। পিতার মতো প্রতিভা কিংবা যোগ্যতা তাঁর মধ্যে না থাকলেও পিতার মতো তাঁর মাথাতেও বড়ো বড়ো যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল। মন্ত্রীরা প্রতিনিয়ত গ্রিকদের হাতে তাঁর পিতার পারজয়ের কথা স্মরণ করাত। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪ সালে মিশর বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহ দমন করতে ক্ষয়ার্শ স্বয়ং মিশরে গেলেন। পরের বছর বাবুলে বিদ্রোহ হলো। ক্ষয়ার্শ মিশর এবং বাবুলের বিদ্রোহ দমন করে (৪৮১ খ্রিঃ পূঃ) এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন যে অবিলম্বে গ্রিস আক্রমণের জন্য তৈরি হতে আরম্ভ করেন। এই অভিযানে সে-যাবৎ কালে সর্ববৃহৎ সৈন্য সমাবেশ ঘটেছিল। ইরানী বাহিনীতে হিন্দুস্থানের সৈনিকও ছিল। তারা অশ্বচালিত রথ নিয়ে এসেছিল। তবে গ্রিসের পার্বত্য অঞ্চলের যুদ্ধে ওই রথ উপযোগী প্রমাণিত হয়নি। ঐতিহাসিক হেরাডোটাসের বক্তব্য অনুসারে এই যুদ্ধে এক হাজার দুশো যুদ্ধ জাহাজ তেইশ লক্ষ দশ হাজার সৈন্য (তেরো লক্ষ পদাতিক, এক লক্ষ অশ্বারোহী এবং অবশিষ্ট নৌসেনা ও জাহাজের মাল্লা) ছিল। ইউরোপ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য এর সঙ্গে যোগ করলে মোট সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষে পৌঁছে যাবে। এই বিশাল বাহিনীর নিয়মিত রসদ যোগানো এবং সঞ্চালন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল।

গ্রিকরা এই যুদ্ধাযোজনের সংবাদ পেয়ে নিজেরাও আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হয়। সমস্ত হেলেনিক (গ্রিক) জাতিগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হয় এবং তাতে ব্যাপক সাড়াও মিলেছিল। গ্রিক অসামরিক নাগরিকেরা এথেন্স খালি করে অন্যত্র চলে গেলো। ইরানী বাহিনী বিনা বাধায় ম্যাসিডোনিয়া ও থ্রেস পার হলে গেলো। উত্তর ও মধ্য হেলেনিক অঞ্চলের সমস্ত রাজাই বিনা যুদ্ধে ইরানের অধীনতা স্বীকার করে নিলো। প্রথম বড়ো যুদ্ধটি হয় থার্মোপলিতে। এখানে গ্রিক সৈন্যরা এমন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে ইরানী সৈন্য তাদের পাহাড়ি ঘাঁটির বাইরে বের হতে পারেনি। পরে এক দেশদ্রোহীর সহায়তায় বিকল্প পথে ইরানী সৈন্য পাহাড় অতিক্রম করে। সমস্ত গ্রিক সৈন্যদের পিছু হঠার আদেশ দেওয়া হয় এবং সস্ত্র গ্রিক সৈন্য সেই মতো পিছিয়ে যায়। কেবল তিনশো জন স্পার্টান সৈন্য পশ্চাদাপসরণের আদেশ অমান্য করে যুদ্ধক্ষেত্রে ইরানী সৈন্যের মোকাবিলা করতে থাকে। স্পার্টান বীরেরা যুদ্ধ করতে করতে একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তারা স্থানচ্যুত হয়নি। থার্মোপলিসের যুদ্ধে, এই তিনশো স্পার্টান বীরের বীরত্ব কাহিনি, ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ইরানী সৈন্য আরও কয়েকটি ছোট যুদ্ধ জয় করে এথেন্স দখল করে নেয়। এথেন্স অধিকার করে বিজ়েতার তার ওপরে সেই ব্যবহারই করল যে ব্যবহার সম্রাট দারিয়োশের আমলে গ্রিস বিদ্রোহীরা ইরানের প্রাদেশিক রাজধানী সারদেশের ওপরে করেছিল। অর্ন্তিকা প্রদেশ ও এথেন্স জয় করে ক্ষয়ার্শ ভাবলেন বিজয় তাঁর হাতের নাগালে এসে পড়েছে, কিন্তু যুদ্ধের দেবতা বোধ হয় তখন অলক্ষ্যে হেসেছিলেন।

এথেন্সবাসীরা আগেই পালিয়ে সলামী দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল। ভাগ্যের অন্তিম ফয়সালার জন্য সেখানে যুদ্ধ জাহাজ জমা করা হয়েছিল। সমস্ত হেলেনিক জাতি এই যুদ্ধে সহায়তা করা কর্তব্য মনে করেছিল কারণ এটা ছিল তাদের কাছে মরণ বাঁচনের প্রশ্ন। গ্রিকরা চারশো যুদ্ধ জাহাজের একটি বহর গড়ে তুলেছিল। ইরানী নৌবহর সংখ্যায় বেশি থাকলেও নৌ-যুদ্ধে তাদের তুলনায় গ্রিকরা অনেক বেশি অভিজ্ঞ ছিল। প্রাথমিক নৌযুদ্ধে ইরানের ক্ষতি হলো বেশি। সলামী উপসাগরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। গ্রিসের সংকীর্ণ খাঁড়ি অঞ্চলে ইরানের যুদ্ধ জাহাজগুলো

স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে না পারায় গ্রিকরাই যুদ্ধে ভালো অবস্থায় ছিল। যুদ্ধে ইরানের দুশোটির বেশি যুদ্ধ জাহাজ ডুবে যায় আর সেই সঙ্গে ডুবে যায় তার যুদ্ধ জয়ের আশা। গ্রিকরা তখনও এখনও জানত না। পরদিন সকালে যখন তারা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তখন তারা অবাক হয়ে দেখল সমুদ্রবক্ষে একটিও প্রতিপক্ষের যুদ্ধ জাহাজ নেই। ক্ষয়ার্শ তাঁর সেনাপতি মর্দোনিয়াসের হাতে সৈন্যভার দিয়ে ইরানে ফিরলেন। মর্দোনিয়াসও একবার এথেন্স জয় করেন কিন্তু পলাতিয়ার ময়দানে গ্রিক ও স্পার্টার সৈন্যরা ইরানকে তৃতীয়বার পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করায়। মর্দোনিয়াস যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হন এবং তাঁকে ভুলুষ্ঠিত দেখে ইরানী সৈন্য দিশাহারা হয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। ম্যারাথন এবং সালামীর যুদ্ধের পর পলাতিয়ার যুদ্ধ, গ্রিক বিজয়ের ওপরে চিরকালের জন্য শীলমোহর মেরে দিয়েছিল।

ইওরোপে ইরানের পরাজয় এশিয়ার বুকে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। একে একে গ্রিক উপনিবেশগুলি স্বাধীন হয়ে গেলো। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রসারিত মূল ইরানী সাম্রাজ্য মোটামুটি অক্ষতই ছিল। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে মহান দারয়োশের শাসন ব্যবস্থা কত সুদৃঢ় ছিল এবং ইরানী জাতি অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থাতেই মানিয়ে নিতে জানত।

ক্ষয়ার্শ আরও তেরো বছর (খ্রিঃ পূঃ ৪৬৬) বেঁচেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই জীবন শুধু বিলাস ব্যসনেই কেটে ছিল। দিনে দিনে তাঁর অধঃপতন এমন চরম সীমায় পৌঁছায় যে দেহরক্ষী দলের প্রধান মহাপ্রতিহার তাঁকে হত্যা করে।

মহান দারয়োশ শাসনকাল ইরানের বৈভব সূর্যের মধ্যাহ্ন বেলা ছিল, তবে সায়াংকালের তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। যখন আমরা দারয়োশের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের দেখি, তখন আশ্চর্য হতে হয় যে অখামনশী বংশ কিভাবে খ্রিঃ পূঃ ৩৩০ পর্যন্ত তাদের শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। ইতিহাস পড়ে মনে হয়, দারয়োশ পরবর্তী রাজাদের অধিকাংশই কীটদষ্ট ফলের মতো অসুস্থসার শূন্য ছিল। অন্য দিকে ইরানী জাতি কিন্তু সুস্থ, সবল এবং প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল। অখামনশী বংশের প্রতি তাদের দুর্বলতা ছিল সেই কারণে তারা অন্তত রাজবংশকে বিব্রত করেনি, কিন্তু তাতে ধ্বংস আটকে থাকেনি।

গ্রিক শাসন (৩৩০-২৪৬ খ্রিঃপূঃ)

ইরানী শক্তি যখন পতনের দিকে, তখনই গ্রিসে এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছিল। গ্রিসের অনেক জায়গাতে প্রজাতন্ত্র থাকলেও ম্যাসিডোনিয়ায় রাজতন্ত্র ছিল। খ্রিঃ পূঃ ৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফিলিপ সেখানকার রাজা হন। তিনি শাসক হিসাবে অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে রাজোচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি ইরানী ও গ্রিক উভয় রণকৌশল আয়ত্ব করেছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই ম্যাসিডোনিয়া — যে ছিল হেলেনিক জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে দুর্বলতম — সে তখন সমস্ত জাতির নেতৃত্ব পদে আসীন হয়ে গেলো। ফিলিপের পুত্র আলেকজান্ডারের মধ্যে বিশ্ববিজেতা ইওয়ার সমস্ত গুণই ছিল, কিন্তু যদি গৃহবিবাদে খ্রিঃ পূঃ ৩৩৬ সালে ফিলিপের মৃত্যু না হতো, তাহলে বিশ্ববিজয়ীর শিরোপা ফিলিপের মাথাতেই শোভা পেত।

আলেকজান্ডার (৩৩৬ - ৩২৩ খ্রিঃপূঃ)

পিতা ফিলিপের যখন মৃত্যু হয় আলেকজান্ডারের বয়স তখন কুড়ি বছর। দুটি যুদ্ধের মাধ্যমে অল্প বয়সেই তিনি তাঁর রণ কুশলতার পরিচয় দেন। পিতা পুত্রের যোগ্যতার খবর জানতেন এবং সেজন্য তাঁর শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। একদিকে আলেকজান্ডার এক যোগ্য সেনানায়ক হবার শিক্ষা পেয়েছেন অবার তৎকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত অ্যারিস্টটলের কাছেও শিক্ষা লাভ করেছেন। ফিলিপের প্রতি অসন্তুষ্ট ম্যাসিডোনিয়ার শত্রুরা আলেকজান্ডার সম্পর্কে ভুল মূল্যায়ন করেছিল কিন্তু অচিরেই তাদের ভুল ভেঙেছিল।

ম্যাসিডোনিয়ার উত্তর ও দক্ষিণের বিদ্রোহ দমন করতে আলেকজান্ডারের দুবছরও লাগেনি। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৪ সালের বসন্তে আলেকজান্ডার ইরান সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য অভিযান আরম্ভ করলেন। ইরানের ধন ও জনসম্পদের তুলনায় আলেকজান্ডারের বাহিনী ছিল তুচ্ছ। এশিয়ার গ্রিকরাও ইরানের পক্ষে ছিল। ইরানের নৌবহরও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। ইরানের সম্রাট তৃতীয় দারায়োশ তাঁর পূর্বসূরীদের অনেকের তুলনায় খানিকটা যোগ্য অবশ্যই ছিলেন। তবে ইরানের মধ্যে তখন ছিল বার্ষিক্যের শিথিলতা আর ম্যাসিডোনিয়ানদের শরীরে ছিল তাজা উষ্ণ রক্তের স্রোত, চোখে বিশ্ব জয় করার স্বপ্ন।

ইরানীদের সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়েছিল আলেকজান্ডারকে এশিয়ার মাটিতে পা রাখতে দেওয়া। বিনা বাধায় তিনি সমুদ্র পার হন। সমুদ্র তটেও তেমন সংগঠিতভাবে তাঁকে প্রতিরোধ করা হয়নি। ইরানীরা ভেবেছিল যে অতীতের মতো এবারও গ্রিকরা কিছু ছোটখাটো হামলা চালিয়ে দেশে ফিরে যাবে, অন্যথায় অতীতের মতো ইরানী সৈন্য তাদের তাড়িয়ে দেবে। ম্যাসিডোনিয়া ত্যাগ করার সময় আলেকজান্ডারের কাছে ছিল তিরিশ হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহী। গ্রানিকুসের (Granicus) তটভূমিতে প্রথম যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইরানী সেনাপতি ও সম্রাটের জামাতা মিশ্রদাত নিহত হন। ইরানী সৈন্য প্রচণ্ডভাবে পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধের পরে এশিয়া মাইনর এলাকা থেকে ইরানের সংগঠিত ফৌজ লুপ্ত হয়ে গেলো। সারদেশ নগরকে তার ভীру ক্ষত্রপ বিনা যুদ্ধেই আলেকজান্ডারের হাতে তুলে দেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে ক্ষত্রপ, সেনাপতি ও প্রধান অমাত্যের পদ নিজেই দখল করেছিল। ক্ষত্রপের এই বিশ্বাসঘাতকতা সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রবল হানিকারক হয়। আলেকজান্ডার তাঁর বিজয়কে স্থায়ীরূপ প্রদানের জন্য সামরিক ও বেসামরিক ব্যবস্থার জন্য পৃথক পৃথক অধিকারী নিয়োগ করেন। সারদেশ দখলের পর আলেকজান্ডার সমুদ্রতটের গ্রিক উপনিবেশগুলিকে জয় করার দিকে মনযোগী হন, অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৩ সালে ইরান সম্রাটের মুখোমুখি হবার জন্য অগ্রসর হন। তৃতীয় দারায়োশও ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে ইসুস (Issus) নামে এক জায়গায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। সলামীর মতো এই জায়গাও ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং যার ফলে ইরানী সৈন্যবাহিনীর দ্রুত সঞ্চালনে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি হয়। ইসুসের প্রান্তরেই ইরান তথা এশিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। দুপক্ষে যখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল দারায়োশ তখনই ভীত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। তাঁকে পালিয়ে যেতে দেখে ইরানী সৈন্য হতোদ্যম হয়ে পড়ে। তারপর একদিকে পলায়মান ইরানী সেনা, অন্য দিকে তাদের পিছু নেওয়া গ্রিক সৈন্য, এই অবস্থায় একলক্ষ ইরানী সেনা নিহত হয়। দারায়োশের রনিবাস (হারেম)

আলেকজান্ডারের হাতে বন্দী হয় এবং সেইসঙ্গে বিজেতার প্রচুর ধন সম্পদেরও অধিকারী হয়। রনিবাসের প্রতি আলেকজান্ডারের ব্যবহার সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। এরপর আলেকজান্ডারের বাহিনী মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশের দিকে ধাবিত হয়। ওইসব দেশ জয় করে আলেকজান্ডার আবার তাঁর বিজয়রথের দিশা পরিবর্তন করে চললেন ইরানের দিকে। আবেলাতে (মেসোপটেমিয়া) দারয়োশ আরেকবার চেষ্টা করলেন আলেকজান্ডারকে বাধা দিতে। এবার তাঁর সঙ্গে ছিল দশলক্ষ সৈন্য। এবারও যুদ্ধের অন্তিম ফল নির্ধারিত হওয়ার আগেই তিনি পালিয়ে যান। আলেকজান্ডারের সৈন্যদল দুদিন ধরে তাঁকে তাড়া করে চলল, কিন্তু তাঁকে ধরতে পারেনি। আলেকজান্ডার বিজিত আঞ্চলগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুরক্ষিত করে আরও এগোতে থাকেন। প্রাদেশিক রাজধানী সূসাতে সশ্রাটের ধনভাণ্ডার তাঁর হস্তগত হয়।

এরপর আলেকজান্ডার মধ্য ইরানের মালভূমি অঞ্চল, ইরানী জাতির পবিত্র মাতৃভূমির দিকে অগ্রসর হন। পথে গিরিপথের কাছে একবার তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা হয় কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ সালে আলেকজান্ডার ইরানের হুদপিণ্ড, রাজধানী পর্সোপোলিসে উপস্থিত হন। এখানে কয়েক পুরুষ ধরে সঞ্চিত হওয়া বিপুল ধনরাশি তাঁর হস্তগত হয়। এই সম্পদ বহন করার জন্য দশ হাজার খচ্চর বাহিত শকট এবং পাঁচ হাজার উটের প্রয়োজন হয়েছিল। শহরে নির্দয়ভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আলেকজান্ডার মহান দারয়োশের তৈরি বিশাল স্তম্ভ প্রাসাদ সহ গোটা শহরে আগুন লাগিয়ে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রপুরী সদৃশ পর্সোপোলিস পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আজও সেই ধ্বংসস্তূপ আলেকজান্ডারের কুরতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওই ভগ্নস্তূপ দেখে এক আমেরিকান ঐতিহাসিক লিখেছেন — যারা শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, সম্পূর্ণ মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

হুম্মতন (বর্তমান হামদান) অঞ্চলে নাকি প্রতিরোধের চেষ্টা হচ্ছে এমন খবর শুনে আলেকজান্ডার দ্রুত সেখানে উপস্থিত হন, কিন্তু সেটা শুধু জনরবই ছিল। আলেকজান্ডার এবার মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হন, পথে দমগানের কাছে দারয়োশের তাজা মৃতদেহ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। আলেকজান্ডার মৃত সশ্রাটের মরদেহের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে তাকে পর্সোপোলিসে নিয়ে যান এবং মর্যাদায় সঙ্গে সমাহিত করেন। এভাবেই ইরানের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে অখামনশী রাজবংশের সূর্যাস্ত ঘটল।

সম্পূর্ণভাবে অধিকার কায়ম রাখার জন্য আলেকজান্ডারকে আরও কিছুদিন ইরানে থাকতে হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৮ সালে তিনি হিন্দুকুশ পার হয়ে বলখ (বালহিক) যা ইরান সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ নগর ছিল, তাকে জয় করেন। কিন্তু সিথিয়ানরা আলেকজান্ডারকে প্রচণ্ড বাধা দেয়।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ সালে আলেকজান্ডার একলক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। কাবুল ও খাইবার উপত্যকায় কেউ তাঁকে বাধা দিতে সাহসী হয়নি। তক্ষশিলার রাজা নিজেকে এসে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু ঝিলমের পূর্ব পারে পুরু' তাঁকে প্রচণ্ডভাবে বাধা

১. *Persia*, S.G.W. Benjamin - P.146. I see at last a danger that matches my courage. It is at once with wild beasts and men uncommon mettle that the contest now lies.

দেন। সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে স্বয়ং আলেকজান্ডারকেও বলতে হয়েছিল — এই প্রচণ্ড প্রতি-
 অক্রমণে আমার যে পরিমাণ সেনা ক্ষয় হয়েছে, তাতে গ্রিক সেনাদের মনোবল নষ্ট হয়ে যাবার
 অবস্থায় এসে গিয়েছিল। এরপর সেনাপতিদের চাপে আলেকজান্ডার চেনাব ও ইরাবতী পার
 হয়ে বিপাশার পশ্চিম তটে পৌঁছান। ওখানেই তাঁর সেনাপতিরাজ্ঞানতে পারেন যে, এ যাবৎ
 ভারতবর্ষে তারা যে যুদ্ধ করেছেন তা কোনো সামন্ত রাজা অথবা গণরাজ্যের বিরুদ্ধে। মগধের
 মহান সাম্রাজ্যের সীমানা এখান থেকেই আরম্ভ। মগধ সাম্রাজ্যের চতুরঙ্গী সেনাবাহিনী অসংখ্য
 এবং সেজন্যই অজেয়। সৈন্যদের মনোবল ভেঙে গেলো, তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে
 আর এগোতে অস্বীকার করল। আলেকজান্ডার অনেক বোঝানোর পরও তারা রাজি হলো না।
 ক্ষোভে আলেকজান্ডার তিনদিন কারও সঙ্গে বাক্যলাপ করেননি, তাতেও কোনো ফল না হওয়ায়
 বাধ্য হয়ে (খ্রিঃ পূঃ ৩২৬) আলেকজান্ডার পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেন।

আলেকজান্ডার তাঁর সৈন্যবাহিনীকে দুভাগে ভাগ করে এক ভাগকে সমুদ্রপথে এবং আর
 এক ভাগকে স্থলপথে পাঠান। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪ সালে তিনি ওপিসে (বাগদাদের কাছে) পৌঁছান।
 এখানে আলেকজান্ডার তাঁর অধিকাংশ সেনাপতিদের প্রচুর পুরস্কার দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেন।
 গ্রিকরা আলেকজান্ডারের মধ্যে প্রাচ্যসুলভ ঠাটবাট দেখে এবং প্রাচ্যের লোকজনকে প্রশিক্ষণ
 দিয়ে, গ্রিকদের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য তাঁর ওপরে ক্ষুব্ধ ছিল। গ্রিকরা সকলে একযোগে তাঁর
 কাছে অবসর প্রার্থনা করল। আলেকজান্ডার এই ষড়যন্ত্রের পাণ্ডাদের প্রাণদন্ড দেন এবং ইরানী
 সৈন্যদের প্রশংসা করেন। তিনি ইরানীদের মধ্য থেকেই তাঁর দেহরক্ষী, মোসাহেব এবং অন্যান্য
 গুরুত্বপূর্ণ পদের লোক বাছাই করেছিলেন। গ্রিকরা তাঁর অনমনীয় মনোভাব দেখে ক্ষমা প্রার্থনা
 করল। এদিকে আলেকজান্ডার আবার তাঁর বিজয় অভিযান শুরু করলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ সালে
 তিনি বাবুলে পৌঁছান এবং সেখানেই তিনি অসুস্থ বোধ করেন। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে এই
 দিগ্বিজয়ী সম্রাটের মৃত্যু হয়।

যদিও এরপরে ইরান রাজনৈতিকভাবে গ্রিসের অধীন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্যের
 শাসনব্যবস্থা পরিচালনার অভিজ্ঞতা একমাত্র ইরানীদেরই ছিল। যার ফলে বিজয়ীরা বিজিতদের
 শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সাম্রাজ্য পরিচালনার অধিকাংশ বিষয় গ্রিকরা ইরানীদের কাছে শেখে। ইরানীদের
 সাহচর্যে গ্রিকদের পোশাকেও অনেক পরিবর্তন আসে, যেমন আলেকজান্ডার নিজে ইরানী ধরনের
 পাজামা পরতেন। মুদ্রা ইত্যাদি অনেক বিষয়ই ইরানের অবদান।

আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারী

মহাবীর আলেকজান্ডারের মৃতদেহ তখনও সংকার করা হয়নি এরই মধ্যে তাঁর সেনাপতিদের
 মধ্যে বিজিত রাজ্যের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোল বেধে গেলো। এগারো বছর ধরে (খ্রিঃ পূঃ
 ৩১২) এই গৃহযুদ্ধ চলে এবং আলেকজান্ডারের বংশ ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যও বহুধা
 বিভক্ত হয়। এই বিভক্ত সাম্রাজ্যের অধিকাংশই ছিল এশিয়াতে, যার অধিকারী হন সেনাপতি
 সেলুকাস। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধ সাম্রাজ্য অধিকার করেছেন এবং পাঞ্জাব

থেকে গ্রিকদের বিতাড়িত করেছেন। গৃহযুদ্ধ থেকে অবসর পেয়ে সেলুকাস এদিকে দৃষ্টি দিলেন এবং পাঞ্জাবকে আবার দখল করার চেষ্টা করলেন। যুদ্ধে পারাজিত হয়ে সেলুকাসকে তাঁর কন্যা ও হিন্দুকুশ পর্যন্ত সাম্রাজ্য চন্দ্রগুপ্তের হাতে তুলে দিতে হলো। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য স্বশূরকে পাঁচশো রণহস্তী উপটোকন দিয়েছিলেন, যেগুলো পরবর্তী যুদ্ধে সেলুকাসকে অনেক সাহায্য করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩০১ সালে সেলুকাস তাঁর সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে ভূমধ্যসাগর থেকে হিন্দুকুশ পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের একক অধীশ্বর হন।

সেলুকাসের পুত্র প্রথম অ্যান্টিয়োক (খ্রিঃ পূঃ ২৮১-২৬২) পিতার মতোই প্রভাবশালী এবং প্রতাপী ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় অ্যান্টিয়োক (খ্রিঃ পূঃ ২৬২-২৪৬)-এর সময় থেকে গ্রিকশক্তির ক্ষয় হতে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব ২৪৬ সালে বাখতরের গ্রিক (বর্তমান সোবিয়ত তুর্কিস্তান) শাসক দিয়োদতুন এক পৃথক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এই রাজবংশ পাঞ্জাব দখল করে। খ্রিস্টপূর্ব ২৪৯ সালে প্রথম অর্শক (Arsaces) সেলুকাস শাসন থেকে আলাদা হয়ে অশকানি (পার্থিয়ন) রাজবংশ স্থাপন করেন।

গ্রিক শাসনের চুরাশি বছরে (৩৩০-২৪৬ খ্রিঃ পূঃ) ইরানের ওপরে বহু বিষয়ে নতুন ধরনের প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। দেশের শাসনভার প্রকৃত পক্ষে ইরানীদের হাতেই ছিল। সৈন্যবাহিনীর বড়ো বড়ো সেনাপতি এবং প্রাদেশিক ক্ষত্রপদের অধিকাংশই ছিলেন ইরানী। গ্রিক এবং ইরানীরা বিবাহ সম্বন্ধেও আবদ্ধ ছিল। স্বয়ং আলেকজান্ডার তৃতীয় দারয়োশের কন্যা রোথনাকে (Roxana) বিবাহ করেছিলেন এবং রোথনাই আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারীর জননী ছিলেন। সেলুকাসের স্ত্রীও ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত ইরানী পরিবারের কন্যা। দ্বিতীয় ও পরবর্তী প্রজন্মের গ্রিকরা প্রায় অনেকেই রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে ছিলেন অর্ধ ইরানী। বাখতারি গ্রিকদের অধীনস্থ ভারতীয় প্রদেশগুলোর ক্ষত্রপেরা প্রায় সকলেই ছিল ইরানী। এই সম ব্যবহার ও সম দৃষ্টির জন্যই ইরানীরা বিদ্রোহের পথে যায়নি।

অশকানি বংশ (খ্রিঃ পূঃ ২৪৯-২২৬)

খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬ সালে বাখতারি গ্রিকরা মূল গ্রিক শাসন থেকে আলাদা হয়ে যায়। সেই সময় (২৪৯-২৪৭ খ্রিঃ পূঃ) বর্তমান সোবিয়ত তুর্কিস্তানের বাসিন্দাদের এক সর্দার অর্শক সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বাখতারি আর গ্রিসের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অর্শক এবং তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী যাদের বলা হতো অশকানি, তারা হিন্দুকুশ পার হয়ে খোরাসানে চলে যায়। তখন ওই অঞ্চলের নাম ছিল পার্থিয়া, (সংস্কৃত পার্থিব) এবং এজন্য অশকানিদের লোকে পার্থিয়ন বলত। ভাষা ও জাতি হিসাবে পার্থিয়নরা ইরানীদেরই জ্ঞাতি ছিল কিন্তু ইরানী ইতিহাসকারেরা তাদের ইরানী বলে স্বীকার না করে বিদেশি আখ্যায়িত করেছেন। কোরোশ ও দারয়োশকে নিয়ে ইরানী জাতি এতই গর্বিত ছিল যে পার্থিয়নদের তারা অসভ্য, ম্লেচ্ছ এমনকি বর্বর পর্যন্ত মনে করত। বোধহয় এই জন্যই পার্থিয়ন শাসকেরাও ইরানীদের থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখেছিলেন।

একটি ক্ষুদ্র রাজবংশ হিসেবে অশকানিদের প্রতিষ্ঠার সংবাদ, রোমান ও গ্রিক ঐকিহাসিকদের কিছু বিক্ষিপ্ত রচনা ও সেই আমলের কিছু মুদ্রা থেকেই পাওয়া যায়। প্রথম অর্শকের মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত, মনে হয় কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। দ্বিতীয় অর্শক (খ্রিঃ পূঃ ২৪৭-২১৪)

ছিলেন প্রথম অর্শকের ভাই। অশকানি রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তাঁরও যথেষ্ট অবদান ছিল। বস্তুত দ্বিতীয় অর্শকেই অশকানি তথা পার্থিয়ন সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। সেই সময় সেলুকি শাসকদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার জন্য দেশে এক ধরনের মাংস্যান্যায় অবস্থা চলছিল। এই অবস্থা দ্বিতীয় অর্শকে সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। তিনি দ্বিতীয় সেলুকাসকে পরাজিত করে পার্থিয়নদের স্বতন্ত্র পরিচয় ঘোষণা করেন।

প্রথম মিথ্রদাত (১৭০ - ৬৮ খ্রিঃ পূঃ)

দ্বিতীয় অর্শকের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের অধিকার নিয়ে পার্থিয়নদের মধ্যেও গণ্ডগোল বাধে। ইরানে রাজসিংহাসনে তখন সেলুকি বংশের তৃতীয় অ্যান্টিয়োক আসীন ছিলেন। পশ্চিমে ততদিনে রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং তাদের কাছে পরাজিত হয়ে তৃতীয় অ্যান্টিয়োকের রাজ্য মোসোপটেমিয়া এবং তার চারপাশের কিছু অঞ্চলের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে।

সেলুকি বংশের এই দুরবস্থার কালে মিথ্রদাত পার্থিয়ন বংশের রাজা হন। তিনি একজন নিপুণ যোদ্ধা ও চতুর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মিথ্রদাত প্রথমে পূর্বদিকে বাখতারি গ্রিকদের কাছ থেকে দুটো প্রদেশ কেড়ে নিলেন তারপর দৃষ্টি দিলেন পশ্চিমে। সেলুকি সম্রাট দ্বিতীয় দেমিট্রী (Demetrius II) বিপদ সংকেত পেয়ে পার্থিয়নদের বাধা দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু মিথ্রদাতের সঙ্গে পেরে উঠলেন না, উপরন্তু তিনি নিজেও পার্থিয়নদের হাতে বন্দী হলেন। পার্থিয়ন সাম্রাজ্যকে এক দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠা করে বৃদ্ধ বয়সে (খ্রিঃ পূঃ ১৩৮) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রোমান শক্তি

তৃতীয় অ্যান্টিয়োকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (খ্রিঃ পূঃ ১৭৫) সেলুকি বংশের ভাগ্যরবি অস্তাচলে যেতে শুরু করে। যদিও এর পরও কিছুকাল সিরিয়াতে তাদের শাসন ছিল কিন্তু তারা সর্ববিষয়েই রোমের কৃপা প্রার্থী ছিল। রোমের শক্তি ক্রমশই বেড়ে চলছিল। পশ্চিমে পার্থিয়নদের প্রতিবেশী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দুটোই ছিল রোম। পূর্বদিকেও এক নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল যারা বাখতারি গ্রিকদের পরাজিত করে তাদের রাজ্য দখল করে নিয়েছিল, তারা ছিল শকজাতি। পার্থিয়নরা রোম ও শক এই দুই শক্তির মাঝখানে অবস্থান করছিল। শকরা এত দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি করছিল যে তাদের হাতে যখন পার্থিয়ন সাম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য মনে করা হচ্ছিল তখনই দ্বিতীয় মিথ্রদাত পার্থিয় (১২৪-৮৮ খ্রিঃ পূঃ) সিংহাসনে বসেন। তিনি অশকানি সাম্রাজ্যের তারকাকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন। পূর্বদিকে তিনি শকদের এমনভাবে পরাজিত করেন যে তারা চিরকালের মতো পার্থিয়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হয়। বাবুলের ক্ষত্রপকে দমন করে তিনি আর্মেনিয়ার দিকে পদক্ষেপ করেন এবং খ্রিস্টপূর্ব ১০০ সালে আর্মেনিয়া মিথ্রদাতের অধীনতা স্বীকার করে। ধীরে ধীরে তাঁর রাজ্যসীমা হিমালয় থেকে কোহকাফ (ককেসাস) হয়ে মোসোপটেমিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মিথ্রদাত রোম ও চিনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

হুরওদ (৫৫-৩৯ খ্রিঃ পূঃ)

দ্বিতীয় মিথ্রদাতের মৃত্যুর (খ্রিঃপূঃ ৮৮) পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য ইরান নানা দিক থেকে

রোমের কাছে অপমানিত হচ্ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫ সালে হুরওদ সিংহাসনে বসেন। অশকানি বংশের প্রতাপী রাজাদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়। তখনকার রোম ক্রাসুস Crassus আর তার দুই সহায়ক কাটজার ও পম্পেটর নেতৃত্বে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। রোম শুধু সামরিক শক্তিতেই নয় বাণিজ্যিক শক্তিতেও যথেষ্ট বলশালী ছিল। বাণিজ্যের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সম্পদ এসে রোমের ভাণ্ডারে জমা হচ্ছিল। রোম ইরান আক্রমণের অজুহাত খুঁজছিল। ইতিমধ্যে পম্পেই আর্মেনিয়া দখল করায়, তাদের মনোবল আরও বেড়ে যায়। পম্পেই এক রণকুশল সেনানী ছিলেন। এবং তাঁর ষাট হাজার সৈন্য যুদ্ধে অতি নিপুণ ছিল। পম্পেই শত্রুদের অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করতেন এবং প্রচণ্ড স্বর্ণকাঙ্ক্ষী ছিলেন, এই দুই দোষ তার সর্বনাশেরও কারণ হয়। ইরান রোমের কার্যকলাপের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল। হুরওদ ভাগ্যবলে সুরেনাস নামে একজন কুশল সেনাপতি পেয়েছিলেন। সুরেনাস যেমন নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন, তেমনই ছিলেন প্রভুভক্ত। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮ সালের ৬ জুন চার-এর (Charrac) ময়দানে রোম ও ইরান মুখোমুখি হয়। সুরেনাস তাঁর সেনাবাহিনীর একটি বড়ো অংশকে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলেন। রোমানরা শুধু পার্থিয়নদের অশ্বারোহী বাহিনীকেই দেখতে পেয়েছিল। রোমানরা শত্রুপক্ষের শক্তির আন্দাজ করতে ব্যর্থ হয় এবং তারাই প্রথম আক্রমণ করে। পার্থিয়ন সৈন্য পিছু হটার নিপুণ অভিনয় করে এবং রোমানরা যখন তাদের পিছু ধাওয়া করে তখনই পাহাড়ের আড়াল থেকে লুকানো সেনারা তাদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে। পার্থিয়নদের অগ্রণী সেনা যারা পলায়নের অভিনয় করছিল এবার তারাও ঘুরে দাঁড়ায় এবং উভয়দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে রোমান সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। যে সামান্য রোমান সৈন্য রক্ষা পেয়েছিল তারাও চড়া রোদ, মেঘের মতো ধুলো আর জল পিপাসাতেই শেষ হয়ে যায়। সূর্যাস্তের পর পার্থিয়ন সৈন্যরা যুদ্ধ করত না। সেই সুযোগে রাতের অন্ধকারে অবশিষ্ট বাহিনী নিহত ও আহতদের যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলো।

রোমান সেনাপতি ক্রাসুস সুরেনাসের সঙ্গে সন্ধি প্রার্থনা করে। কিন্তু সন্ধি আলোচনার সময় সে এমন কিছু ভুল করে বসে যার জন্য আবার যুদ্ধ শুরু হয়। ক্রাসুসকে বন্দী করে তার শিরঃচ্ছেদ করা হয়। ক্রাসুসের কাটা মুন্ডের মুখে একতাল সোনা গুঁজে দিয়ে সুরেনাস পরিহাস করে বলেছিলেন— আশাকরি এবার তোমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। এরপর সেই ছিন্ন শির হুরওদের কাছে পাঠানো হয়।

কুড়ি হাজার রোমান সৈন্য প্রাণে বেঁচে ছিল যাদের মধ্যে দশ হাজারকে হুরওদ তাঁর রাজ্যে বাস করতে দেন। হুরওদের আমলে অশকানি বংশের ভাগ্যরবি মধ্য গগনে অবস্থান করছিল। তিনিই প্রথমে পার্থিয়ন সম্রাট যিনি শাহানশা উপাধি ধারণ করেছিলেন। আশি বছর বয়সে হুরওদ তাঁর পুত্রের হাতে নিহত হন।

হুরওদের উত্তরাধিকারী ফ্রাতোসের সময় রোম পূর্ব পরাজয়ের শোধ নেবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। যুদ্ধে রোমের তিরিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। এভাবে বার বার পরাজিত হয়ে পরবর্তী একশো বছরে রোমানদের আর ইরানের দিকে লোভের দৃষ্টিতে তাকাতে সাহস হয়নি। যে রোমের বিজয় পতাকা উত্তর দক্ষিণ এবং পশ্চিমে বিজয় গৌরবে উড়েছিল; যাদের সেনাবাহিনী শুধু জয়লাভ করতেই অভ্যস্ত ছিল সেই রোমানদের তাদের পূর্বদিকের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে

বার বার পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল। এক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতে, প্রাচীন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে, একমাত্র ইরানীরাই রোমানদের অগ্রগতিকে থামাতে পেরেছিল।

পরবর্তী একশো বছরের শান্তি কিন্তু পার্থিয়ন বংশের জন্য শান্তিপূর্ণ ছিল না। তখন বাইরের শত্রুর ভয় কম থাকায় অন্তর্বিরোধ শুরু হয়েছিল পূর্ণোদ্যমে। অনেক রাজা এলো এবং গেলো। ভাইয়ের হাতে ভাই নিহত হচ্ছিল। এভাবে যখন অশকানি বংশ বৃথা ক্ষয়ক্ষতি করছিল সেই অবস্থার মধ্যে প্রথম বোলোগেলস ক্ষমতা অধিকার করেন (৫১-৭৭ খ্রিস্টাব্দ)। সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য তিনি আত্মীয় পরিজনদের হত্যা তো করেনইনি, বরং তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত উদার ব্যবহার করেছেন। ৬৩ খ্রিস্টাব্দে রোম একবার আক্রমণ করে এবং পরাজিত হয়। অতঃপর বোলোগেলস ও রোম সম্রাটের মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেই সময়ের বিচারে এটি একটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এর পর অশকানি বংশ তার অন্তর্কলহ এবং রাজাদের বিলাসবাসনের ভারে ধ্বংসের পথে চলতে থাকে। তৃতীয় বোলোগেলসের রাজত্বকালে (১৪৭-১৬১খ্রিঃ) রোম ইরান আক্রমণ করে এবং বোলোগেলস পরাজিত হন। যদিও এই পরাজয়ের ফলে রাজ্যের আয়তনে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি কিন্তু এই পরাজয়ের মানসিক আঘাত থেকে অশকানিরা বহুদিন পর্যন্ত মুক্ত হয়নি।

অর্দবান (Artabanus) [২০৯-২২৬ খ্রিঃ]

অশকানি বংশের অন্তিম রাজার নাম ছিল অর্দবান। একজন উত্তম শাসক এবং নিপুণ যোদ্ধা এই উভয় গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি যদি আরও কিছু কাল আগে সিংহাসনে বসতেন তাহলে হয়তো অশকানি বংশের গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে পারতেন। কিন্তু তিনি যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন নানা কারণে সম্রাজ্যের ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবে রাজত্বের শেষ দিকে অর্দবান রোমকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। ২১৬ খ্রিস্টাব্দে রোম আর একবার ইরান আক্রমণ করে, কিন্তু অর্দবানের কাছে তারা পরাজিত হয়। রোম সম্রাট পঞ্চাশ কোটি দিনার (প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা) ইরানকে ক্ষতি পূরণ দিতে বাধ্য হন। প্রদীপ নেভার আগে যেমন আরেকবার জ্বলে ওঠে, অশকানি বংশেও এই ঘটনা সেরকমই ছিল।

পার্থিয়রা ভাষা ও জাতির দিক থেকে ইরানী ছিল, কিন্তু তাদের আদি নিবাস ছিল পারস্য থেকে দূরে, সেজন্য ইরানীরা তাদের প্রকৃত ইরানী বলে স্বীকার করেনি। অশকানি বংশও গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিল। তারা ইরানীদের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টাও করেনি। অশকানিরা তাদের মুদ্রা গ্রিক ধাঁচে তৈরি করেছিল এবং মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপিও ছিল গ্রিক অক্ষরে, এক কথায় তারা ইরানী উপেক্ষার জবাব উপেক্ষা দিয়েই দিয়েছিল। অশকানিরা জরথুষ্ট্রের ধর্মমত জানত কিন্তু সে বিষয়ে কট্টর ছিল না। পার্থিয়ন আমলে সূর্য পূজার চলন শুরু হয় এবং দেখতে দেখতে তা রোম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বৈদিক ধর্ম ও জরথুষ্ট্রের ধর্মমতের সঙ্গে কোনো মৌলিক বিরোধ না থাকায় মিত্র-পূজা (সূর্যপূজা) অনায়াসে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। মিত্র-পূজাকে উৎখাত করে ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের জয় খুব সহজে হয়নি।

সাসানি বংশ (২২৬-৬৫২ খ্রিঃ)

পার্শ্বীয় শক্তির সূর্য যখন অন্ত্যচলগামী তখন পারস প্রান্তের ক্ষত্রপ ছিলেন আদেশির। দারয়োশের বংশের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি তাঁর এক পূর্বজ সাসানের নামে নতুন সাসানি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। জ্যোতিষীরা তাঁকে জানিয়েছিল অচিরেই অশকানি (পার্শ্বীয়) বংশের রাজশক্তি নিঃশেষিত হবে। আদেশির সুযোগ বুঝে পারসের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পূর্ববর্তী কেরমানের দিকে অগ্রসর হন। অর্দবান এই নয়া শত্রুকে পরাজিত করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েও ব্যর্থ হন এবং পরপর দুটি যুদ্ধে পরাজিত হন। ২২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে উভয় পক্ষ অস্তিম নির্ণয়ের জন্য হোরমুজের প্রান্তরে মিলিত হয়। অশকানি বংশের শেষ সম্রাট অর্দবান স্বয়ং এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী সাসানি বংশকেই বরণ করলেন এবং হোরমুজের যুদ্ধে জয়ী হয়ে আদেশির সম্রাট ঘোষিত হন।

সম্রাট হয়ে আদেশির জরথুষ্ট্র ধর্মকে ইরানের রাজধর্ম ঘোষণা করেন। বিগত শতাব্দী-গুলিতে এই ধর্মের মধ্যে যে সমস্ত বিকার দেখা গিয়েছিল তাকে দূর করার চেষ্টা করেন। পুনরায় অগ্নিকুণ্ড স্থাপিত হয়। শতাব্দীর উপেক্ষা আর অত্যাচারে সামান্য কিছু ধর্মগ্রন্থ রক্ষা পেয়েছিল, সেগুলিকে সংগ্রহ করে নতুনভাবে লেখার ব্যবস্থা করেন। পারসি ধর্মের পুরোহিতরা আবার তাঁদের মর্যাদা ফিরে পান।

আদেশিরকে ইরানের মহান পুরুষদের একজন বলে গণ্য করা হয়। তিনি বলেছিলেন — সৈন্য বিনা শক্তি হয় না। ধন বিনা সৈন্য হয় না। কৃষি বিনা ধন হয় না। আর ন্যায় বিনা কৃষি হয় না। তাঁর আদর্শ ছিল ন্যায়। তিনি তাঁর প্রজাদের সুখী ও সমুত্তর দেখতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পুত্র শাপোরকে বলেছিলেন — অগ্নিবেদি আর রাজ সিংহাসনের মধ্যে ব্যবধান যেন না বাড়ে। সর্বদাই যেন একে অপরের সহায়তা করে। ধর্মবিহীন রাজা এক অত্যাচারী মাত্র।

প্রথম শাপোর (২৪০-২৯১ খ্রিস্টাব্দ)

শাপোর, যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন শেষ অশকানি রাজার মেয়ে। যার ফলে তিনি সাসানি এবং অশকানি উভয় রক্তেরই উত্তরাধিকার বহন করতেন। শাসক হিসাবে শাপোরের প্রথম পরীক্ষা হয় আর্মেনিয়াতে। আদেশির আর্মেনিয়া জয় করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। শাপোর আর্মেনিয়ার বিদ্রোহ সহজেই দমন করেন। রোমে তখন প্রচণ্ড অশান্তি প্রায় গৃহযুদ্ধের অবস্থা। শাপোর সেই সুযোগে ২৪১ খ্রিস্টাব্দে রোম অভিযান করেন। তাঁর সেনাদলের আক্রমণের সামনে একের পর এক রোমান দুর্গের পতন হতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই ইরানী সৈন্য ভূমধ্যসাগরের তীরে গিয়ে উপস্থিত হলো। রোমান সম্রাট নিজে এক বাহিনী নিয়ে শাপোরের সম্মুখীন হলেন। শাপোর পরাজিত হয়ে পিছিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে তবুও রোমান সম্রাটকে কেউ হত্যা করে। ফলে রোমের বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ২৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইরানের অনুকূলে এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে রোমান সেনা ফিরে যায়।

২৪৮ খ্রিস্টাব্দে শাপোর তাঁর পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার রোম অভিযান করেন। এবার বিজয়লক্ষ্মী তাঁর পক্ষে ছিল। রোমান সম্রাট বলেব্রিয়ান এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ইরানী বাহিনীর প্রতিরোধ করতে আসেন, প্রাথমিকভাবে শাপোরকে কয়েক জায়গাতে

পিছিয়ে আসতে হয় কিন্তু অস্ত্রিম যুদ্ধে শাপোর শুধু রোমান বাহিনীকে পরাজিতই করেননি, তাদের সম্রাট বেলেরিয়ানকে বন্দীও করেন। এই পরাজয় রোমের গর্বে দারুণভাবে আঘাত হানে অন্যদিকে ঘোষণা করে শাসানি বংশের গৌরবকে। আধুনিক কালের ইরানও শাপোরের ওই বিজয়ের জন্য গর্ববোধ করে। বর্তমান শাহ পহলবীর পুত্রের শাপোর নামকরণও হয়তো ওই কারণেই হয়েছে।

মানি এবং তাঁর ধর্ম — শাপোরের শাসনের কিছু আগে ইরানের বুকে একজন মহান ধর্মনেতার জন্ম হয়েছিল। শাপোরের রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি তাঁর ধর্মমত ঘোষণা করেন এবং অল্প দিনের মধ্যে তিনি রাজদরবারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। পরবর্তী কালে কোনো কারণে সম্রাটের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয় এবং তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। নির্বাসিত অবস্থায় তিনি ভারতবর্ষ এবং মধ্য এশিয়া ভ্রমণ করেন। তাঁর ধর্মমতকে খ্রিস্টধর্ম, জরথুষ্ট্র মতবাদ এবং বৌদ্ধধর্মের এক মিশ্রণ বলা চলে। জরথুষ্ট্র মতে ব্রত, উপবাস ও সারাজীবন ব্রহ্মার্চ্য পালনকে অপ্রয়োজনীয় বলা হয়েছে। কিন্তু মানি সেগুলিকে সমর্থন করতেন। তিনি যীশু, বুদ্ধ এবং জরথুষ্ট্রকে দিব্য আদেশ বাহক বলে মনে করতেন। শাপোরের মৃত্যুর পর (২৭২ খ্রিঃ) মানি আবার ইরানে ফিরে আসেন, কিন্তু ধর্ম প্রচারে আগের সাফল্য আর ফিরে পাননি। মানি একজন ধর্মনেতাই শুধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন চিত্রকর ও কবি। সাসানি যুগের চিত্রকলা বহুভাবে তাঁর কাছে ঋণী।

দ্বিতীয় শাপোর (৩০৬ - ৩৯৬ খ্রিঃ)

সাসানি বংশের ইতিহাসে দ্বিতীয় শাপোরের স্থান অনেক উঁচুতে। এজন্য তাঁর নামের আগে মহান শব্দটি যোগ করা হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকা সত্ত্বেও ঘরোয়া বিবাদের জন্য তিনিই উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। সম্রাটের নাবালক অবস্থায় ইরানের সমস্ত প্রগতি স্তব্ধ ছিল। সৌভাগ্যবশত রোম তার অভ্যন্তরীণ বিবাদে এত ব্যস্ত ছিল যে ইরানের ওরকম দুর্বলতম অবস্থাতেও প্রথম শাপোরের কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারেনি। তবে রোমের সঙ্গে পরম্পরা গত বৈরীভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। রোমের সম্রাট কনস্টানটাইন তখন সদ্য সদ্য খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে, ধীরে ধীরে শক্তি সংহত করছিলেন। তাঁকে খ্রিস্টানদের ধর্মরাজা এবং রক্ষক বলে প্রচার করা হচ্ছিল এমনকি ইরানে বসবাসকারি খ্রিস্টানদের ভালোমন্দের দায়িত্ব তাঁর বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। শাপোর কনস্টানটাইনের শক্তি বৃদ্ধির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন, কিন্তু তিনি রোম অক্রমণ করার কথা চিন্তা করেননি। ইরানের সৌভাগ্য যে কনস্টানটাইন ৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুর আগে তাঁর সাম্রাজ্য তিন পুত্রের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন। রোম সাম্রাজ্য এভাবে তিন ভাগে ভাগ হওয়ায় তাদের শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পায়। ফলে শাপোরের সামনে তেমন কোনো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর উপস্থিতি ছিল না।

আর্মেনিয়াতেও শাপোরের অনুকূলেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ওখানকার রাজা তিরিয়াতেশ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, এবং সমস্ত প্রজাদেরও ওই ধর্ম স্বীকার করার জন্য জোর জবরদস্তি করা হচ্ছিল। আর্মেনিয়ার প্রজারা এজন্য প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল। ইতিমধ্যে তিরিয়াতেসের মৃত্যু হয়। ৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে শাপোর রোমের বিরুদ্ধ অভিযান করেন। রোমকে যত দুর্বল তিনি মনে করেছিলেন রোম বস্তুত তত দুর্বল ছিল না। দুবছর যুদ্ধ এবং ষড়যন্ত্র চালিয়ে কেবল আর্মেনিয়াই দখল করতে

পারলেন। এশিয়া মাইনর এবং মেসোপটেমিয়াতে তাঁর সাফল্য তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। মধ্য এশিয়াতে তখন প্রচণ্ড রূপে হুন আক্রমণ চলছিল। শাপোরের অবিলম্বে দেশে ফেরা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রোমও তার গৃহবিবাদ থেকে মুক্ত হতে না পারায় ইরানের সঙ্গে সন্ধিতে আগ্রহী ছিল। অবশেষে রোম ও ইরানের মধ্যে সমস্ত বিবাদ আট বছরের জন্য স্থগিত থাকল, এই মর্মে এক সন্ধি হয়। শত্রু হিসাবে হুনেরা প্রচণ্ড দুর্জর্ষ ছিল। সাত বছর ধরে (৩৪০-৩৪৭ খ্রিঃ) শাপোরকে তাদের বিরুদ্ধে একটানা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। অবশেষে শাপোর জয়ী হন এবং ইরানের পূর্বোত্তর সীমা থেকে এক জবরদস্ত শত্রুকে হঠাতে সমর্থ হন। রোম আবার শত্রুতা আরম্ভ করায় শাপোরকে সে দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। তিনি রোম সম্রাটকে একটি দাবি পত্র পাঠান। সোম, সূর্য বান্ধব শাহানশাহ শাপোর তাঁর ভাই কাইজার কনস্টানটাইনকে (Constantius) নমস্কার জানাচ্ছে। পত্র লেখক স্বয়ং সাক্ষী যে ম্যাসিডোনিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত ভূমি একবার আমাদের পূর্বজদের অধিকারে ছিল। এখন যদি আমি বলি ওই ভূমি প্রত্যর্পণ করতে হবে তাহলে তা অনুচিত হবে না। কিন্তু অতটা দাবি আমি করব না। আমি সম্ভুষ্ট হব, যদি মেসোপটেমিয়া— যা আমার পিতামহের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল — ফেরত দেওয়া হয়। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি আমার রাজদূত অকৃতকার্য হয়ে ফেরে, তাহলে শীত শেষ হলেই আমার সেনাবাহিনী রোম অভিযান করবে।

রোম আর্মেনিয়া ও মেসোপটেমিয়া ইরানকে ফেরত দিতে মোটেই রাজি ছিল না, অতএব যুদ্ধ অবশ্যস্বাবী হয়ে উঠল। খুব ভয়ানক যুদ্ধ হলেও কোনো অস্তিম ফল পাওয়া গেলো না। ৩৬১ সালে কাইজার কনস্টানটাইনের মৃত্যু হওয়ায় জুলিয়ন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। রণকৌশল ও বীরত্বে জুলিয়ন আলেকজান্ডারের সমকক্ষ ছিলেন, এবং তাঁর পরিচালনায় রোমানরা উৎকৃষ্ট রণকৌশল দেখায়। জুলিয়ন বেশ কয়েকবার শাপোরকে পরাজিত করেন এবং তাঁকে তাড়িয়ে ইরান সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যান। আর একটু সাহস করে অগ্রসর হলে তিনি ইরানের ভিতরেও ঢুকে পড়তে পারতেন কিন্তু রোমান সৈন্য সীমান্ত থেকেই ফিরতে আরম্ভ করে। রোমানরা পিছু ফিরতেই শাপোর আবার তাঁদের আক্রমণ করেন। ২৩ জুন ৩৬৩ খ্রিস্টাব্দে শাপোরের কাছে এক শুভদিন হয়ে দেখা দেয়। জুলিয়ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত হন এবং সেই আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। জুলিয়নের মৃত্যুতে রোমান সৈন্য হকচকিত হয়ে পড়ে এবং তাদের পরাজয় ঘটে। শাপোর প্রথমে যা চেয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি কিছু দিয়ে তারা সন্ধি করে।

শাপোরের শাসনকালে ইরান সম্পদ এবং আত্ম মর্যাদার চরম শিখরে পৌঁছায়।

বহরাম গোর (৪২০-৪৪৪ খ্রিঃ)

বহরাম গোর সাসানি বংশের আর একজন বাহাদুর সম্রাট। পিতার (যজ্ঞগর্দ) মৃত্যুর পর দরবার এবং সমাস্তদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপন সামরিক শক্তি ও দক্ষতার জোরে সিংহাসন অধিকার করেন। রোম যখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেনি, তখন উভয় পক্ষের যুদ্ধ কেবল রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকত, কিন্তু রোম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে ধর্মও যুদ্ধের একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছু ইরানী প্রজা যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং তারপর থেকে তারা ইরানে বাস করলেও আনুগত্য দেখাত রোমের প্রতি। অতএব ধর্মীয় কারণে সংঘর্ষ বেড়ে চলেছিল,

যার ফলে অসামরিক লোকজনও প্রাণ হারাচ্ছিল। বহরাম গোর এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য 'আক্রমণই শ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা' এই প্রবচন অনুসরণ করে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাছাড়া রোম শাপোরকে দেওয়া পাঁচটি প্রদেশ সুযোগ বুঝে আবার দখল করে নিয়েছিল। দুবছর যুদ্ধের পর দুপক্ষে আবার সন্ধি হয়। সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল রোম অধিকৃত অঞ্চলে জরথুষ্ট্র মতাবলম্বীদের ওপরে কোনো অত্যাচার করা হবে না, অন্যদিকে বহরাম গোর ও তাঁর রাজ্যের খ্রিস্টানদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন।

বহরামের বড়ো সাফল্য ছিল হুনদের আক্রমণের ভীতি থেকে জাতিকে মুক্ত করা। ৪২৪ খ্রিস্টাব্দে হুনেরা বক্ষু নদী পার হয়। বহরাম যদিও হুনদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছিলেন তবুও হুনেরা বারবার আক্রমণ করেছে এবং কয়েক পুরুষ ধরে ইরানী সম্রাটদের তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে। ওই সময়ে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য হুণদের আক্রমণ বুঝে তাদের পরাজিত করেছিলেন। বহরাম গোরের আমলে ভারত থেকে অনেক লোক যাদের পেশা ছিল নাচ গান করা, ইরানে গিয়েছিল, তাদের বলা হতো জিপস (Gypsies)। তাঁর আমলে ইরান ও ভারতবর্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ভারতে বহুকাল প্রচলিত গদহিয়া পয়সা বহরাম গোরের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত। জংলি গাধাকে পারসি ভাষায় গোর বলা হয়।

কবদ (৪৮৭-৪৯৮ খৃঃ)

কবদ—এর আমলেও ইরানে হুন আক্রমণের আশংকা ছিল। ইরান হুনদের কর দিতে বাধ্য করেছিল। খজার নামে এক তুর্ক জাতি কাস্পিয়ান সাগরের তটভূমিতে বাস করত, সাসানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করলে কবদ তাকে সাফল্যের সঙ্গে দমন করেন।

মজদক — এই সময় সাম্যবাদী বিচারক মজদকের জন্ম হয়। তাঁর মত ছিল যে, সমস্ত মানুষ সমানভাবে জন্ম নেয় অতএব সমস্ত মানুষেরই সমভাবে থাকা উচিত। শুধু সম্পত্তি নয়, স্ত্রীর ওপরেও ব্যক্তিগত অধিকারের বিরুদ্ধে ছিলেন মজদক। তাঁর এই সমাজবাদী চিন্তাধারার বিশ্লেষণে এত আকর্ষণ থাকত যে হাজার হাজার লোক তাঁর অনুগামী হয়েছিল। আধ্যাত্মিক শিক্ষা ছিল—সংযম, শ্রদ্ধা এবং জীবো দয়া। মজদকের প্রভাব জনগণের মধ্যে এত বেশি ছিল যে স্বয়ং শাহানশাহ কবদও তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন।

মজদক তাঁর শিক্ষা প্রচারে একদিকে যেমন ব্যাপক সাড়া পেয়েছিলেন, অন্যদিকে তাঁর বিরোধীদের সংখ্যাও দিনদিন বাড়ছিল। মজদককে অযথা প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধে শাহানশাহ কবদের নামেও নানা অভিযোগ ওঠে। পুরোহিত সম্প্রদায় এবং সামন্তদের যৌথ চক্রান্তে কবদ সিংহাসন চ্যুত হন, এবং তাঁর ভাই জামাস্পকে সিংহাসনে বসানো হয়। কবদের প্রাণদণ্ডের জন্য মজদক বিরোধীরা জামাস্পের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই জামাস্প ভ্রাতৃহত্যায় রাজি হননি। কিছু কাল পর কবদ কারাগার থেকে পালিয়ে হুনদের আশ্রয়ে চলে যান, পরে তাদের সৈনিক সহায়তায় আবার ইরানের সিংহাসন দখল করেন। যদিও কবদ মজদকের অনুগামী ছিলেন কিন্তু রাজশক্তির পক্ষ থেকে তাঁকে কোনো সমর্থন দিতেন না। কবদের সময়ে রোম ও ইরানের সুদীর্ঘ কালের শান্তি বিদ্বিত হয়। ৫০৩ খ্রিস্টাব্দে রোম আর ইরানের মধ্যে যে বিবাদ আরম্ভ হয় তা অমীমাংসিতই থেকে যায় এবং কালক্রমে উভয় শক্তিই এত দুর্বল হয়ে যায়

যে সপ্তম শতাব্দীতে আরবেরা উভয়কেই গ্রাস করে।

কবদ পুনরায় সম্রাট হওয়ায় মজদকপহীদের পালে বাতাস লাগে। অতঃপর আবার শুরু হয় ষড়যন্ত্র। পাশ্চাৎ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে মজদকেরা শক্তি সংহত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। এর ফলে কবদও তাঁদের প্রতি বুট হন এবং তাঁর আদেশে কয়েক সহস্র মজদক পহী তরবারির খাদ্য হয়।

হুনদের কবদ সাফল্যের সঙ্গে দমন করেছিলেন, কিন্তু রোম সম্বন্ধে সে কথা বলা যাবে না। তাহলেও তাঁর চল্লিশ বছরের শাসনকাল ইরানে শান্তি ও বৈভবের কাল ছিল।

নৌশের বাঁ [অনাবশির বান] (৫৩১-৫৭৮ খ্রিঃ)

সাসানি বংশের আর এক প্রতাপশালী রাজার নাম অনাবশির বান। পিতা দ্বিতীয় কবদের ইচ্ছা ছিল যে নৌশের বাঁ-কেই যেন রাজা করা হয়। কবদের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ সন্তান সিংহাসনে বসেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মৃত শাহর ইচ্ছানুসারে তাকে সরিয়ে নৌশের বাঁকে সিংহাসনে বসান। তিনি সিংহাসনে বসার পরও তাঁর বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র অব্যাহত ছিল। নৌশের বাঁ একজনকে বাদ দিয়ে সমস্ত ভাই ও ভ্রাতৃস্পুত্রদের হত্যা করেন। মজদক তখনও জীবিত এবং তাঁর অনুগামীর সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। নৌশের বাঁ-র নাম ছিল খুসরো। সমস্ত মজদকপহীদের তিনি হত্যা করেন এবং নাম নেন নব-শিরবান (নতুন রাজা)।

নৌশের বাঁ তাঁর ন্যায়পরায়ণতার জন্য খ্যাত ছিলেন। তাঁর ন্যায় সম্পর্কিত অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে। তিনিও একজন সুশাসক ও ভালো যোদ্ধা ছিলেন। পূর্বোক্তরে হুন এবং পশ্চিমে রোম তখনও তাঁর শত্রু ছিল। তিনি রোমের সঙ্গে একটা সন্ধি চুক্তিতে আসার চেষ্টা করেন এবং আংশিক সাফল্যও লাভ করেন। তবে দুটো ভিন্ন ধর্মের এবং দীর্ঘদিনের শত্রু জাতির মধ্যে এত তাড়াতাড়ি সমঝোতা হয় না তা তিনি জানতেন। কিন্তু রোমের অনমনীয় মনোভাবের জন্য নৌশের বাঁ রোমের সঙ্গে যুদ্ধ করে রোমকে পরাজিত করেন। রোমকে এই শর্তে সন্ধি করতে হয় যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচ হাজার পাউন্ড সোনা দিতে হবে, আর সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতি বছর দিতে হবে পাঁচশো পাউন্ড সোনা। তবে এই অসম সন্ধি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। নৌশের বাঁকে রোমের বিরুদ্ধে আরও কয়েকবার তরবারি ধরতে হয়েছিল।

৫৭২-৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে নৌশের বাঁ তৃতীয় দফা রোম আক্রমণ করেন। নৌশের বাঁ তখন বৃদ্ধ, রোমের ভরসা ছিল সেটাই। কিন্তু বৃদ্ধ নৌশের বাঁ-র মধ্যেও যৌবনের শক্তি অটুট ছিল। তিনি রোমানদের পরাজিত করে একেবারে ভূমধ্যসাগরের তীরে পৌঁছে দেন। রোম সম্রাট গাস্টিন বাধ্য হন তিবেরিয়াস-এর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করতে। পাঁচশি হাজার স্বর্ণখণ্ড উপটোকন দিয়ে রোম নৌশের বাঁ-র কাছ থেকে এক বছরের জন্য শান্তি ক্রয় করে। তিবেরিয়াসও একবার যুদ্ধ প্রস্তুতি করেছিল, তবে যুদ্ধ যাত্রায় সাহস হয়নি। তিরিশ হাজার স্বর্ণখণ্ড ভেট দিয়ে সে তিন বছরের জন্য শান্তি ক্রয় করে। এই সব ঘটনা নৌশের বাঁ-র বীরত্ব ও বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে। নৌশের বাঁ শিল্প সাহিত্যের পরম অনুরাগী ছিলেন। তাঁর আমলেই পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের পারসি অনুবাদ হয়েছিল।

খুসরো পরভেজ (৫৯০ - ৬২২ খ্রিঃ)

কয়েক পুরুষ পর আবার ইরানের সিংহাসনে একজন বিজয়ী শাসক বসেন। পরভেজ শব্দের অর্থ

বিজয়ী। সাসানি বংশের ইতিহাসে তিনিই শেষ বীর। সিংহাসনে বসার অব্যবহতি পরেই তাঁকে তাঁরই এক প্রভাবশালী সেনাপতির বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। এই সময় রোম তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। অবশেষে সেনাপতি বারহাম পরাজিত হয়। রোমান সম্রাট মরিসের সেই সাহায্যের জন্য খুসরো তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। ৬০১ খ্রিস্টাব্দে মরিস আততায়ীর হাতে নিহত হলে খুসরো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, এবং প্রতিশোধ নেবার বাসনায় এশিয়া মাইনরে রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং জয়ী হন।

খুসরোর শাসনকালে আর একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। তখন আরবি সর্দার নোমানের কন্যা শিরির রূপের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। খুসরোর কানে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি নোমানকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর কন্যার পানি প্রার্থনা করেন। আরবি সর্দার খুসরোকে কন্যাদানে অস্বীকৃতি জানায়। ৬১১ খ্রিস্টাব্দে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নোমানকে ধরে আনতে গেলো। নোমান তাঁর কন্যাকে নিয়ে শয়বানীদের আশ্রয়ে চলে যান এবং সেখানে কন্যাকে শয়বানীদের সর্দার দানীর হাতে তুলে দিয়ে খুসরোর কাছে ফিরে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শাহ নোমানের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন এবং শয়বানীদের আদেশ করেন শিরিকে ফেরত দিতে। শয়বানীরা শাহর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে চল্লিশ হাজারের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী শয়বানীদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। ইরানী সৈন্যবাহিনীতে ইরানী ছাড়াও আরব এবং গ্রিক সৈন্যও ছিল। সম্রাটের আরবি সেনারা যুদ্ধের এক পর্বে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে যোগ দেয় এবং ইরানীরা পরাজিত হয়। ইরানের এই পরাজয় ইরানের মান মর্যাদাকে আরবদের চোখে অনেক হীন পর্যায়ে নামিয়ে আনে, এবং যুদ্ধে জিতে তাদের সাহস ও মনোবল যথেষ্ট বেড়ে যায়। এটা ছিল সেই সময় যখন পয়গম্বর মুহাম্মদ এক নতুন ধর্ম প্রচার করছিলেন এবং মদীনা ও মক্কাতে ভবিষ্যতের এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত গড়ছিলেন।

জুরকরের যুদ্ধে যদি আরবদের হার হতো, তাহলে তার প্রভাব সারা বিশ্বের ওপরে পড়ত। পরাজিত আরবরা আর কথায় কথায় তরবারি তোলার সাহস পেত না। ইসলামের উত্থানও এত সহজ হতো না। ঘটনাটি যখন ঘটেছিল তখন তার ফলাফল এত বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি। দেখা হলে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তিকে একত্রিত করে আরবদের ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় ব্রতী হতো এবং সপ্তম শতাব্দীতে বর্বরদের হাতে হয়তো দেশের স্বাধীনতা খোয়াতে হতো না।

রোমে গৃহযুদ্ধ চরম আকার ধারণ করেছিল। সুযোগ বুঝে খুসরো রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি এশিয়া মাইনরের রোমান প্রদেশগুলিকে দখল করে, ফিলিস্তিন (৬১৬ খ্রিঃ) এবং আলোকজাজিয়াও দখল করে নেন। নয় শতাব্দী পর নীল নদের তীরে আবার ইরানের বিজয় পতাকা উড়ল। মিশর ইরানের একটি প্রদেশে পরিণত হলো। উত্তরে আর্মেনিয়া সহ আরও কয়েকটি প্রদেশ ইরান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। ৬২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইরানের সৌভাগ্য তারকা ওপরে উঠতেই থাকে। এই সময়ে হেরাক্লিয়াস নামে এক নিপুণ যোদ্ধা রোমের শাসনভার গ্রহণ করেন। খুসরো রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হেরাক্লিয়াস খুসরোর সেনাপতি সাহেবরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। পরের বছর খুসরো আবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এবারের যুদ্ধ এত ভয়ংকর

ছিল যে খুসরো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। সাহেবরাজ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে আর-একবার চেষ্টা করেও বিফল হন। এবার ছিল রোমের পালা। ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে হেরাক্লিয়াস ইরান আক্রমণ করেন। রোম-ইরানের এই চতুর্থ যুদ্ধে ইরানের পরাজয় হয়, তবুও এটি নির্ণায়ক যুদ্ধ ছিল না। ইতিমধ্যে, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে পয়গম্বর মুহাম্মদের দেহাবসান হয়। ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে খুসরো তাঁর সমস্ত শক্তি সংহত করে হেরাক্লিয়াসের সম্মুখীন হন। ১২ ডিসেম্বর মেসোপটেমিয়ার কাছে দুই বাহিনী প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং ইরান পরাজিত হয়। ঘটনাচক্রে মনে হতেই পারে যে ইরান পরাজিত এবং রোম বিজয়ী হয়েছিল কিন্তু বস্তুত ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে শক্তি হ্রাস পেয়ে উভয় পক্ষই পরাজিতের দলে ঠাই নেয় আর বিজয়ীর আসন দখল করে আরবিরা। সপ্তম শতাব্দীতে আরবের তরবারি ওই দুই শক্তিকেই অনায়াসে ধ্বংস করে দেয়।

খুসরো তাঁর রাজত্বকালেই রাজ্যের চরম উন্নতি এবং অবনতি উভয়কেই স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এক সময় তাঁর বিজয়ী সেনা কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্য সাগর, আর নীল নদের মোহনায় অবাধ গতিতে অগ্রসর হতো, ইরানীরা তাঁকে কোরোশ ও দারায়োশের সঙ্গে একাসনে বসাত আবার তাঁরই রাজত্বের শেষ দিকে রোমানরা তাঁর রাজধানী পর্যন্ত লুণ্ঠপাট করে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। সাসানি বংশের সমস্ত মান মর্যাদা তাঁর হাতেই ধ্বংস হয়ে যায়। এই সমস্ত ঘটনার ফলে খুসরো মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি দিনে দিনে সন্দ্বিগ্ন এবং অত্যাচারী হয়ে উঠতে থাকেন। সাহেবরাজের মতো বিশ্বস্ত সেনাপতি সহ অনেক সামন্তকে তিনি হত্যা করেন। তাঁর অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং খুসরোকে বন্দী করা হয়। বন্দী অবস্থাতেই খুসরোর মৃত্যু হয়।

তৃতীয় যজ্ঞদর্দ (৬৩৮-৬৪২ খ্রিঃ)

খুসরো পরভেজের মৃত্যুর পর ইরানে যা চলেছিল তাকে বলা যায় মাংস্যান্যায়। একের পর এক রাজকুমার রাজকুমারীরা সিংহাসনে বসে, নামে এবং জন্মদের হাতে সমর্পিত হয়। এভাবে চলতে চলতে সাসানি বংশের অন্তিম শাহ যজ্ঞদর্দ সিংহাসনে বসেন। তৃতীয় দারায়োশের মতো তিনিও যখন রাজা হন তখন বংশের ভাগ্যরবি প্রায় অস্তাচলগামী। যে বংশের চারশো বছরের শাসনকালে একাধিক বীর যোদ্ধা ও উত্তম শাসক জন্ম নিয়েছিল, অতিরিক্ত বিলাস ব্যসন, অন্তর্কলহ এবং অদূরদর্শিতার কারণে তা ধ্বংশের দিকে চলে গিয়েছিল। পয়গম্বর মুহাম্মদের মৃত্যুর পর খলিফা আবুবকর আরবের শাসক হয়েছিলেন। আরবি যোদ্ধাদের মধ্যে মরুভূমির বেদুইনদের দুঃসাহসিকতা, নির্ভীকতা, পরিশ্রম করার ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অপার উৎসাহ। ইসলাম এক একটি আরবি সৈনিকদের মধ্যে ধর্মপ্রচারকের উৎসাহ সঞ্চার করতে পেরেছিল। ইসলাম তাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছিল যে যুদ্ধে নিহত হলে তোমার জন্য বেহেস্ত (স্বর্গ) অপেক্ষা করছে আর জিতলে অপেক্ষা করছে বিশ্বের সাম্রাজ্য ও তার অতুল সম্পদ। এই ভাব তাদের মনে কত তীব্রভাবে প্রবিস্ট হয়েছিল তার একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক। কয়েকজন ক্ষুধার্ত আরব খেজুর ভেঙে খেতে যাবে এমন সময় যুদ্ধের ডাক এল। তারা খেজুর ফেলে রেখে যুদ্ধের জন্য চলল, বলল— মরলে ওখানে (বেহেস্তে) তো আঙুর পাবোই, কি দরকার আর খেজুরের। জুরকরের যুদ্ধে ইরানের

পরাজয় আরবিদের মনোবল বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছিল। এছাড়া অতি নিকট প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে আরবেরা ইরানের দুর্বলতাগুলিকেও ভালোমতোই জানত।

৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে আরবেরা ইরাক (মেসোপটেমিয়া) ও সিরিয়া আক্রমণ করে। খালিদ নামে এক চতুর সেনাপতি আরব বাহিনীর নেতৃত্ব পদে ছিল। সমস্ত আরবি সৈন্যরাই ছিল বেদুইন গোষ্ঠীর। খালিদ পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলিকে আক্রমণ করে সেখানকার ক্ষত্রপদের চিঠি লিখল — যদি ইসলাম কবুল করো, রক্ষা পাবে, নাহলে তোমাকে এবং তোমার লোকজনদের কর দিতে হবে। যদি অস্বীকৃত হও, তাহলে সমস্ত দায় তোমার। তোমরা এখন এমন লোকদের মুখোমুখি হতে চলেছ যারা মৃত্যুকে তেমনই ভালোবাসে যেমন তোমরা ভালোবাসো জীবনকে।

আরবি সেনা সংখ্যায় বেশি ছিল না এবং অধিকাংশই ছিল অশ্বারোহী। অন্যদিকে ইরানী সৈন্য সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল এবং তাদের কাছে অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামের সঙ্গে কয়েকটি রণহস্তীও ছিল। খালিদ ইরানী সেনানায়ক হরমুজকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল এবং উৎসাহী আরব তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। এরপর আরবেরা প্রতিপক্ষের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের আক্রমণের তীব্রতায় ইরানী সেনারা দিশেহারা হয়ে যায়। যুদ্ধে আরবেরা প্রচুর সম্পদের সঙ্গে একটি হাতিও পেয়েছিল, যেটিকে মদিনাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই যুদ্ধকে বলা হয় জঞ্জীরের যুদ্ধ। বিশাল সংখ্যক বন্দী ইরানী সৈন্যদের জঞ্জীরাবদ্ধ (শিকল) করে রাখা হয়েছিল বলে যুদ্ধের এই নাম হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধ ছিল প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এরপর ধারাবাহিকভাবে আরবের সঙ্গে ইরানীদের যুদ্ধ চলতে থাকে। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে মুসন্না নয় হাজার সৈন্য নিয়ে শাহকে আক্রমণ করে। বাবুলের কাছে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হয়। সংখ্যায় এবারও শাহর সেনাই বেশি ছিল। যুদ্ধের গতি প্রকৃতি দেখে মুসন্না মদিনাতে পালিয়ে যায় এবং খলিফা আবুবকরকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। মৃত্যু শয্যায় শায়িত খলিফা তাঁর উত্তরাধিকারী উমরকে ইরান জয়ের জন্য উৎসাহিত করেন। বাবুলের যুদ্ধে চার হাজার আরব সৈন্য নিহত হয়েছিল, দু-হাজার মদিনাতে পালিয়েছিল। যদি তখন ইরানী সৈন্য তাদের পিছু নিতে পারত তাহলে অবশিষ্ট সৈন্যদেরও ধ্বংস করতে পারত, কিন্তু তখনই রাজধানী থেকে গোলমালের সংবাদ পাওয়ায় সৈন্যবাহিনীকে ফিরে আসতে হয়। উমর যখন এই পরাজয়ের কথা শুনলেন তখন হতাশ না হয়ে পরবর্তী যুদ্ধের জন্য পুনোদ্যমে প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। কুফাতে উভয় পক্ষের সেনাদের আবার দেখা হলো। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইরানীরাই সাফল্য পেতে থাকে, বিশেষ করে তাদের রণহস্তীরা আরবি সওয়ারদের মধ্যে ভ্রাসের সৃষ্টি করেছিল। সেনাপতি মুসন্না যুদ্ধে আহত হয় পরে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরবরাই যুদ্ধে জয়লাভ করে। পরবর্তী কালে আরবেরা ইরানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে দামস্কাস ইত্যাদি রোমান অঞ্চল দখল করতে শুরু করে।

আরবেরা যখন যজ্ঞদগর্দকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বলে তখন তিনি ঘৃণাভরে বলেছিলেন— দরিদ্র ও শিশুদের হত্যা করা যাদের প্রথা, যারা গিরিগিটি পর্যন্ত খায় তাদের ধর্ম স্বীকার করব? আরবেরা শাহর অভিযোগ স্বীকার করে বলেছিল — হ্যাঁ, আগে আমরা অমনই ছিলাম কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। আমরা দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত কিন্তু আমরা আমাদের সুখী ও সন্মদ

করবেন। তুমি যদি আমাদের ধর্ম স্বীকার না করো তাহলে তরবারিকেই স্বীকার করো। আরবেরা অস্তিত্ব যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে থাকে। ইরান একলক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে কদইসিয়া ময়দানে আরবদের মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে শুধু ইরানেরই ভাগ্য নির্ধারিত হলো না, সারা বিশ্বের ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে গেলো। চারদিনের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ইরানী সৈন্য পরাজিত হয়। যুদ্ধে অপার ধনসম্পদ আরবদের হস্তগত হয়। এই সম্পদের মধ্যে ইরানের জাতীয় পতাকা ‘দুর-অফশানী’^১ও ছিল। এই পতাকা নানা ধরনের হীরা মুক্তা খচিত ছিল, যার মূল্য প্রায় চারলক্ষ টাকা। কদসিয়ার যুদ্ধের পর আরবদের আর তেমন কোনো বড়োসড়ো যুদ্ধে যেতে হয়নি। আরবেরা মেসোপটেমিয়া জয় করে একের পর এক পারস, কারমান, কুর্দিস্তান, সিস্তান এবং খোরাসান জয় করে বালুচিস্তানের সীমানায় মকরান পর্যন্ত জয় করে নেয়। এইভাবে প্রতাপী সাসানি বংশের অবসান হয় এবং ইরান তার জাতীয় স্বাধীনতা হারায়। শাহ যজদগর্দ ব্যক্তিগতভাবে কোনো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। তাঁর মধ্যে সে-সাহস এবং বীরত্ব কোনোটাই ছিল না। জনগণের মধ্যে সাসানি বংশের প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে কোনো সেনাপতি ওই রাজবংশের পরিবর্তে নতুন কোনো রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করতেও পারেনি। যজদগর্দ তাঁর রাজ্যকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। প্রথমে তিনি বলখে যান। সেখানকার তুর্করা প্রথমে তাঁকে সাহায্য করে পরে তারা শাহর সঙ্গ পরিত্যাগ করে। পরিশেষে মর্বকের একটি কুটিরে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। অর্থের লোভে কেউ তাঁকে হত্যা করেছিল। যজদগর্দের সঙ্গে সঙ্গে ইরানের ইরানী যুগের ইতিহাসও শেষ হয়। বর্তমানের স্বাধীন ইরান সেই ইরানী ইরানের জন্য গর্ববোধ করে। অখামনশী ও সাসানি বংশের গৌরবের ইতিহাস তাদের প্রেরণার উৎস। আজ সে তার জাতীয় পুনর্জীবনের পথে সেই ইতিহাসকেই অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করছে।

অ-ইরানী ইরান (৬৪২-১৪৯৯ খ্রিঃ)

যুদ্ধে হেরে ইরান আরবের অধীনতা ও ধর্ম দুটোকেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই তারা বুঝতে পারল যে এই কাজ করে জাতির প্রতি তারা অন্যায় করেছে। ইরানী সভ্যতা, যার তুলনা কেবল বিশ্বের অন্য উন্নত সভ্যতার সঙ্গেই করা চলত, সেই সভ্যতা আরবের মরু সভ্যতার ক্রীতদাসীতে পরিণত হলো। ইরানের নিজস্ব ইতিহাসের যাতে কোনো চিহ্নমাত্র না থাকে তার জন্য বিজেতারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিল। খুঁজে খুঁজে ইরানী সাহিত্যসম্ভারকে পুড়িয়ে দেয়া হয়। ইরানী ভাষাকে উপেক্ষা করে তাকে এক অবমাননাকর অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়। ইরানীরা কতকাল এই জাতীয় অবমাননা সহ্য করতে পারে বিশেষ করে যখন তারা খলিফার দরবারে আপন যোগ্যতায় বড়ো বড়ো রাজপদ অধিকার করছিল। সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সমস্ত ইসলামি ধর্মীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার রচয়িতাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে তাঁদের অধিকাংশই

১. প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইরানের রাজসিংহাসনে জোহাক নামে এক অত্যাচারী রাজা বসেছিলেন। তার অত্যাচারে জর্জরিত প্রজাদের পক্ষ থেকে এক লৌহকার এগিয়ে এসেছিল প্রতিশোধ নিতে। সে তার চামড়ার পরিধেয়টিকে পতাকার রূপ দিয়ে জনগণকে বিদ্রোহের ডাক দিতে থাকে। জোহাক জোর করে সিংহাসন দখল করেছিল। বিদ্রোহ সফল হয় এবং সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারীকেই সিংহাসনে বসানো হয়। লৌহকারের পরিধেয় চামড়ার তৈরি পতাকাটি পরবর্তী কালে ইরানের জাতীয় পতাকার রূপ নেয় এবং তার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘দুর-অফশানী’।

ছিলেন ইরানী।

সুউরিষ্যা (অন-আরবীয়দের পক্ষপাতী) — খলিফার শাসনকালে দরবারে দুটো দলের প্রাধান্য দেখা যায়। একটা আরব আর একটি অন-আরব। ইরানীরা এই অন-আরব গোষ্ঠীটির নেতৃত্ব করত, এবং এদের বলা হত সুউবিষ্যা। এমনই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইসমাইল-বিন-ইয়াসার। জাতিতে তিনি ছিলেন ইরানী এবং তার সেই ইরানীয়ত্বের জন্য তিনি গর্বিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন — উদার রাজকুমার এবং শ্রেষ্ঠ কুলীন ক্ষত্রপেরা আমার পূর্বজ। যখন খুসরো, শাপোর ও হরমুজের মতো বীর যোদ্ধারা সিংহ বিক্রমে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তখন তুরান আর গ্রিসের বাদশাহদের মুখে হতাশার ছাপ দেখা যেত। দৃঢ় বর্ম বুকে ঐটে শিকারি বাঘের মতোই তাঁরা শত্রুর ওপরে লাফিয়ে পড়তেন। যদি তুমি চাও তাহলে তুমিও জানতে পারবে যে আমরা সেই জাতির সন্তান যারা এক সময় জগৎ শ্রেষ্ঠ ছিল। খলিফা হিশাম (৭২৪-৭৮৩ খ্রিঃ) ইসমাইলের এই অপরাধের জন্য তাঁকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করে, কিন্তু ইরানের আত্মাকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা সম্ভব ছিল না। ইরানের এই আত্মাভিমানের সঙ্গে আরেকটি বিষয় যুক্ত হয়েছিল। যজদগর্দের কন্যা শাহবানু যুদ্ধে আরবদের হাতে বন্দি হন, তাঁকে মদিনা পাঠানো হয়। মদিনায় পৌঁছানোর পর শাহবানুর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায় এবং পয়গম্বর মুহাম্মদের দৌহিত্র হোসেনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। পয়গম্বরের দেহাবসানের পর মুসলিম জগতের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং এক সময়ে এই বিরোধ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথম চারজন খলিফার (আবুবকর, ৬২২-৪২ খ্রিঃ, উমর, ৬৪২-৪৪৩ খ্রিঃ ওসমান, ৬৪৪-৬৪৬ খ্রিঃ এবং আলি ৬৪৬-৬১ খ্রিঃ) শাসন শেষ হতেই আমির এজিদ খলিফা হওয়ার চেষ্টা করে। অন্যদিকে পয়গম্বর মুহাম্মদের দৌহিত্র এবং আলির পুত্র হোসেনের যথেষ্ট প্রভাব মুসলমানদের মধ্যে ছিল। এজিদ অধীনতা স্বীকারের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাঁকে কুফায় (মেসোপটেমিয়ার রাজধানী) আসতে বলে এবং পথে কারবালা প্রান্তরে অত্যন্ত নৃশংসতার সঙ্গে হোসেন ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করে। যখন এজিদ সমবেত ছিল মুণ্ডুলোর মধ্য থেকে হোসেনের মুণ্ডটিকে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আলাদা করছিল, তখন জনৈক আরব বৃদ্ধ আর থাকতে না পেরে বলে উঠেছিল — আঃ! একটু আস্তে, এ যে পয়গম্বরের নাতি। আল্লাহর কসম আমি নিজে হজরতকে এর ঠোটে চুষন করতে দেখেছি। কারবালার হত্যাকাণ্ড মুসলমানদের চিরকালের জন্য দুটো সম্প্রদায়ে ভাগ করে দেয়। হোসেন ও আলির অনুগামীদের বলা হয় শিয়া, অন্যরা সুন্নি।

হোসেনের দুই নাবালক পুত্র আলি আসগর ও আলি হোসেনকে দামাঙ্কাসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আলি আসগরের মা শাহবানু ইরানী রাজকন্যা ছিলেন। এইভাবে আলি আসগরের দেহে একদিকে যেমন ইসলামের পয়গম্বরের পুত্র রক্ত প্রবাহিত ছিল অন্যদিকে সাসানি রংশের সম্মানিত রক্তও তাঁর দেহে ছিল। এই কারণে ইরানীদের তাঁর প্রতি একটা আবেগের অনুভূতি ছিল এবং এই মানোভাবই পরে সমগ্র ইরানকেই শিয়া মতাবলম্বী করে তোলে। ইরানীরা আলি আসগরের প্রতি ভক্তি ও মমত্ববোধ দেখিয়ে ইরানী জাতিসত্তার প্রতিই মমত্ব দেখিয়েছে। অন্যদিকে এজিদ ও তার সাক্ষপাঙ্গদের নিন্দার মাধ্যমে সে তার আক্রমণকারীদেরই নিন্দা করতে চেয়েছে। ইরানে খলিফাদের রাজত্ব চলেছিল চারশো বছরেরও বেশি (৬৪২-১০৬৭ খ্রিঃ)। দশম শতাব্দীর শেষ

ভাগে ইরানী কবি ও লেখকদের কলমে ইরানী জাতীয়তাবাদ মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে। তখন পারসি ভাষাও তার আপন মর্যাদা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছিল। পারসি ভাষার প্রথম মহাকবি রূদগী (সাসানি রাজকুমার দ্বিতীয় নশ ৯১৩-৯৪২খ্রিঃ) এবং আরও অনেক কবি লেখকের জন্ম ওই সময়ে হয়েছিল। কিন্তু পারসি ভাষার এবং ইরানের জাতীয় কবি হবার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছেন কবি ফিরদৌসী। তিনি শাহনামা লিখে ইরানের বিস্মৃত প্রায় স্বর্ণযুগের ইতিহাসকে নতুন করে শুনিয়েছেন।

ফিরদৌসীর কাছে ইরানী জাতি যে কতটা ঋণী, সেটা তাঁর সহস্রতম জন্মবার্ষিকীতে (১৯৩৪খ্রিঃ) শাহ পহলবীর দেওয়া ভাষণ থেকেই স্পষ্ট হয়। —আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ফিরদৌসীর জন্ম সহস্র বার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে ইরানী জাতির এক চিরন্তন ইচ্ছাকে পূরণ করার সুযোগ মিলেছে। এর মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের জাতির কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা ব্যক্ত করছি। আমাদের অপশেষ এই যে ফিরদৌসী জাতির যে সেবা করেছেন জাতি তার যোগ্য মূল্যায়ন এতদিন করে উঠতে পারেনি। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শাহনামার স্রষ্টাকে ইরানী জনতা তাঁদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছে তবে সেটা আরও যথার্থ হতো যদি বাইরে তার কোনো সাকার রূপ আমরা দেখতে পেতাম।

আরবদের শাসনের পর সেলজুক তুর্করা ১০৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইরান অধিকার করে। যদিও তার কিছু দিন আগেই পারসি সাহিত্যে নবযুগ আসতে শুরু করেছিল তথাপি তার সমৃদ্ধি ঘটেছিল এই সেলজুক শাসনের আমলে। এই তুর্কি শাসকেরা পারসি কবি ও সাহিত্যিকদের যথেষ্ট প্রোৎসাহন দিতেন।

ইরানী রাজবংশ (১৪৯৯ খ্রিঃ)

সেলজুক তুর্কদের পরে ইরান প্রথমে মঙ্গোল ও পরে তৈমুর বংশের হাতে যায়। এই অবস্থা বেশ কিছু কাল চলে। ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে একটি ইরানী রাজবংশ যার নাম ছিল সফাবী, ইরানের শাসনভার গ্রহণ করে। এই রাজবংশ শাসনাধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিয়াপন্থী ইসলাম ধর্ম ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষিত হয়। সফাবী বংশের পর আরও কয়েকটি রাজবংশ যেমন অফসারিয়া (১৭৩৬-৫০ খ্রিঃ), জাঘিয়া (১৭৫০-৮৭ খ্রিঃ), কাজারিয়া (১৭৮৭-১৯২৪ খ্রিঃ) ইরানে রাজত্ব করেছে। এর মধ্যে সফাবী বংশ ছিল ইসলাম পরবর্তী যুগের প্রথম ইরানী রাজবংশ। এই বংশ ইরানী জাতির সুখ সমৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল এবং সেই কারণেই তাঁদের রাজত্বের স্থায়িত্বও ছিল দীর্ঘকাল। মহান আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯ খ্রিঃ) মুসলমানি ইরানের সবচেয়ে খ্যাতনামা শাসক ছিলেন। তাঁর আমলে তৈরি বিশাল প্রাসাদ আজও ইস্পাহান ও তেহরানের শোভা বর্ধন করেছে। কাজারিয়া বংশের আমলে ইরান নতুনভাবে ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইরান, ইংরেজ এবং রুশ, উভয় শক্তির লোভের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

বিপ্লব (১৯০৪ - ১৯০৬ খ্রিঃ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রুশরা কাকাসাস, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, দাগেস্তান এবং আজারবাইজান প্রদেশ দখল করে। ঠিক সেই সময়ে ইংরেজরাও মওকা বুঝে বালুচিস্তানে পা রাখে এবং খনিজ

তেলের কুপগুলিকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে সমস্ত দক্ষিণ ইরান তাদের প্রভাবাধীন এলাকা হয়ে যায়। সমভাবে উত্তর ইরান ছিল রুশ প্রভাবাধীন। ইরানী বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সমাজ লক্ষ করেছিল যে কিভাবে তাঁদের দেশ বিদেশিদের পদপিষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে তাঁরা এও দেখছিলেন যে তাঁদের শাহ মুজফফরউদ্দীন বিদেশ সফর এবং নিজের বিলাসব্যসনের জন্য কিভাবে দেশের সম্পদের অপচয় ঘটিয়ে চলেছেন।

অবস্থার এতদূর অবনতি ঘটেছিল যে প্রজারা তাদের অধিকার দাবি করতে লাগল। এই সময় রুশ-জাপান যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ সমস্ত এশিয়াবাসীদের গর্বিত করেছিল। ইরানীরাও ওই জয়ের মধ্যে নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ দেখতে পেয়েছিল। জনতার ব্যাপক অংশ শাসনের অধিকার দাবি করে আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রথমদিকে শাহ মুজফফরউদ্দীন অন্যান্য স্বৈরাচারী শাসকদের মতো এই আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে এই আন্দোলন এক বিপ্লবের রূপ ধারণ করল। হাজার হাজার দেশভক্ত ইরানীকে কারাগারে পাঠিয়ে, গুলি চালিয়ে হত্যা করেও জনতার দাবিকে অস্বীকার করা সম্ভব হলো না। শাহ প্রজাদের পার্লামেন্টের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার দাবি মানতে বাধ্য হলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে মজলিশ মিল্লীর (জাতীয় সভা) উদঘাটন হলো।

অধিকার দেবার পরও শাহ ও তাঁর বশস্বদরা চেষ্টা করছিল যে প্রজারা যাতে সুষ্ঠুভাবে তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে না পারে। মুজফফরউদ্দীনের উত্তরাধিকারী মহম্মদ আলি শাহ ও তাঁর পূর্বসূরির মতোই বিলাসী ও অকর্মণ্য প্রমাণিত হয়েছিলেন। জনতা পুনরায় আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হলো। আন্দোলনের চাপে মহম্মদ আলি তাঁর বারো বছরের ছেলে আহমদ শাহ-র অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। সাবালক হওয়ার পর দেখা গেলো যে আহমদ শাহ-র অবস্থাও সেই রকম, সে তো ইরানে থাকতই না, ফ্রান্সই ছিল তার ঘর বাড়ি। মহাযুদ্ধের পর অন্য দেশের মতো ইরানেও পরিবর্তনের হাওয়া বইছিল। ইরান এখন এমন একজন জাতীয় নেতার সন্ধান ছিল যে তাদের দেশকে প্রতিবেশীদের আগ্রাসী মনোভাবের হাত থেকে রক্ষা করবে এবং দেশে এক নতুন ইরানী জাতীয়তাবাদের জোয়ার আনবে। জনগণ জেনারেল রজা খাঁর মধ্যে সেই নেতৃত্বের ছবি দেখতে পায়। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রজা খাঁ তাঁর বাহিনী নিয়ে রাজধানী তেহরান দখল করে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নতুন সরকারের তিনি হয়েছিলেন যুদ্ধ মন্ত্রী। ১৯২৪ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত পছন্দী মন্ত্রী মন্ত্রিসভা গঠন করে, দেশে ব্যাপক সংস্কারের কাজ আরম্ভ করেন। আহমদ শাহ বরাবর বিদেশেই থাকতেন। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধই ছিল না। অবশেষে ১৯২৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইরানের জনতা জেনারেল রজা খাঁ-কেই বাদশাহী পদে বসায়। ইরানে আরম্ভ হয় আর একটি নতুন যুগ— পছন্দী যুগ। রজাশাহ পছন্দী সম্পূর্ণভাবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেই দেশকে রুশ ও ব্রিটিশ প্রভাব মুক্ত করেন।

শাহ পছন্দী দেশে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রচলন করেন। আমদানি করকে বিদেশি অধিকার মুক্ত করেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক আধুনিকীকরণ করেন। সামরিক বিভাগে নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রতিষ্ঠা তাঁর আমলেই হয়। পুরানো মাপ ও ওজন বাতিল করে আধুনিক দশমিক প্রথা চালু করেন। সর্বত্র ব্যাপক

শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। ইরানী জনতা যাতে ইউরোপীয় পোশাক পরে সে জন্য নতুন আইন প্রণীত হয়। ধার্মিক কট্টরতা সহ অনেক কুপ্রথা তিনি দূর করেন। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব তিনি মেয়েদের বন্দীদশা ঘুচিয়ে পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের কাজ করার জন্য ফরমান জারি করে তাদের ওপর থেকে পর্দা প্রথা তুলে নেন। শুরুর সাপ্তাহিক ছুটির দিনের পরিবর্তে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন চালু করেন এবং দেশে সৌর তিথি ও সম্বত চালু করেন। *

পরিশিষ্ট

**Persia : Romance and Reality* (1935). By O. A. Merritt-Hawkes. Ivor Nicholson and Watson Limited, London.

“It is impossible to be long in Persia, to talk to many of the young, educated Persians, without realizing that Islam will go sooner or later.” P. 262

“The new spirit of nationalism in Persia has some of the elements of Fascism, for it looks back, largely, regardless of historical sequence and values, to the time when Persia was greater and more powerful than now and especially to pre-Islamic days—a period of 1300 years ago. There is a strong feeling of antagonism to even annoyance with, anything Arabian, as if the influence of thirteen centuries could be wiped out in a day.”

“It is Arabian influence that has spoilt Persia, her material greatness, her moral tone, is also a statement heard every day....Many Persians are sure that all their faults, especially their tendency to lie, and no Persian denies that, although their ingenious explanations almost make lying a virtue, are due to Islamic influence, for Islam allows, through prayers and pilgrimages wiping out of evil deeds, both for one's self and one's ancestors, which, some say, encourages anti-social and immoral behaviour. This attitude of ‘blaming it on’ Mahomet is accused of having a degenerating influence upon daily conduct. The Moslem heaven is to some, only a perfect brothel” P. 266.

“Educated people in Persia are at present very few,, and amongst those a tiny handful are enlightened, enthusiastic, capable of the sacrifice..... one of that handful said, ‘one per cent of us will save Persia. Perhaps Islam will go; it does not matter, but our ideals will spread.’ ” P. 269.

জনৈক ভারতীয় মুসলমান লেখক শ্রী মুহাম্মদ ইসহাক *The Twentieth Century* (June 1937) গ্রন্থে লিখেছেন।

“One of the great signs of this new life is the awakening of her (Iran's) interest in her ancient glory, in her ancient kings, in her ancient religion and her great prophet Zarathushtra.” P. 823.

“To throw off the yoke of Arabic influence in every sphere of national life is the keynote of the trend of modern Persian literature.” P. 824.

“The omission of religion in modern Persian literature is a very noticeable feature.” P. 824.

ইরানের রাজবংশ

১. ইরানী

	খৃঃ পূঃ		খৃঃ পূঃ
১। মদ্র (medes)		৩। অর্শক (৩) (অর্দবান)	২১৪-১৮১
২। দয়াইকু (দেবক)	৬৫৫	৪। ফ্রায়াত (Phraates I)	১৮১-৭০
৩। ফব্রিশ	৬৫৫	৫। মিথ্রাদাত (১)	১৭০-৩৮
৪। হুয়ছত্র	৫৮৫	৬। ফ্রায়াত (২) (ফরহাদ)	১৩৮-১২৪
৫। ইস্টবেগু	৫৮৫-৫০	৭। মিথ্রাদাত (২)	১২৪-৮৮

২. অখামেনশী

(Achaemenes)

১। কোরোশ (cyrus)	৫৫৯-২৯	১০। মিথ্রাদাত (৩)	৬০-৫৬
২। কস্বোজ	৫২৯-২১	১১। উরুদ (১)	৫৫-৩৭
গোমত	৫২১	১২। ফ্রায়াত (৪)	৩৭-৩৩
৩। দারয়োশ (১)	৫২১-৪৮৫	১৩। তীরদাদ	৩৩-৩০
৪। ক্ষয়ার্শ (১)	৪৮৬-৬৬	১৪। ফ্রায়াত (৫)	৩০-২ খৃঃ
৫। অর্তছত্র (১)	৪৬৬-২৫	১৫। উরুদ (২)	২-৬
৬। ক্ষয়ার্শ (২)	৪২৫	১৬। বানান্ (১)	৭-১৬
৭। দারয়োশ (২)	৪২৪-৪০৪	১৭। অর্দবান (১)	১৬-৪২
৮। অর্তছত্র (২)	৪০৪-৩৫৮	১৮। বারদান	৪২-৪৬
৯। অর্তছত্র (৩)	৩৫৮-৩৬	১৯। গোদর্জ	৪৬-৫১
১০। দারয়োশ (৩)	৩৩৬-৩০	২০। বানান্ (২)	৫১

৩. গ্রিক

১। আলেকজান্ডার (১)	৩৩০-২৩	২২। পাকুর	৭৭-১০৪
২। আলেকজান্ডার (২)	৩২৩-১২	২৩। অর্দবান (৪)	
৩। সেলুকাস	৩১২-২৮১	২৪। খুসরো	১০৫-৩৩
৪। অ্যান্টিয়োকস (১)	২৮১-৬২	২৫। বলগশ (২)	১৩৩-৯১
৫। অ্যান্টিয়োকস (২)	২৬২-৪৬	২৬। বলগশ (৩)	" "
		২৭। বলগশ (৪)	১৯১-২০৮
		২৮। বলগশ (৫)	২০৮-১৬
		২৯। অর্দবান (৫)	২১৬-২৬

৪. পার্থিয়

১। অর্শক (১)	২৪৯-৪৭
২। অর্শক (২) (তীরদাদ)	২৪৭-২৪

৫. সাসানী (ইরানী)

১। অদেশির (১)	২২৬-২৪০
২। শাপোর (১)	২৪০-২৭১
৩। হরমুজ (১)	২৭১-২৭২
৪। বহরাম (১)	২৭২-২৭৫
৫। বহরাম (২)	২৭৫-৮২
৬। বহরাম (৩)	২৮২
৭। নরসী	২৮২-৩০১
৮। হরমুজ (২)	৩০১-৩০৯
৯। শাপোর (২)	৩০৯-৭৯
১০। অদেশির (২)	৩৭৯-৮৩
১১। শাপোর (৩)	৩৮৩-৮৮
১২। বহরাম (৪)	৩৮৮-৯৯
১৩। যজ্ঞদগর্দ (১)	৩৯৯-৪২০
১৪। বহরামগোর	৪২০-৪০
১৫। যজ্ঞদগর্দ (২)	৪৪০-৫৭
১৬। হরমুজ (৩)	৪৫৭-৫৯
১৭। ফিরোজ (১)	৪৫৯-৮৩
১৮। বলগশ (বলশ)	৪৮৩-৮৭
১৯। কবদ (১)	৪৮৭-৯৮
২০। জামাম্প	৪৯৮-৫০১
কবদ (১)	৫০১-৩১
২১। খুসরো (অনোশিরবান)	৫৩১-৭৮
২২। হরমুজদ	৫৭৮-৯০
২৩। খুসরো (২) (পরভেজ)	৫৯০-৬২৮
২৪। কবদ (২)	৬২৮-২৯
অরাজকতা	৬২৯-৩৪
২৫। যজ্ঞদগর্দ (৩)	৬৩৪-৪২

আরব খলিফা

৬. হাশিমি

১। উমর	৬৪২-৪৪
২। ওসমান	৬৪৪-৫৬
৩। আলি	৬৫৬-৬১
৪। হাসান	৬৬১

৭. উমাইয়া

১। স্বাবিয়া	৬৬১-৮০
২। এজিদ (১)	৬৮০-১৩
৩। উমর (২)	৭১৩-২০
৪। ব্রজিদ (২)	৭২০-২৪
৫। হিশাম	৭২৪-৪৩
৬। বলিদ	৭৪৩
৭। এজিদ (৩)	৭৪৩-৪৪
৮। ইবন স্বাবিয়া	৭৪৪-৪৭

৮. আব্বাসী

১। আব্দুল আব্বাস	৭৪৯-৫৪
২। আবুজাফর মনসুর	৭৫৪-৭৫
৩। মেহদী	৭৭৫-৮৫
৪। হাদী	৭৮৫-৮৬
৫। হারুন রশীদ	৭৮৬-৮০৯
৬। আমিন	৮০৯-১১
৭। মামুন	৮১১-৩৩
৮। মুতাসিম	৮৩৩-৪২
৯। বাসিক	৮৪২-৪৭
১০। মুতওয়াকিল	৮৪৭-৬১
১১। মুস্তসির	৮৬১
অরাজকতা	৮৬১-৭০
১২। মোতমিদ	৮৭০-৯২
১৩। মোতজিদ	৮৯২

ইরানী

৯. সফ্ফারি

১। ইয়াকুব-বিন-লায়স	৮৭১-৭৮
২। আমরুল-লায়স	৮৭৮-৯০৩

১০. সামানি

১। ইসমাইল	৯০৩
২। অহমদ	-৯১৩
৩। নশ্র (১)	৯১৩-
৪। নশ্র (২)	
৫। নূহ (১)	

৬। আবদুল মালিক (১)		২। ঙগোতে	১২২৭-৪১
৭। মনসুর (১)		৩। কুয়ুক	- ১২৪৬
৮। নূহ (২)		৪। মঙ্গু	১২৫১ -
৯। মনসুর (২)		১৭. ইলখানি	
১০। আবদুল মালিক (২)	৯৯৯	১। হলাগু	১২৫১-৬৫
১১. জিয়ারি		২। অবজা	১২৬৫-৮১
১। কাবুস	৯৯৯-১০১২	৩। আহমদ (মুসলিম)	১২৮১-৮৪
১২. বুবায়হী		৪। অরগুন	১২৮৪-৯১
১। আলি-বিন-বুবায়হী	৯৩২	৫। গেরবাতু	১২৯১-৯৫
২। আহমদ মুইজুদ্দৌলা	৯৬৭	৬। বৈদু	- ১২৯৫
৩। আজাদুদ্দৌলা	৯৬৭	৭। গজন (মুসলিম)	১২৯৫-১৩০৪
৪। মজদুদ্দৌলা		৮। উলজাইত	১৩০৪-১৬
১৩. গজনবী		৯। আবু-সঈদ	১৩১৬-৩৪
১। মহমুদ	-১০১৩	১০। অর্পা	- ১৩৩৫
২। মসউদ	১০৩৩-	১১। মুসা	১৩৩৬
১৪. সেলজুকি		১২। মুহাম্মদ	১৩৩৬-৩৮
১। তোগ্রলবেগ	১০৬৭-৬২	১৩। তুগা-তেমুর	১৩৩৮
২। অল্প অর্সলন	১০৬২-৭২	১৪। জহান তেমুর	১৩৩৯-৪১
৩। মালিক শাহ (১)	১০৭২-৯২	১৫। সতী বাগ (রানী)	১৩৩৯
৪। মহমুদ (১)	১০৯২-	১৬। সুলেমান	১৩৩৯-৪৩
৫। বার্কিয়ারুক	১০৯৪-	১৭। নৌশোর বাঁ	১৩৪৪
৬। মালিক শাহ (২)	-১১০৪	১৮. ইলখানি	
৭। মুহাম্মদ (২)	১১০৪-১৮	১। শেখ হাসান বুজুর্গ	- ১৩৫৬
৮। সন্জার	১১১৮-৫৭	২। আবেস	১৩৫৬-৮২
৯। তুগ্রল	-১১৯৪	৩। সুলতান অহমদ	- ১৩৮২
১৫. খাজমী		১৯. তেমুরি	
১। ইল-অর্সলন	-১১৭৩	১। তেমুর	১৩৮০-১৪০৪
২। তেবিশ		২। খলিল সুলতান	১৪০৪-৯
৩। শাহ মহমুদ		৩। শাহরুখ	১৪০৯-৪৭
৪। আলাউদ্দীন মুহাম্মদ	১২০০-২০	৪। উলুগ বেগ	১৪৪৭-৪৯
৫। জালালুদ্দীন	১২২০-৩১	৫। আব্দুল লতিফ	১৪৪৯-৫২
মঙ্গোল		৬। আবু সঈদ	১৪৫২-৬৭
১৬. সম্রাট চেঙ্গিজ		৭। সুলতান আহমেদ	১৪৬৭
১। চেঙ্গিজ	১২২১-২৭		

৮। সুলতান হুসেন

২০. অককুমুনল

১। উজুন হাসান	-১৪৭৮
২। ইয়াকুব	
৩। অলমুত	১৪৯৯

ইরানী

২১. সফাবী

১। ইসমাইল (১)	১৪৯৯-১৫২৪
২। তহমাম্প	১৫২৪-৭৬
৩। ইসমাইল (২)	১৫৭৬
৪। মুহম্মদ খুদাবন্দা	১৫৭৮-৮৭
৫। আব্বাস (১) মহান	১৫৮৭-১৬২৯
৬। শফি	১৬২৯-৪২
৭। আব্বাস (২)	১৬৪২-৬৭
৮। সুলেমান	১৬৬৭-৯৪
৯। সুলতান হোসেন	১৬৯৪-১৭২২
১০। তহমাম্প	

আফগান

২২. গিলজয়ি

১। মহম্মদ	১৭২২-২৫
২। আশরাফ	১৭২৫-৩০
৩। তহমাম্প	-১৭৩২

ইরানী

২৩. অফশারী

১। নাদির শাহ	১৩৩৬-৪৭
২। আদিলশাহ	১৩৪৭-৪৮
৩। ইব্রাহিম	১৩৪৮
৪। শাহরুখ	

২৪. জঙ্গী

১। করিম খাঁ	১৭৫০-৭৯
২। জকি খাঁ	১৭৭৯
৩। আবু তালেহ	
৪। আলি মুরাদ	১৭৮২-
৫। জাফর	১৭৮৪-৮৯
৬। লুত্ফ আলি	১৭৯০-৯৪

২৫. কাজার

১। আগা মুহম্মদ	১৭৯৪-৯৭
২। ফতে আলি	১৭৯৭
৩। মুহম্মদ শাহ	১৮৪৮
৪। নাসিরুদ্দীন	১৮৪৮-৯৬
৫। মুজাফফরুদ্দীন	১৮৯৬-১৯০৬
৬। মুহম্মদ আলি	১৯০৬-৯
৭। আহমদ শাহ	১৯০৯-২৫

২৬. পহ্লাবী

১। রজা শাহ	১৯২৫-
------------	-------

নবীন ইরান

বাকু থেকে ফেরা

বাকুতে ইরানী কনসাল জেনারেলের কাছ থেকে ইরানে যাবার ভিসা অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলাম। ১২ সেপ্টেম্বর (১৯৩৪ খ্রিঃ) আমাদের জাহাজ ছাড়ার কথা ছিল। জিনিসপত্র নিয়ে বেলা আড়াইটার মধ্যে বন্দরে পৌঁছে গেলাম। বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়াতে সমস্ত কাজের উপযুক্ততা বিচার হয় যোগ্যতার নিরিখে। সেজন্য সমস্ত কাজই সকলের জন্য উন্মুক্ত। অনেক উচ্চপদেও দেখেছি স্ত্রী-পুরুষ কিংবা এশীয়, ইউরোপীয় ইত্যাদি বিচার করা হয় না। বন্দরের কস্টমস্ অফিসার ছিলেন জনৈক এশিয়ান এবং আমার সৌভাগ্যবশত তিনি কিছু ফারসিও জানতেন। অত্যন্ত শিষ্টতার সঙ্গে আমার মালপত্র দেখা হলো, সেই সঙ্গে আমার কাছে থাকা টাকা পয়সারও হিসাব নেওয়া হলো। খানিকপরেই নিয়মাবলীর বাধা পার হয়ে জাহাজে পৌঁছলাম।

এই প্রথম সোবিয়ট জাহাজ দেখার সৌভাগ্য হলো। জাহাজটি ছোট এবং তার নাম ফোমিন। জাহাজে আমি দ্বিতীয় শ্রেণির যাত্রী ছিলাম। বাকু থেকে পহ্লবী পর্যন্ত আমার ভাড়া লাগল উনিশ ডলার (প্রায় পঞ্চাশ টাকা)। এই ভাড়ার মধ্যে রাত্রি ও দুপুরের খাওয়ার খরচ ধরা ছিল। যদিও আমার কেবিনে তিনটে বার্থ ছিল কিন্তু যাত্রী ছিলাম আমি একা। বিকেল চারটের সময় জাহাজ ছাড়ল। ধীরে ধীরে জাহাজ তীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বেশ খানিকটা সমুদ্রে জাহাজ চলে যাবার পর অর্ধচন্দ্রাকৃতির বাকু শহরটিকে এবার সম্পূর্ণভাবে দেখা গেলো। শহরের পিছনে কিছু ন্যাড়া গাছপালাহীন পাহাড় আছে। একদিকে কয়েক হাজার তৈল কূপের চিমনির অরণ্য আর একদিকে তেল শোধনের কারখানা আর তাকে ঘিরে অজস্র টাঙ্কারের মেলা।

আমার সহযাত্রীদের মধ্যে দু-চারজন ছিল ইরানী বাকি সবাই সোবিয়ট নাগরিক। একজন বিষ্ফুর সোবিয়ট নাগরিকের সঙ্গে আলাপ হলো। ভদ্রলোক জাতিতে ইরানী। অনেক বছর ধরে আজারবাইজানে আছেন। বললেন — বারো বছর গন্জা এলাকায় বাস করছি, আমার স্ত্রী-পুত্র সকলেই এখনও ওখানেই আছে। এতদিন ধরে কাজ করছি তবুও এখন ছুটি চাইতে গেলে বলে তোমায় আর দরকার নেই, তুমি অন্যত্র যেতে পারো। ভদ্রলোকের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে যা বুঝলাম যে তিনি নিজেকে এখনও সোবিয়ট ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি। বিপ্লবের পর রাশিয়াতে যে ধরনের সমাজ ব্যবস্থা চালু হয়েছে তাতে ধর্মীয় গোঁড়ামি, শোষণ ইত্যাদির কোনো স্থান নেই, কিন্তু ভদ্রলোক কট্টর মৌলবাদী এবং নিজের পরিবারের সকলকেও সেই পথে চালাতে চান। বিপ্লবের এত বছর পরও তাঁকে বিন্দুমাত্র বদলানো যায়নি। এরকম অবস্থায় সোবিয়টের এমন কী দায় পড়েছে যে এমন একজন ঘাড় বাঁকা লোককে তাদের মধ্যে রেখে দেবে যে ভবিষ্যতে আরও বেশি গণ্ডগোল করতে পারে।

রাত্রিতে রেডিওয় আজারবাইজানি গান বাজছিল। সবটা না হলেও হিন্দুস্থানি গজল গানের সঙ্গে কোথায় যেন তার একটা মিল আছে। গানের ভাষা তুর্কি, তাই বোধগম্য হয়নি। সে রাত্রিতে বাতাসের বেগ একটু বেশি থাকায়, জাহাজ বেশ দোল খাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি আমার কেবিনে

গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বাকু থেকে জাহাজ মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশেও যাতায়াত করে। তবে ইরানের পহলবী বন্দরের সঙ্গে বাকুর যোগাযোগ প্রায় নিয়মিত।

সকাল আটটার সময় দূর থেকে আবছা কালো রঙের ইরানের তটভূমি দেখতে পেলাম। কিন্তু বন্দরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দশটা বেজে গেলো। বন্দরের একদিকে কাজিয়ানদের পুরানো এলাকা আর-এক দিকে পহলবীদের আমলে গড়ে ওঠা নতুন অঞ্চল। বন্দর নগরের পহলবী হয়েছে এখানকার বাদশাহ, শাহরজা পহলবীর নামে। বাকুর শুকনো বৃক্ষ মাটির দেশ দেখে ক্লান্ত চোখ দুটো এখানকার চারদিকের শ্যামল সবুজ শোভা দেখে তৃপ্তি পেল। ইরানের এই এলাকা এক সময় রাশিয়ার জারের অধীনে ছিল। শহরের পশ্চিম তখনই হয়েছিল। বুশ ধাঁচে তৈরি সে আমলের কিছু বাড়ি ঘর এখনও বর্তমান। শহরের পথঘাট বেশ চওড়া এবং অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শহরের জনসংখ্যা খুবই সামান্য, চোন্দো পনেরো হাজারের মতো। অনেক সোবিয়েট নাগরিকও এখানে বাস করে, এবং তাদের ছেলমেয়েদের জন্য আলাদা একটি রাশিয়ান স্কুলও আছে। জাহাজ থেকে নামা মাত্রই কাস্টমসের জালে আটকা পড়লাম। তাদের লোকজন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিনিসপত্র পরীক্ষা করল, পাসপোর্ট দেখল। তখনও পর্যন্ত পুরোপুরি কাস্টমসের আওতা থেকে বের হইনি, এর মধ্যেই মোটরওলারা এসে উৎপাত শুরু করল। জাপান ও রাশিয়া ঘুরে আসার ফলে দরদাম করার ব্যাপারটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। একজন লোক একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গাড়ি দেখিয়ে বলল — আসুন তেহরান পর্যন্ত ১৫ তুমান (১৫টাকা)। আমি বললাম যদি এর কমে না পাই তখন তোমার গাড়ি দেখব। দু-একজন লোক বলল, ওরা পাঁচ তুমান বেশি চাইছে। এরপর আর-একজন গাড়িওলা ১০ তুমান বলে আমার মালপত্র নিয়ে গাড়িতে রাখল, এবং আমাকে একটা হোটেল নিয়ে গেলো। সেখানে তার অফিস আছে। বাজারে গিয়ে দেখলাম সাদা মিষ্টি আঙুর একটাকা সের দরে বিক্রি হচ্ছে। আমি কিছু আঙুর কিনে জলপান সারলাম। ধীরে ধীরে এগারোটা বাজল, বারোটা বাজল, একটাও প্রায় বাজতে চলেছে কিন্তু আমাদের গাড়ি ছাড়ার কোনো নাম গন্ধ নেই। অন্যান্য ট্যাক্সি একের পর এক তেহরানের দিকে চলে যাচ্ছে। আমি কয়েকবার তাড়া দিতে লোকটি বলল — অপেক্ষা করুন অন্য গাড়ি যাবে। এক চেকোশ্লোভাক দম্পতির অবস্থাও আমারই মতো। পরে বুঝলাম চাপ দিয়ে ভাড়া বাড়াতে চাইছে। এরপর আমরা তিনজন পরামর্শ করে ১৩ তুমান পর্যন্ত দিতে রাজি হলাম। ড্রাইভারও রাহি হলো। ইরানে পা দেবার পর এটাই হলো প্রথম অভিজ্ঞতা।

রাশিয়ার মতো ইরানেও দূরত্বের হিসাব মাইলের পরিবর্তে কিলোমিটারে করা হয়। এক মাইল প্রায় দেড় কিলোমিটারের মতো। কাস্পিয়ান সাগরের তীরের এই জিলান প্রদেশ বেশ শ্যামল সবুজ ফসলে ভরা। এখানকার সবুজ অরণ্য, বড়ো বড়ো গাছ, ঢেউ তোলা ধান খেত দেখে মন খুসীতে ভরপুর হয়ে উঠল। ভাবলাম সমস্ত ইরান জুড়েই এই সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী দেখতে পাব। পরে বিস্তৃতভাবে ইরান ঘুরে দেখছি যে খুব অল্প জায়গাই এরকম সবুজ। অধিকাংশ ইরানী ভূভাগই বৃক্ষ, অসমান পাথুরে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দারিদ্র্যে ভুগছে। এ বিষয়ে তিব্বতের পরই ইরানের স্থান। পরে অবশ্য মনে পড়ল হাতিমতাই গল্পের মাজিন্দারাকে। সেখানে পরীদের বাসস্থান

ছিল এবং সেই জায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও সুন্দর বর্ণনা ছিল। গিলান অঞ্চল, যেখান দিয়ে আমরা এখন চলেছি, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে অনেকাংশে তার মিল খুঁজে পেয়ে এ জায়গার নাম দিয়েছে ‘হিন্দকোচক’ ছোট হিন্দুস্থান। উত্তর বিহারের মতো এখানকার গ্রামের বাড়িতে বেশিরভাগ জায়গায় খড়ের ছাউনি। গ্রামের লোকজনের মধ্যেও দেখলাম কোট প্যান্ট পরার রেওয়াজ বাড়ছে আর বাড়ছে টেবিল চেয়ারের ব্যবহার। পহ্লবীতে পা রাখার পর একবার দেশের কথা মনে পড়েছিল, কিন্তু অচিরেই তা ভুলে গেলাম। ২৬ মাইল চলার পর আমরা রেস্তু নামে একটা ছোট শহরে পৌঁছালাম, এটা ইরানের একটা পুরানো শহর। শাহ পহ্লবীর দশ বছরের শাসন কালে ইরানের প্রচুর উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে রাস্তাঘাট। রেস্তু শহরেও বেশ চওড়া ভালো রাস্তা পেলাম। রাস্তার মোড় বা চৌমাথাগুলো বেশ প্রসারিত। বাড়ির ছাদ এখানে খোলার তৈরি। সেগুলিকে দেখে মনে হলো যেন উত্তর ভারতের কোনো সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশের বাড়ি এখানে উঠে এসেছে। রাস্তার দুধারে, অনেক দোকান এবং সেগুলো সাজানোও হয়েছে সুন্দর। ইরানীদের মধ্যে গায়ের রং ফর্সা, চুলের রং কালো এবং চোখের রং নীল, এমন লোকের সংখ্যা অনেক। তার ওপরে শাহ পহ্লবী সকলকেই হ্যাট কোট পরার আদেশ দিয়েছেন। এজন্য অধিকাংশ ইরানীকে ইউরোপীয়দের থেকে আলাদা করা মুশকিল। দোকানের মধ্যে, সলমানি অর্থাৎ চুলকাটার সেলুনের সংখ্যাই বেশি দেখলাম। সেলুনের আধিক্যের কারণ শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও তাদের সাবেক লম্বাচুল বয়কট করে ছোট করে ‘বয়কাট’ চুল ছাঁটছে। আমাদের গাড়ি সামান্য কিছু সময়ের জন্যই থেমেছিল। তারপর আবার আমরা রওনা হলাম। এরপর বেশ খানিকটা রাস্তা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। ইরানের রাস্তাঘাট যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। প্রত্যেক জায়গাতেই পাকা রাস্তা এবং সেগুলোকে তৈরি করেই হাত ধুয়ে ফেলা হয়নি। নিয়মিত তার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা হয়। এখন প্রতিটি রাস্তার ওপর দিয়ে পাঁচটন ওজনের ছ-চাকার লরি দিনরাত স্বচ্ছন্দ গতিতে যাতায়াত করছে। একগো বাইশ কিলোমিটারের মাথায় মঞ্জিল গ্রাম পড়ল। সবুজের সীমানাও এখানেই শেষ হলো। এরপর আমাদের রাস্তা পাহাড়ের পথ ধরে শুল্ক, বুস্ক ইরানের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই পাহাড়ের জোতে সবসময় জোর হাওয়া বয়, পাশেই শ্বেতবুদ নদী। নদীর ওপরে একটা লোহার স্থায়ী সেতু আছে। যতই ওপরে উঠছি, ঠান্ডাও সেই অনুপাতে বাড়ছে। সন্দের দিকে পাহাড় আর পাহাড়ের পাথর দিয়ে তৈরি বাড়ি দেখতে দেখতে এগোলাম। বালুচিস্তান কিংবা লাদাখে এধরনের বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। রাত্রি নটার সময় ১৯৪ কিলোমিটার পথ পার হয়ে কুহীন পৌঁছালাম। এখানে কয়েকটি খাবারের ও ফলের দোকান আছে। আমরা তিনজন একটা খাবারের দোকানে মূর্গ মুসল্লম ও হাতির কানের আকারের বিশাল তন্দুরি বুটি দিয়ে নৈশভোজ সারলাম। কাম্পিয়ান থেকে তেহরান আসার পথে কুহীন সবচেয়ে উচ্চতম স্থান। শীতের দিনে এখানে গভীর তুষারপাত হয় এবং কখনও কখনও এমন অবস্থাও হয় যে বাধ্য হয়ে রাস্তা বন্ধ রাখতে হয়। খাওয়া শেষ করে আবার গিয়ে গাড়িতে বসলাম। একে রাত্রিকাল, তারপর মোটরও খোলা নয়, সেজন্য এখন আর বাইরের দৃশ্যাবলী দেখার সম্ভাবনা নেই। রাত্রি এগারোটায় কজবীন পৌঁছালাম, পহ্লবী থেকে এজায়গার দূরত্ব ২৩২ কিলোমিটার। এই জায়গা কোনো এক সময় কিছুদিনের জন্য ইরানের

রাজধানী হওয়ার গৌরব লাভ করেছিল। এখানকার রাস্তাঘাটও যথেষ্ট চওড়া এবং পরিচ্ছন্ন। শহরে বৈদ্যুতিক আলো আছে। এখানকার পুলিশ চৌকিতে আমাদের পাসপোর্ট দেখাতে হলো। সেখান থেকে গাড়ি ছেড়ে আরও দুঘণ্টা পর এল করাজ। জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রি ছিল। চারদিক জুড়ে যেন দুধের প্রবাহ বইছে মনে হলো। পথের ধারে কোথাও কোথাও ফলের বাগান। রাত্রি দুটোর সময় ২৫০ মাইল অর্থাৎ প্রায় ৩৭৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আমরা তেহরান পৌঁছলাম। গভীর রাত্রেও বিদ্যুতের আলোকে আলোকিত ঝলমলে শহর। তার প্রশস্ত সুন্দর রাস্তাঘাট, পথের দুধারে সুনির্মিত ইমারতগুলো তেহরানের সৌন্দর্যের পরিচয় বহন করছিল। আমার সঙ্গী চেকোশ্লোভাকিয়ানরা আগে থেকেই প্যালেস হোটেলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ইস্তাম্বুল রোডের ওপরে অবস্থিত হোটেল আমায় জায়গা জুটে গেলো।

তেহরান

১৩ সেপ্টেম্বর সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়ে হোটেলেরই প্রাতরাশ সারলাম। তারপর বের হলাম শহর দেখতে। প্রথমেই খোঁজ করলাম এমন একখানা গাইড বইয়ের যা থেকে ইরান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারব। খোঁজ খবর করে জানলাম যে ফিরদৌসি রোডের ওপরে বেগন-লিট কোম্পানির দোকান আছে, সেখানে আমি যেরকম বই চাইছি পেয়ে যেতেও পারি। জিঙ্কস করে করে গেলাম সেখানে। সেখানে ইংরেজি ভাষায় একখানা গাইড বই পেলাম যার মুদ্রণ সময় ১৯৩১ সাল। বেশ পুরানো। তবুও দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ওই বইয়েই অনেকটা কাজ হয়ে যাবে। ফিরদৌসি রোড এক বিশাল চওড়া রাজপথ। পথের দুপাশেই বড়ো বড়ো বাড়ি, বেশ কিছু বাড়ি এখনও তৈরি হচ্ছে। একটু এগোলেই ইরানের অনেক সরকারি অফিস এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের বিশাল বাড়ি। মিউনিসিপ্যালিটির অফিসের সামনে অনেক মোটর বাস দাঁড়ানো। বাসগুলির বডি ও রং দেখে মনে হলো যে ভারতবর্ষ থেকে এদেশে এই সব বিষয়ে অনেক বেশি মনযোগ দেয়া হয়। এখানেই এক আর্মেনিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। উনি একটা বাসের ড্রাইভার। তাঁর বাস ১৫ অথবা ১৬ নম্বর বে-তে (বাসের দাঁড়াবার সুনির্দিষ্ট গলিপথ) ছিল। আগেকার চোদ্দোটি বাস ছেড়ে গেলে পরে তাঁর পালা আসবে। সব বাসের সামনে গন্তব্যস্থল যেখানে লেখা থাকে সেখানে লেখা ছিল ‘শমিরান’। আজ শুব্বার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় সকলেই তেহরান থেকে ১০ মাইল দূরের শমিরানে বেড়াতে যাচ্ছে। ইসলামি দেশগুলিতে শুব্বার ছুটি দেওয়া হয় প্রধানত জুম্মার নামাজের জন্য, কিন্তু এখানে দেখলাম বগলে পানীয় বোতল, সঙ্গে গ্রামোফোন এবং বন্ধু বান্ধব (যার মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সামিল) নিয়ে যে পরিমাণ তেহরানবাসী শমিয়ান বেড়াতে যাচ্ছে তাতে বোঝাই যাচ্ছিল যে নতুন ইরানে ধর্মের স্থান কোন্ পর্যায়ে।

দুই রিয়াল (পাঁচ আনা) দিয়ে খাবার খেয়ে আমিও সেই আর্মেনিয়ান ভদ্রলোকের বাসে বসে শমিয়ান ঘুরে আসতে চললাম। শমিরান ইরানের এক হিমাচ্ছাদিত সুন্দর পর্বত অলবুর্জের সানুদেশে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৪০০০ ফুট হওয়ায় এখানকার আবহাওয়া শীতল। গ্রীষ্মের দিনে বাদশাহ বেশির ভাগ সময় এখানে থাকেন। তেহরান থেকে শমিরান যাবার পথে

৬৩টি গ্রাম পড়ে। পথের ধারে জায়গায় জায়গায় আপেল, আঙুর ও ডালিমের বাগান আছে। পথে আমরা পুরানো জেলখানা 'কিল্লানুমা', সৈনিক ছাউনি এবং বেতার সঞ্চালনের টাওয়ার দেখতে পেলাম। পুরুষদের সকলের পরনেই ইউরোপীয় পোশাক, মাথায় হ্যাট। কারও কারও মাথায় গোল ক্যাপ ধরনের টুপি যা কপালের দিকে রোদ আটকাবার জন্য খানিকটা বাড়ির কার্নিশের মতো বার করা, এই টুপিগুলোর নাম কুলাই পহ্লবী। মেয়েদেরও খোলা মুখ। পায়ে মোজা দেখে মনে হলো তারাও ইউরোপীয়ান পোশাকই পরে আছে। শরীরের ওপরে পাতলা কালো রঙের একটা চাদর জড়ানো যার একটা অংশ দিয়ে মাথার পিছনের দিক ঢাকা, কপালে একটা জালিদার ভেল। আমার বন্ধু বললেন — বেশিদিন লাগবে না, দেখবেন খুব শিগগিরই এই কালো পর্দা উঠে যাবে। ইরানে পর্দাপ্রথা তখন চিরকালের জন্য শেষ হবে। অর্জবুর্জের স্তূপাকৃতি হিমাচ্ছাদিত শিখর ইরানের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। এর সৌন্দর্য জাপানের ফুজিয়ামা থেকে কোনো অংশে কম নয়। যদি এই শৃঙ্গ জাপানে হতো তাহলে এর ছবিও ফুজিয়ামার মতো লোকের ঘরে ঘরে সাজানো থাকত।

১৪ সেপ্টেম্বর ঘুরে ঘুরে তেহরান শহরের মোটামুটি দর্শনীয় জিনিসগুলো দেখলাম। বাদশাহ পহ্লবীর প্রাসাদের সামনের দুটো বড়ো পিতলের নারী মূর্তি যাদের আবার পরীদের মতো ডানাও আছে। এই ঘটনাই প্রমাণ করছিল যে ইরানের বর্তমান শাসক প্রাচীন ইরানকে অর্থাৎ ইরানী ইরানকে কতখানি শ্রদ্ধা করেন।

হোটলে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে দৈনিক দশ-পনেরো আনা দিয়ে সস্তায় ভালো ঘর পাওয়া যেতে পারে। এখানে যে হোটলে আমি উঠেছি তার ঘরভাড়া দৈনিক চার টাকার বেশি, খাওয়া খরচ আলাদা। চিরাগ-এ-বর্ক রাস্তার ওপরে কিছু শিখ ও পাঞ্জাবিদের দোকান দেখতে পেলাম। সেখানেই সর্দার রণবীর সিংহের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলো। আমিও আমার জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর অতিথিশালায় উঠলাম।

ইরানে মাসখানেক থেকে ইম্পাহান, সিরাজ, মশহদ প্রভৃতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহরগুলোকে ভালো করে দেখে কাবুলের পথে দেশে ফেরবার পরিকল্পনা করেছিলাম। কাবুলের কনসালের কাছে ভিসার আবেদন নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, — হিরাত হয়ে কাবুলে যাবার রাস্তাটা ভালো নয়। আপনি মশহদ গিয়ে আফগান কনসালের কাছে এ বিষয়ে বিস্তৃত খোঁজ খবর নিন।

আমার কাছে আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর চেক ছিল। ব্যাঙ্ক মিল্লীতে (ইরানের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক) গিয়ে দশ ডলার ইরানি মুদ্রায় ভাঙিয়ে নিলাম। সর্দার রণবীর সিংহের ওখানে দুপুরের খাবারের নিমন্ত্রণ ছিল। খাওয়া দাওয়া পাঞ্জাবি ইরানের ছিল এবং তার সঙ্গে সেখানকার অকৃত্রিম অতিথি পরায়ণতার মনোভাবও মিশ্রিত ছিল। সেখানেই জানলাম যে ইরানের এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে হলে জাবাজ লাগে। পুলিশের দফতরে ওই জাবাজ (সরকারি অনুমতি পত্র) পাওয়া যায়। জাবাজ দেশি বিদেশি সকলকেই নিতে হয়। দফতরে গিয়ে আরেকটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো যে এখানকার পথ ঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হলেও সরকারি দফতরের তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। বিনা কারণে এখানে ভ্রমণার্থীদের অপেক্ষা করিয়ে হয়রান করা হয়। তবে শুনছিলাম যে সরকার এই আমলাশাহীর দীর্ঘসূত্রতার দিকেও নাকি নজর দিচ্ছে, তবে জনসাধারণের নিত্যদিনের

পোশাকে যত সহজে পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে এই কাজটা তত সহজে করা যাচ্ছে না। পথে ঘাটে খুনখারাপি, লুটপাট ইত্যাদি পহলবী শাসনের আগে এদেশে লেগেই থাকত সেই অবস্থা দূর করার জন্য সরকার মনে করে দূরের যাত্রীদের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। সেজন্যই নাকি জাবাজ দেবার আগে অত বাছবিচার করা হয়। হতে পারে, তবে বিদেশি যাত্রীদের যাতে খামোখা হয়রান হতে না হয়, প্রশাসনের সেটা দেখাও কর্তব্য। জাপানে টোকা এবং বের হবার সময় পাসপোর্ট খুঁটিয়ে দেখা হয়। কিন্তু এখানে তো একটা শহর থেকে আর-একটা শহরে যেতে গেলেই ঘণ্টা খানেক আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চলে। বাদশাহের অনেক ধর্মিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্য এক ধরনের কটরপন্থীরা খুবই ক্ষুব্ধ। তাদের সম্ভ্রাসবাদী হামলা থেকে সরকারি কর্মচারী এবং বাদশাহকে রক্ষা করার জন্য পথে ঘাটে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়, সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। হয়তো সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনেই এরকম করতে হচ্ছে, কিন্তু একজন একা বিদেশি যাত্রী রাষ্ট্রের কী এমন ক্ষতি করতে পারে? যখন প্রচুর লোক জাবাজ নেবার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল, তখন ওখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সাহেব রেজিস্টার মেলাচ্ছিলেন।

ইস্পাহানে

২৬ রিয়াল (চারটাকা) দিয়ে ইস্পাহানের গাড়ির টিকিট কাটলাম। সর্বত্রই হোটেল চাদর বিছানা পাওয়া যায় এজন্য জিনিসপত্র তেহরানে রেখে একটা হাত ব্যাগ আর পরনের জামা কাপড় নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। বিকেল চারটে থেকে ছাড়ছি ছাড়ছি করতে করতে রাত্রি আটটায় গাড়ি ছাড়ল। গাড়িতে ডজন দুয়েকের বেশি লোক ঠেসেঠুসে ঢোকানো হয়েছিল। এরকমভাবে গাড়িতে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করার বিরুদ্ধে পুলিশের স্পষ্ট নির্দেশ আছে। কিন্তু কে তা শোনে। বাস মালিকেরা পুলিশের হাতে কিছু গুঁজে দিয়ে ওই নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। শহরের গেটে পুলিশ যাত্রীসংখ্যা গুল। তাদের জাবাজ দেখল তারপর গাড়ি ছাড়ার অনুমতি দিলো। কিছুদূর যাবার পর আবার একটা জায়গাতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে জাবাজ পরীক্ষা করা হলো। তিনজন ইরানি যাত্রী যারা জাবাজ ছাড়াই ভ্রমণ করেছে, টোকির খানিক আগে বাসের গতি শ্লথ করে তাদের নামিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু তারা অন্য রাস্তা ঘুরে টোকি এড়িয়ে খানিক দূরে আবার গাড়িতে চড়ল। রাশিয়ার মতো ইরানেও সমস্ত নাগরিকদের ফোটো সহ পরিচয়পত্র রাখাটা বাধ্যতামূলক।

কুম — রাত্রি দুটোর সময় আমরা কুম পৌঁছালাম। পাঁচ আনা দিয়ে বিছানা সহ একটা চারপাই পাওয়া গেলো। কুম তেহরান থেকে ১৪৯ কিলোমিটার দূরে এবং সমুদ্রতট থেকে এর উচ্চতা ৩২০০ ফুট, লোক সংখ্যা ৩০ হাজার। বিবি ফাতিমার (মশহদের ইমাম রাজার [৭৭০-৮১৮খ্রিঃ] ভগ্নী) সমাধি এখানে থাকার জন্য এই জায়গা ইরানের অন্যতম এক তীর্থ ক্ষেত্র। সমাধিস্থলের সোনালি বর্ণের গম্বুজটিকে বহুদূর থেকে দেখা যায়। বহু শতাব্দী ধরে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তাদের মৃত্যুর পর বিবি ফাতিমার দরগার ছায়ায় যেন তাদের কবরস্থ করা হয়। তার ফলে দরগার চারদিকে অসংখ্য কবর স্থাপিত হয়ে যায়। কয়েক বছর আগে যদি এখানে আসতাম তাহলে সেই যত্র তত্র কবরের রাশিকে স্বচক্ষে দেখতে পেতাম। কিন্তু এখন শাহ পহলবী ও সমস্ত কবর ভেঙে তার হাড় গোড় তুলে অন্য জায়গায় সমাহিত করে এখানে এক বিশাল জাতীয় উদ্যান (বাগ-এ-মিল্লী) গড়ে তুলেছেন। বাগানের গাছপালা এখনও তেমন বড়ো হয়নি, তার শীতল ছায়া

এখনও পথচারীকে তৃপ্ত করতে পারছে না, তবে আগামী প্রজন্ম এই বাগান থেকে আনন্দ নেবে এবং তাদের বাদশাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। এরকম একটি অপূর্ব সৃষ্টির জন্য ও তাঁর নানাবিধ সংস্কার কাজের জন্য, আজ ইরান বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

ইরানের এই পার্বত্যঞ্চল তিব্বতের মতোই সবুজের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। তবে দুদেশের মধ্যে তফাত এই যে এখানে পরিশ্রম করলে কিছু মেওয়া কিংবা অন্য ফলের বাগান করা যায় যা তিব্বতে সম্ভব নয়। ইরানে যথেষ্ট কাঠ পাওয়া যায় না। গ্রামাঞ্চলে বাড়ি ঘরে কাঠের ব্যবহার খুবই সীমিত। গ্রামে বাড়ির দেয়াল মাটির, ছাদ পাতলা কাঁচা ইটের। গ্রামের গোল গোল ছাদের বাড়ি দেখে মনে হয়, পরবর্তী কালে মসজিদের ছাদ এরকম গোল ধাঁচে বানানোর ধারণা ওখান থেকেই এসেছে। ইরানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব সামান্য। তবে বৃষ্টির জলের সামান্য অংশও যাতে অযথা নষ্ট না হয় তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়। এখানে নদীর জলকে খালের মাধ্যমে দূর দূরান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু খালগুলো অন্তঃসলিলা, মাটির নীচ দিয়ে প্রবাহিত। অল্প অল্প দূরে কাঁচা কুয়া খুঁড়ে খুঁড়ে তার মধ্যে সুরঙ্গ কেটে একটির সঙ্গে আর একটিকে যুক্ত করে দেওয়া হয়, আর এভাবেই জলের প্রবাহ চলতে থাকে। এটাই হলো ইরানি খালের বৈশিষ্ট্য। বর্ষার জল ধরে রাখার জন্য প্রতিটি বাড়িতে পাকা গাঁথুনির বড়ো বড়ো চৌবাচ্চা থাকে। স্নান, ধোয়াধুয়ি সব সেই জলে হয়।

কুম-এর পুরানো বাজারটিকে দেখতে গেলাম। সমস্ত বাজারটি একটা বিশাল গোল ছাদের নীচে অবস্থিত। ডাকঘরে সশস্ত্র পাহারা দেখে মনে হলো ওই অঞ্চলে এখনও হয়তো চোর ডাকাতের উপদ্রব কিছু পরিমাণে আছে। কুম শহরের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে গেছে। নদীর দুপার বেশ চওড়া কিন্তু জল কিনারা থেকে অনেক দূরে এবং ধারাও খুবই ক্ষীণ। শহরে ঘুরতে ঘুরতে কয়েকটা হোটেলের সাইনবোর্ডের দিকে দৃষ্টি গেলো। একটা সাইনবোর্ডে লেখা—‘মুশফির খানা নজাফত, অজ্ আকায়ান্ মুসাফিরীন বাকমাল - এহেতরাম্ পজীরায়ী মীশবদ’। যে হোটеле আমি ছিলাম তার বোর্ডে লেখা ছিল — ‘মুসাফির খানা ইকতিসার, বাকমাল ওহেতরাম্ - অজ্ আকায়ান্ মুসাফিরীন পজীরায়ী মীশবদ’.

একটা হামামের (স্নানাগার) গায়ে লেখা ছিল — ‘হম্মাম নুমরা উমকে-জদীদ অজ্ আকায়ান্ বারেদীন ওহেতরানম ব নজাফত পজীরায়ী মীশবদ’।

একটা মোটর বাসে লেখা ছিল — ‘মুবসসা হমল্ ব নকল্ জনুব তেহরান’।

খোলা বাজারে প্রচুর মিষ্টি খরমুজ অত্যন্ত সস্তায় বিক্রি হচ্ছিল। যদিও এখন আঙুরের সময় নয় তবুও বাজারে একটাকা সের দরে অত্যন্ত মিষ্টি, বড়ো, সাদা রঙের আঙুর বিক্রি হচ্ছিল। বিকেল তিনটে পর্যন্ত আমরা কুমে রইলাম। এখান থেকে ইস্পাহানের জন্য নতুন বাসে চড়তে হলো। শহর থেকে বের হবার মুখে এক জায়গায় পাসপোর্ট ও জাবাজ দেখা হলো। নদী পার হয়ে আমরা একটা খালের ধার বরাবর যাচ্ছিলাম, ভাবছিলাম যে এই অন্তঃসলিলা খালগুলোর ওপরে যদি প্রচুর গাছ লাগানো যায়, তাহলে এ অঞ্চলে যেরকম কাঠের অভাব রয়েছে তার খানিকটা সুরাহা হতে পারে। এর পরের রাস্তা এক নির্জন গাছপালা শূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। দশ-পনেরো মাইল দূরে দূরে কয়েকটা ধূসর বর্ণের মাটির ছাদ দেওয়া বাড়ি ছাড়া এই প্রান্তরে আর কিছুই নেই।

রাস্তার ধারে কোথাও কোনো লোক একটা দোকান করেছে বাস যাত্রীদের আশায়। সেরকম একটা দোকানের সামনে বাস থামিয়ে অনেকে চা খেল, সিগারেট কিনল।

দিনের বেলাতে তেমন কিছু বুঝতে পারিনি কিছু সন্ধ্যা বেলা গাড়ি চলতেই হাড়ে হাড়ে টের পেলাম যে গায়ে চাপা দেবার কিছু সন্ধ্যা না এনে কী ভুলই না করেছে। জিনিসপত্র সবই এই ভেবে তেহরানে রেখে এসেছি যে হাঙ্গা হয়ে চলব। অন্ততপক্ষে ওভারকোটটা সন্ধ্যা রাখা অভ্যস্ত দরকার ছিল। ওই ঠান্ডার মধ্যে মধ্যরাত পর্যন্ত গাড়ি চলল। পরে একটা মুসাফির খানার সামনে গাড়ি থামল। ইরানে গায়ে দেবার কম্বল বা লেপসহ বিছানার ব্যবস্থা থাকে এমন জায়গাকে বলে মেহমানখানা বা অতিথিশালা আর পুরানো ধাঁচের সরাইখানার নামে মুসাফিরখানা। যদিও সরকারের কড়া নিষেধ আছে তবুও তাকে বড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রত্যেক মুসাফির খানাতেই চন্দু টানার ব্যবস্থা আছে। এখানকার সব ড্রাইভারই আফিং-এর দম টেনে গাড়ি চালায়। ভালোমতো চন্দুতে দম দিয়ে আমাদের ড্রাইভার ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে পাহাড়ি রাস্তায় যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছিল দেখে তো আমার গায়ের লোম খাড়া ওয়ে ওঠার অবস্থা।

ইস্পাহান — ইস্পাহানের কাছাকাছি আসতেই আমরা কয়েকটা ঘন বসতির গ্রাম পেলাম। এখানকার ফসলের খেত বেশ সবুজ শ্যামল। খরমুজের বোঝা পিঠে নিয়ে গাধার পাল শহরের দিকে চলেছে। পথে একটা সরাইখানা পড়ল যার ভিত পাথরের। সঙ্গীরা গর্বের সঙ্গে বলল — এই সরাইখানা অনাবশিবাণ তৈরি করিয়েছিলেন। সকাল নটার সময় আমরা ইস্পাহানে পৌঁছলাম। তেহরানের মতোই এখানকার রাস্তা ঘাট খুব চওড়া এবং সোজা। রাস্তার ধারে বেশ কয়েকটি চিনারের গাছ দেখলাম। রাস্তা সোজা ও চওড়া করার জন্য অনেক মসজিদ ভাঙতে হয়েছে, প্রচুর কবর উৎখাত করতে হয়েছে। ইরানের শহরগুলোতে মোটর ট্যাক্সি ছাড়াও বেড়াবার জন্য ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায়। ঘোড়ার গাড়িকে এখানে রাশিয়ান ভাষার নাম দুৰুষকি বলা হয়। মাধুরিয়াতেও দেখেছি ঘোড়ার গাড়ির নাম দুৰুষকি। গাড়ি ভাড়া খুবই কম, তবে দরদাম করার ব্যাপারে বিদেশিদের একটু বেশি দণ্ড দিতে হয়। আমি তিন তুমানের বদলে পাঁচ ঘণ্টার জন্য একটা দুৰুষকি ভাড়া করলাম। দুৰুষকির গাড়োয়ানের বিশাল চেহারা, ছ-ফিটের ওপরে লম্বা। চব্বিশ বছরের এই ধূসর কেশ, নীল চোখ আর গোলাপি আভার ফর্সা রঙের এই তরুণকে দেখলে স্বয়ং হিটলারও তাকে আর্থ বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করবে না বরং জার্মানিতে আসার আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

প্রথমে গেলাম চেহেলসেতুন দেখতে। চেহেলসেতুন কথাটার অর্থ চল্লিশটি স্তম্ভ বিশিষ্ট। এখানে কিছু কুড়িটি স্তম্ভ। সামনে জলভর্তি একটা বড়ো হৌজ (বড়ো চৌবাচ্চা) রয়েছে যার মধ্যে কুড়িটি স্তম্ভ প্রতিফলিত হয়ে চল্লিশটিতে পরিণত হয় এবং সেজন্যই এই ইমারতের নাম চেহেলসেতুন। স্তম্ভগুলো কাঠের তৈরি। ছাদে অনেক রকমের সুন্দর চিত্রকারিতা রয়েছে। চেহেলসেতুনকে ঘিরে একটি সুন্দর বাগান রয়েছে। বাগানের মধ্যে কিছু মার্বেল মূর্তি আছে।

ইস্পাহান অনেক কাল ইরানের রাজধানী ছিল এবং সেই আমলের কিছু প্রাসাদ, বাড়ি, ঘর এখনও আছে। রাজধানী হবার সৌভাগ্য তেহরানের হয়ে যাওয়ার পর থেকে এখানে আর আগের সেই শ্রী নেই। তবে এখন এখানে একটি কাপড়ের মিল তৈরি হয়েছে এবং আরও কয়েকটি কলকারখানা তৈরি হতে চলেছে। এর ফলে মনে হয় রাজধানী না হলেও পুরানো এবং বড়ো শহর

হিসেবে ইস্পাহানের গুরুত্ব খুব একটা কমবে না। চেহেলসেতুন থেকে বের হয়ে গেলাম ময়দানশাহতে। এটা একটা খুব লম্বা অথচ সেই অনুপাতে খুবই কম চওড়া একটা ময়দান। ময়দানের চারদিক ঘিরে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি। শাহ পছন্দী এই জায়গাটিকে সুন্দর করে সাজাতে চান। সেজন্য সমস্ত পুরানো ইমারতেরই মেরামতির কাজ চলছে। দক্ষিণ দিকে মসজিদ শাহর সুন্দর ইমারতটিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। ময়দানের পূর্বদিকে মসজিদ-এ-শাহ লুৎফুল্লা এবং উত্তরে সরয়া। আমরা যখন ময়দানে ঘুরছি তখন একদল স্কুলের ছাত্র সেখানে বেড়াতে এল। সকলেরই পরনে এক ধরনের পোশাক। স্কুলের ছাত্রদের এক ধরনের পোশাকের রেওয়াজ জাপানে দেখেছি, ইদানীং অনেক ইউরোপীয় দেশেও চালু হয়েছে বলে শুনেছি। আমাদের দেশেও এরকম করা যেতে পারে। একরকম পোশাকের অর্থ এই নয় যে তাকে অনেক দামী কাপড়ে তৈরি করতে হতে হবে। ভারতবর্ষে এরকম পোশাকের জন্য বছরে দশ-পনেরো টাকা খরচ পড়তে পারে। একজন ইরানীকে দেখলাম, যার মাথায় হ্যাট কিন্তু দাড়িতে মেহেদি লাগানো। তবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। শাহী ফরমান অনুযায়ী সকলকে হ্যাট পরতেই হবে নচেৎ জেলের ঘানি টানতে হবে, এরকম অবস্থায় শৌখিন লোকেরা কী করবে। একমাত্র স্বীকৃত মৌলবিদেরই পাগড়ি ও চোগা পরার অধিকার রয়েছে। তবে সরকারের কাছ থেকে সেই অধিকার আদায় করা আর ভারতবর্ষে বন্দুকের লাইসেন্স বার করা সমান কঠিন কাজ। অতএব হ্যাট কোট পরা অবস্থাতেই দাড়িতে মেহেদি লাগিয়ে সখ মেটাতে হয়। ইরানে চোগা পরার একটা বিশেষ অসুবিধাও আছে। নবীন ইরান আরবদের তার স্বাধীনতা ও সভ্যতার সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে। মোল্লাদের চোগা ও পাগড়ি থেকে তারা আরবিয়ানার গন্ধ পায়, এবং বর্তমান প্রজন্ম তাদের অতান্ত সন্দেহের চোখে দেখে। তেহরানের তিনলক্ষ জনতার মধ্যে শ'দুয়েক পাগড়ি চোগা পরিহিতদের দেখে চিড়িয়াখানার জীব বলে মনে হয়।

হাবুণ-বলায়ত জায়গাটা দেখতে গেলাম। সেটার অবস্থান শহর থেকে একটু দূরে। আঙিনায় হজরত হাবুনের (জাফর-এর পৌত্র, মুসার পুত্র) মাজার রয়েছে। অনেক গলিপথ ঘুরে আমরা মসজিদ-আলিতে পৌঁছালাম। মসজিদটির অবস্থা দেখলাম খুব ভালো নয়। সংস্কারেরও কোনো ব্যবস্থা চোখে পড়েনি। ইস্পাহানের মসজিদ-এ-জামা একটা বিশাল জায়গা নিয়ে অবস্থিত। মাঝখানে একটা জল-ভরা হৌজ। এই ইমারতটির সংস্কারের কাজ চলছে। সর আগা অখুনের মকবরায় লোকের ভীড় লেগেই থাকে। জায়গাটা ছোট হলেও প্রচার আছে যে এখানে মানত করলে নিঃসন্তানের পুত্র জন্মায়, নিঃসম্বল ধনসম্পদ লাভ করে ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব একটু বয়স্ক লোকের ভীড় এখানে বেশি হবে তাতে আর আশ্চর্যের কী? মকবরা-ইমানজাদা ইসমাইলের দেয়ালগুলো দেখলাম নানা চিত্রকারিতায় ভরা। তবে এ জায়গার অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়। আমি যখন ওখানে ছিলাম তখন একটি নব্য যুবককে সেখানে আসতে দেখলাম। সে মাথার হ্যাট খুলে ঝুঁকে বিড়বিড় করে কোনো কিছু বলছিল। দেখে বুঝলাম সমস্ত হ্যাট কোট ধারীরাই ইসলামকে অবজ্ঞা করে না। গলির মধ্যে দেখলাম কিছু দেহাতী মেয়ে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব করছে। তাদের শরীরের গঠন এবং পোশাক দেখে পাঞ্জাবি মেয়ে বলে ভুল হতে পারে। ইস্পাহান থেকে আজ সন্ধ্যাবেলাতেই সিরাজ চলে যাবার কথা। দুরূষকির গাড়োয়ান বলেছিল গাড়ি সন্দের আগে

ছাড়বে না। অতএব নিশ্চিত ছিলাম। আমি কিছু ফোটো নেবার জন্য এক ফোটোগ্রাফারের দোকানে গেলাম। দোকানদার ভদ্রলোক জাতিতে আর্মেনিয়ান। অনেকদিন কলকাতায় ছিলেন এবং সেজন্য অল্প স্বল্প ইংরেজি ও হিন্দি বলতে পারেন। তাঁর কাছেই জানলাম যে ভারতে বসবাসকারী আর্মেনিয়ানদের অধিকাংশই ইরানী। তাঁর দোকান থেকে পর্সোপোলিশ (তখত - এ - জমশেদ) এবং আরও কয়েকটি ইরানের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত ছবি কিনলাম। আর্মেনিয়ান মেয়েরা ইরানে কোনোদিনই পর্দা প্রথা মানত না। তাদের ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, পরনে ইওরোপীয় পোশাক। অনেক ইওরোপীয়ানরাই তাদের ইওরোপীয় বলে ভুল করে অবশ্য যদি গায়ের রং ফর্সা হয়। আর্মেনিয়ান ভদ্রলোক বলছিলেন যে ইরানী মেয়েরা যৌনজীবনে অনেক স্বাধীন এবং শহরের আধুনিক মহিলাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে বারবনিতাদের জীবনযাত্রার খুব একটা তফাত নেই। অনেক ভারতীয়দেরও দেখেছি ইরানী মেয়েদের সম্বন্ধে এরকম ধারণা পোষণ করতে। আমার এক শিয়াভাই যিনি আম্বালা থেকে এখানে তীর্থ করতে এসেছেন তিনি বললেন, এখানকার মেয়েরা ব্যাভিচারকে পাপ মনে করে না। আমার তো মনে হয় জীবনের বহু ক্ষেত্রে ইরানী মেয়েরা প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা সব সময় সভ্য সমাজের স্বাভাবিক নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করে স্বাধীনতার অপব্যবহার করে।

খাবার জন্য কিছু আঙুর ও খরমুজ কিনলাম। দুবুর্ষকি চালক পরামর্শ দিলো যে— চলুন কোনো নদীর ধারে বাগানে বসে খাবেন। মিনার জুম্মা শহরের বাইরে অবস্থিত। ওখানকার রাস্তা কাঁচা এবং খুবই খারাপ। আমাদের দুবুর্ষকি অনেক কষ্টে সেখানে যেতে পারল। অনেক জায়গাতে রাস্তা গাছের সারির মধ্য দিয়ে কিংবা খালের নীল জলধারার পাশ ঘেঁষে চলে গিয়েছে। মাটির দেওয়াল আর মাটির ছাদ দেওয়া বাড়ি দেখে পাঞ্জাবের কথা মনে হচ্ছিল। এখানে খালের ধার বরাবর ফলের গাছ লাগানো আছে যা দেখতে বেশ ভালো লাগে। ইস্পাহান সমুদ্রতট থেকে চার হাজার ফুট উঁচু এবং অক্ষাংশ বেশি হওয়ার জন্য আবহাওয়া আমাদের দেশের সিমলার মতো। তবে দিনের বেলা রোদের যথেষ্ট তেজ থাকে। সেজন্য খালের কিনারায় সবুজ ঘাসের গালিচায় বসে, ফলের গাছের ছায়ার সঙ্গে মৃদুন্দ বাতাসের আনন্দ উপভোগ করতে খুবই ভালো লাগছিল। দুপুরের খাওয়ার জন্য আমরা ওরকমই একটা জায়গার সন্ধানে ছিলাম। কাছেই একটা বাড়ি। দুবুর্ষকি চালক আসগর সে বাড়ি থেকে এক কুঁজো জল ও কাঁচের গেলাস চেয়ে আনল। অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো এখানে অন্য জাতির উচ্ছিষ্ট কিংবা ছোঁয়া, এরকম বাছবিচার তেমনভাবে কেউ করে না। মোটরবাস যেখানে দাঁড়ায় সেখানে একজন সবাইকে জল খাওয়ায়। সে অধিকাংশ সময় একটা কাঁচের গেলাসে জল ভরে তার মধ্যে এক টুকরো বরফ ফেলে দেয়। এক জনের জল পান করা হয়ে গেলে এবং বরফের টুকরোটা যদি তখনও না গলে গিয়ে থাকে তাহলে তার মধ্যেই জল ঢেলে আর একজনকে দেওয়া হয়। অন্যজন কোনো দ্বিধা না করেই সেই গেলাসের জল খায়। আমার আজন্মের কু অথবা সু যে সংস্কারই হোক না কেন, তার জন্য বহুবার আমাকে জল থাকা সত্ত্বেও পিপাসার্ত থাকতে হয়েছে। চোখের আড়ালে, শ'খানেক লোকের মুখ লাগানো গেলাসে জল এনে দিলে সেটা পান করতে অস্বস্তি হয় না, কিন্তু চোখের সমানে ওরকম দেখে সেই জল গলা দিয়ে নামানো অন্তত আমার পক্ষে খুবই মুশকিল। তিব্বতে থাকার সময় 'যসমিন দেশে

যদাচার' বলে মনকে প্রবোধ দিয়ে অনেক বাছবিচার ত্যাগ করেছিলাম। হয়তো এদেশে অনেকদিন থাকতে হলে সেরকম একটা কিছু করতে বাধ্য হতাম। তবে খরমুজ আমার পিপাসা নিবারণের কাজটা ভালো মতোই করত। খরমুজের মধ্যের অংশটাই বেশি মিষ্টি। সেজন্য অনেক পুর করে খোসা কেটে ফেলে দিতে হয়। যাই হোক, সেদিন দুপুরে গাছের শীতল ছায়ায় বসে মিছরির মতো মিষ্টি খরমুজ খেতে খেতে পরীদের কথা মনে হলো। বস্তুত সেই সবুজ বাগান, ধীরে প্রবাহিত জলধারা, গাছের মনোরম শীতল ছায়া আর সুস্বাদু ফলের আশ্বাদ, আমার মনকে কোরানে বর্ণিত বেহেষ্টের (স্বর্গ) দিকে নিয়ে গেলো। আর বেহেষ্টে এবং হুরীদের (পরী) মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সেজন্য ইরান সম্বন্ধীয় ভাবনা চিন্তা অন্য খাতে প্রবাহিত হয়ে পরীস্তানের দিকে চলে গেলো। আমি আসগরকে বললাম — আগা আসগর, আমি, ছেলেবেলায় অনেক ইরানী উপকথা পড়েছি এবং শুনেছি। হাতিমতাই-এর গল্পে মাজিন্দরান, তার ঘন অরণ্য আর সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি পরীদের সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা আছে। কোহকাফকেতো (ককেশাস) বিশেষভাবে পরীদের দেশ বলা হয়। এখনও নিশ্চয়ই চেষ্টা করলে পরীদের দেখা মিলতে পারে? আসগর এবং যার বাড়ি থেকে কুঁজো ও গেলাস এসেছিল, দুজনে মিলে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে আমাকে বোঝাতে লাগলেন যে — ওগুলো নেহাতই গল্প কথা? পরীরা অতীতেও কোনোদিন ছিল না, বর্তমানেও নেই। আমি বললাম — আগে ছিল না, এমন কথা আপনারা জোর দিয়ে কী করে বলেন? আমার তো মনে হয় এখনও যদি মাজিন্দরান অঞ্চলে ভালো করে খোঁজ খবর করা যায় তাহলে তাদের দেখা পাওয়া যেতেও পারে। তবে লোকালয় বেড়ে যাবার ফলে তারা হয়তো আরও গভীর অরণ্যে চলে গেছে, নাহলে কোহকাফের দিকে সরে গেছে। তবে কোহকাফ অঞ্চলে তো আজকাল সাম্যবাদীদের রাজত্ব, কিন্তু তাদের পক্ষেও বারোমাস ওই বরফ ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পরীদের তত্ত্বতলাস করা সম্ভব নয়, তাই ওখানেই নিশ্চিন্তে আছে। ওখান থেকে কেউ তাদের তাড়াতে পারবে না। কে জানে আজও হয়তো সন্ধে হলে এক ভিঙিঙলা এসে জল ছিটিয়ে যায়। ফরশিরা ফরাস বিছোয়, তারপর রাজা ইস্র ও অন্যান্য দরবারিদের আসন পাতা হয়। হলুদ, নীল, সবুজ বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে ত্রিভুবন সুন্দরী পরীর দল সারারাত ধরে নাচ গান করে দেবরাজকে সন্তুষ্ট করে। আমার বন্ধুরা বলল — এরকম জলসার জন্য কোহকাফ যাবার কী দরকার? ইরানের বাদশাহী আমল থেকে হাল আমলে শাহ পহ্লবীর শাসন কালের আগে পর্যন্ত, শাহী মহলেই অমন অনেক জলসার আসর বসত। তখন বিষয়টা সহজ করার জন্য আমি বললাম — এই যে চারপাশে গোলাপি মুখের সুন্দরীদের ঘুরে বেড়াতে দেখছি, এরাই সেই পরী। খাওয়া দাওয়া সেরে মিনার ভূম্মা দেখতে গেলাম। এটি ছোট একটি মসজিদ, এর নীচে অখু আবদুল্লার (মাহমুদের পুত্র) সমাধি আছে। মসজিদে দুটি মিনার আছে। ছাদে গিয়ে একজন মিনারটাকে দোলাতে লাগল। ইটের তৈরি মিনার কিভাবে নড়ে এবং নড়লেও কয়েক শতাব্দী ধরে কী করে টিকে আছে এ নিয়ে গবেষণা হতে পারে। পশ্চিমীরা এই মিনারের রহস্য নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে কিন্তু কারণ বের করতে পারেনি। কে জানে এখানকার মোল্লার কথাই হয়তো ঠিক। সে বলে, এসবই অখু আবদুল্লার তপস্যার ফল। এখান থেকে কিছু দূরে কুহ - আতিশগাহ। একটি ছোট টিলাক্ষে ওই নাম দেওয়া হয়েছে। মহাত্মা জরথুষ্ট্রেরও একশো বছর আগে এখানে এক মন্দির ছিল। মন্দিরটি

সে আমলের অন্যান্য-মন্দিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিল। জরথুষ্ট্রের ধর্মমত প্রচার বেড়ে যাওয়াব পর ওই মন্দিরটিকেও অগ্নি মন্দিরে পরিবর্তিত করা হয় এবং সেখানকার অনির্বাণ অগ্নি সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে আরবেরা ইরান দখল করার পরও এক শতাব্দী পর্যন্ত ওই আগুন জ্বলেছে। তখন জায়গাটা পারসিক বংশের এক তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। আজ ওই নগ্ন পাহাড়ের গায়ে মন্দির না থাকলেও কয়েকটি ভাঙা দেয়াল সেদিনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ইস্পাহানের অন্যান্য জায়গাগুলো দেখার জন্য আমরা শহরের বাইরে এলাম। ইস্পাহান এক বিশাল পাহাড়ি উপত্যকায় অবস্থিত। এর চারদিক পাহাড়ে ঘেরা এবং সেই পাহাড়গুলো বৃক্ষ বনস্পতিহীন। বর্ষাকালে তিব্বতের মতো ওখানেও ছোট ছোট সবুজ ঘাস জন্মায় এবং সেই সবুজ দেখে মানুষের চোখ জুড়ায়। বাইরে থেকে দেখলে ইস্পাহানকে উদ্যান নগরী মনে হয়। এর রাজপথের দু-ধারে সারিবদ্ধ চিনার ও সফেদার গাছ যা একাধারে নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে এবং সেই সঙ্গে ছায়া বিস্তার করে পথচারীদের ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করেছে। শহরের বাইরে মাইলের পর মাইল জুড়ে আপেলের সবুজ ফল ভরা বাগান। শহরের মসজিদ, দরগায় নীল রঙের টালি বসানো এবং উঁচু মিনার যা দূর থেকে দেখতে অপূর্ব লাগে। নগরের উপকণ্ঠে অনেক আধুনিক কারখানা আছে যার আকাশ ছোঁয়া চিমনিগুলো সগর্বে ঘোষণা করে চলেছে যে নবীন ইরান নবযুগকে বরণ করে নিতে সর্বতোভাবে তৈরি। নগরের বাইরে কিছু দূরে কুহ-সুফেদ (শ্বেত পর্বত) আছে আর ওর পাশ দিয়েই সিরাজ যাবার রাস্তা। শীতে এখানে তুষারপাত হয় আর বর্ষায় খানিকটা সবুজের সৌজন্যের প্রকাশ দেখা যায়। এর কাছাকাছি কিছু আর্মেনিয়ান বসতি আছে। কোনো এক সময় শহর ইস্পাহানের এলাকা এখনকার চেয়ে অনেক বড়ো ছিল। সে আমলের সাক্ষী হিসেবে কিছু ভাঙা বাড়ি বা তার দেয়াল শহরের অনেক দূরেও দেখা যায়। শহরের উপকণ্ঠের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো মোটামুটি দেখা শেষ করে আবার শহরে ফিরলাম। জায়েন্দ-এ-বুদ-এর সেতু পার হতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল গাছের সারির মধ্য দিয়ে সরলরেখায় চলে যাওয়া চাহারবাগ রাস্তাটি। রাস্তাটি যেমন সুন্দর, নামকরণও হয়েছে তেমনই সুন্দর চাহারবাগ সড়ক। এটি ইস্পাহানের প্রধানতম রাজপথগুলির একটি। এই রাস্তার ওপরেই মাদ্রাসা-শাহ। মাদ্রাসার বাড়িটি এক কথায় অপূর্ব। দরজা মার্বেল পাথরে বাঁধানো। ভেতরে বেশ বড়ো একটা হৌজ, সেটা জলে ভরা আর তার চারদিক ঘিরে সুন্দর একটি বাগান। আঙিনার চারদিকে পড়ুয়াদের পড়ার জায়গা আর শিক্ষকদের আবাসন রয়েছে। নীল রঙের মেঝের ওপরে সাদা অক্ষরের শিলালেখ, দেয়ালে নানা ধরনের শিল্পকাজ গগনচুম্বী মিনার আর সুন্দর সুন্দর গম্বুজের জন্য এই ইমারতটি পর্যটকদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

জুলফা ইস্পাহানেরই এক শহরতলীর নাম, এটা নদীর অন্য তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ন-হাজারের মতো এবং অধিবাসীরা সকলেই আর্মেনিয়ান। ইরান সীমান্তের কাছে সেবিয়োট আর্মেনিয়াতেও জুলফা নামে এক শহর আছে যার খানিকটা রয়েছে আর্মেনিয়াতে খানিকটা ইরানের মধ্যে। আর্মেনিয়ানরা এই অঞ্চলটিরও নাম দিয়েছে জুলফা। এখানকার লোকজন, বাড়ি-ঘর, কলোসিয়াম গির্জা ইত্যাদি দেখলে এ জায়গাকে ইস্পাহান থেকে সম্পূর্ণ হালদা মনে হয়। প্রকৃত

জুলফা শহর আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি কিন্তু ইস্পাহানের শহরতলীর এই জুলফাকে দেখে মনে হলো! কেউ যেন কোনো একটি আর্মেনিয়ান শহরকে তুলে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছে। আর্মেনিয়ানরা খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। খ্রিস্টানদের প্রাচীন গির্জার সঙ্গে আর্মেনিয়ান চার্চের সম্পর্ক আছে। আর্মেনিয়ানরা আর্থভাষী জাতিগুলির এক প্রাচীন শাখা। ইহুদিদের মতো তারাও বহু শতাব্দী ধরে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা হারিয়ে বসে আছে। তবে ইহুদিদের সঙ্গে আর্মেনিয়ানদের খানিকটা পার্থক্য আছে। যেখানে ইহুদিরা তাঁদের জন্মভূমি ছেড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিজেদের বসতি গড়ে তুলেছে আবার সাম্প্রতিক কালে ফিলিস্তিনে নিজেদের রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে, সেখানে আর্মেনিয়া চিরকাল আর্মেনিয়াই থেকেছে। জাতীয় স্বাধীনতা হারালেও আর্মেনিয়ানরা কখনওই তাদের জাতিসত্তা হারায়নি। আর্মেনিয়ার খানিক অংশ এখন তুরস্কে। খানিকটা ইরানে আর বেশিরভাগটাই সোবিয়ত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পড়েছে। ইসলামি শক্তিগুলি বিভিন্ন সময়ে আর্মেনিয়ানদের ওপরে যথেষ্ট অত্যাচার করেছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কিরা তাদের ওপরে যে অমানবিক ব্যবহার করেছিল তার বর্ণনা আমরা সংবাদপত্রে পেয়েছি। কিন্তু জার শাসনের অবসানের পর যখন থেকে রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন থেকে আর্মেনিয়ানদের ভাগ্যও বদলাতে শুরু করেছে। সাম্যবাদী সোবিয়ত সংঘের মধ্যে আর্মেনিয়ানদের নিজস্ব প্রজাতন্ত্র আছে। সেখানে আর্মেনিয়ান ভাষা ও সংস্কৃতির সর্বোচ্চতম পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। বর্তমানে আর্মেনিয়ান ভাষায় হাজার হাজার বই ছাপা হচ্ছে। কত দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। বাকুতে থাকার সময় আমি দুটো আর্মেনিয়ান সবাক চলচ্চিত্র দেখেছিলাম। সোবিয়টের অগাধ সম্পদের পৃষ্ঠপোষকতা যাদের পিছনে রয়েছে তাঁদের চলচ্চিত্রের উৎকর্ষতা বিষয়ে কী আর বলার থাকতে পারে। বর্তমান সোবিয়ট আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্র শুধু ওখানে বসাবাসকারি আর্মেনিয়ানদেরই উপকার করছে না, ইরান ও তুরস্কে বাস করা লক্ষ লক্ষ আর্মেনিয়ানদেরও এখন মাথা উঁচু করে বাস করতে সহায়তা করছে।

ইরানে বসাবাসকারি মুষ্টিমেয় সংখ্যার পারসি ও আর্মেনিয়ানরা কোনোদিনই তাদের ঘরের মেয়েদের পর্দার আড়ালে রাখেনি। এখন তো সমস্ত ইরানী মেয়েরা ওই প্রথাটাকে নির্বাসনে পাঠাতে তৈরি হয়েছে। ইরানী মেয়েরা এখন ইওরোপীয়ান পোশাক এবং পুরুষের মতো করে চুল ছাঁটলেও কালো ওড়নাটাকে ত্যাগ করতে পারেনি। সম্পূর্ণ পর্দামুক্ত আর্মেনিয়ান মেয়েদের বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আমি আর্মেনিয়ানদের কয়েকটি গির্জায় গিয়েছি। সেখানে দেখালে যে সমস্ত শিল্প-কাজ আছে তার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পরীতির চেয়ে প্রাচ্যের শিল্পরীতির মিলই বেশি দেখেছি। এক সময় ইওরোপীয়ান বেশভূষার প্রতি আর্মেনিয়ানদের অতিশয় আসক্তি অনেক ইরানীদের মনে বিরক্তির ভাব আনত। সেইসব ইরানী পূর্বজরা ভাবতেও পারেনি যে, যে পোশাক একদিন তাদের বিরক্তির কারণ ছিল, তাদেরই উত্তপুরুষেরা সেই পোশাককেই একদিন আপন করে নেবে। আর্মেনিয়ানদের সবচেয়ে বড়ো গির্জাটি ষোড়শ শতাব্দীতে শাহ আব্বাসের আমলে নির্মিত হয়েছে। গির্জাটির ও ভিতরের কারুকৃতি খুব সুন্দর। জুলফাতে তৈরি আঙুরের মদ সারা ইরানেই প্রসিদ্ধ।

সিরাজের দিকে

ইস্পাহান থেকে সিরাজ পর্যন্ত অনেকগুলো পরিবহন কোম্পানির মোটরবাস চলে। মোটরের কলকজা বিক্রির দোকানের অধিকাংশই মালিক আমাদের পাঞ্জাবি ভাইয়েরা। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়টা ফেরার পথে করা যাবে ভেবে, সিরাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পরার সিদ্ধান্ত নিলাম। ২৮ রিয়াল (চার টাকা বারো আনা) দিয়ে খৈয়াম কোম্পানির বাসের টিকিট কাটলাম। ৪৯৩ কিলোমিটার দূরত্বের হিসেবে ভাড়া তেমন কিছু বেশি মনে হলো না। তবে এখানকার যা দস্তুর, বিকেল চারটের সময় গাড়ি ছাড়ার কথা সেই গাড়ি ছাড়ল রাত্রি আটটায়। একজন যাত্রীকে দেখলাম, বেচারা দুদিন ধরে টিকিট কেটে বসে আছে কিন্তু অত্যধিক ভীড়ের জন্য কোনো গাড়িতেই উঠতে পারেনি। আমার কাছে প্রথমে ভাড়া চেয়েছিল ৫০ রিয়াল, তারপর সেটা দরদাম করে ২৮ রিয়ালে নেমেছে। বাসটা পুরোপুরি যাত্রী বোঝাই। এত ভীড় নিয়ে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার যেতে হবে। খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার কিন্তু অন্য কোনো উপায়ও নেই। ট্যাক্সির ভাড়া বাসের ভাড়ার চেয়ে অন্তত চারগুণ বেশি, তাও যে পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই।

আমার সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন আলি আসগর সিরাজি এবং শাহরিয়ার যজ্জদী। প্রথম ভদ্রলোক ইরাক থেকে ফিরছিলেন এবং ইংরেজি জানেন। শাহরিয়ার সেই সামান্য সংখ্যক ইরানীদের অন্যতম যারা ইরানে জরথুষ্ট্রের ধর্মমতের ক্ষীণ প্রদীপটিকে এখনও জ্বালিয়ে রেখেছেন। শাহরিয়ার অনেক বছর বোম্বাইতে কাটিয়েছেন, হিন্দি ও গুজরাটি ভাষা বুঝতে পারেন। এই দুই ভদ্রলোকের সহচর্যে সিরাজ পর্যন্ত যাওয়াটা বিরক্তিকর লাগেনি। রাত্রিতে ড্রাইভার চম্ভু টেনে প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল। গায়ে কিছু চাপা দেবার জিনিসের অভাবে আমার বেশ অসুবিধা হতে লাগল। নিজের জামা কাপড় তেহরানে রেখে আসার ফলে ঠান্ডায় প্রায় জমে যাচ্ছি। রাত্রি শেষ হতে আরও ঘন্টা তিন-চার বাকি এমন সময় বাস এক জায়গাতে থামল, ওখানেই আজকের রাত্রিটা থাকা হবে। পরদিন (১৮ সেপ্টেম্বর) সকালে জলখাবার খেয়ে আবার রওনা হলাম। পাহাড়ি রাস্তা সঙ্কট, রাস্তা তৈরির নৈপুণ্যে চড়াই উতরাই তেমন কঠিন বোধ হলো না। এমনিতে চারদিক শুকনো এবং বৃক্ষ তবে কোনো গ্রামগঞ্জ এলে আবার বেশ সবুজের মেলা দেখতে পাওয়া যায়। দুপুরে খাবার জন্য এক জায়গায় বাস দাঁড়াল। মাংশ, রুটি, বিনা দুধের চা আর মিষ্টি আঙুর দিয়ে বেশ জ্বরদস্ত একখানা খাওয়া হলো। দুজনের জন্য খরচ পড়ল মাত্র পাঁচ আনা। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে এর জন্য খরচ পড়ত কম করে হলেও অন্তত দেড় টাকা। ইরানীরা ভাত পছন্দ করে কিন্তু ইরানে ধান উৎপন্ন হয় একমাত্র সমুদ্রতটবর্তী গিলান ও মাজিন্দরান প্রদেশে। চালকে এখানে বলে 'বিরঞ্জ' যার সঙ্গে সংস্কৃত 'ব্রীহি' শব্দের মিল পাওয়া যায়। রাস্তায় প্রতি দশ বারো মাইল অন্তর পুলিশের চৌকি, বন্দুক কাঁধে আর্মেনিয়ান সেপাই পাহারা দিচ্ছে। এই নীল উর্দি পরা জওয়ানদের উপকার ইরানবাসীরা আজকাল ভুলতে বসেছে। তারা জানে না যে এই সৈনিকদের প্রত্যেকেই ইরানের সর্বত্র রাতে কিংবা দিনে অবিশ্রান্ত গতিতে গাড়ি চলেছে। আমাদের গাড়িতে একজন পলটনের হাবিলদার ছিলেন। তিনি তাঁর পদমর্যাদা সম্বন্ধে অতি মাত্রায় সচেতন ছিলেন। গাড়ির মধ্যে সব সময় তাঁর মেজাজ চড়া এবং ঘাড় উঁচু থাকত। তিনি সব সময় আর পাঁচজনের চেয়ে নিজেকে আলাদা করে রাখার চেষ্টা করতেন। গাড়িতে ন-

জন মহিলা ছিলেন। অধিকাংশই গ্রামের, তাই তাঁদের মধ্যে বোরখার আধিক্যটাও ছিল একটু বেশি। মোটরবাসে একটা জিনিস সত্যিই বড়ো বিরক্তিকর। সেটা হলো সারা রাস্তা ধুলো উড়িয়ে চলা এবং পরনের জামাকাপড়ের ওপরে এক ইঞ্চি পরিমাণ ধুলোর আস্তরণ জমে যাওয়া।

পার্সোপোলিস — আমরা ইতিহাস প্রসিদ্ধ দারয়োশের রাজধানীর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছানাম। যাত্রীরা বলল তখ্ত-এ-জমশীদ আসছে। পার্সোপোলিস-এর এখন এই নামটাই প্রচলিত। একটা ছোট পাহাড়ি জোত পার হতেই, পাহাড় ক্রমাগত দূরে সরে যেতে লাগল আর সেই জায়গায় আসতে লাগল বিশাল সমতল ভূমি। ডানদিকে দূরের পাহাড়ে কিছু ভাঙা বাড়ি ঘর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, লোকে বলল—ওটা — নখ্‌সে বুস্তম। চারটের সময় গাড়ি তখ্ত-এ-জমশীদে পৌঁছাল। পাশে প্রায় রাস্তার ওপরেই ছোট মতো একটি গ্রাম। মহান দারয়োশের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে বাঁ-দিকে পড়ে। ২০০০ বছর আগে দিঙ্জিয়ী আলেকজান্ডার পার্সোপোলিসকে ধ্বংস করেছিলেন। পার্সোপোলিসকে ধ্বংস করে আলেকজান্ডার ভেবেছিলেন যে তিনি ইরানের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকেও সেই সঙ্গে ধ্বংস করে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর ভাবনা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। গ্রিকদের বিজয়ের দুশো বছরের মধ্যে ইরান আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। পার্সোপোলিসের হৃত গৌরব অবশ্য আর ফিরে আসেনি। তবে কোরোশ ও দারয়োশের মতো সম্রাটদের রাজধানী হবার সুবাদে পার্সোপোলিস ইরানী জাতীয়তার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে যখন আরবেরা ইরানের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি দুটোকেই ধ্বংস করে, তখন থেকে ইরান এক ধ্বংসস্থল ও নিঃশেষিত দেশ হয়েই ছিল। বাগদাদের খলিফাদের আমলে একবার এরকম প্রস্তাবও উঠেছিল যে ইরানের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক চিহ্ন হয়ে যে সমস্ত স্তম্ভ এবং সুদৃঢ় পাষাণ খণ্ড পার্সোপোলিসে আছে, সেগুলোকে ওখান থেকে তুলে কোনো মসজিদ বা মহল তৈরিতে লাগানো হোক। সত্যিসত্যি সেরকম হলে ইরানের সর্বোত্তম জাতীয় তীর্থটির কোনো পরিচয়ই আর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য থাকত না। খলিফার আদেশ পালনের জন্য সকলেই খুব তৎপরও ছিল। খলিফার দরবারে তখন মহামন্ত্রী পদে ছিলেন ইরানী বংশের সন্তান বরামকা। বরামকা যখন এই স্থপতি ভাঙার জন্য খলিফার আদেশের কথা শুনলেন, তখন তিনি অনেক অনুনয় করে খলিফাকে বললেন — হুজুর, মালিক, তখ্ত-এ-জমশীদ হলো সেই জায়গা, হুজুরত আলি রজ আল্লাহ্‌ অনুহু নামাজ পাঠ করেছিলেন। এভাবেই পার্সোপোলিসের ঐতিহাসিক ধ্বংসস্থল বর্বর মানবদের হাতে আর-একবার ধ্বংস হওয়ার থেকে রেহাই পায়। ইরানী জাতি এজন্য বরামকার কাছে অত্যন্ত ঋণী। পাহাড়ের শৃঙ্খলে আবদ্ধ পার্সোপোলিস নবীন ইরানকে ডাক পাঠায়। এর বিশাল পাষাণ স্তম্ভের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ইরানী তরুণ তাদের বর্তমান দুরবস্থার কথা ভুলে যায়, ভুলে যায় তাদের অসহায়ত্বকে। তারা তখন ভাবে, এই বিশাল স্তম্ভ যারা নির্মাণ করেছিল, পাষাণ স্তম্ভকে যারা প্রাসাদের দেয়ালে রূপান্তরিত করেছিল, তারা কারা? অবশ্যই ইরানীরা। একদিন তাদের বিজয় পতাকা সিন্ধুতট থেকে গ্রিস, আভিসিনিয়া থেকে পামির মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তার আগে পৃথিবীর কোথাও এতবড়ো সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়নি। তারাই বিশ্বকে সাম্রাজ্যের পরিচালনা পদ্ধতি শিখিয়েছে। তারা বলখ থেকে মংঘি এবং এথেন্স থেকে তক্ষশিলা পর্যন্ত সুরক্ষিত

রাজপথের স্রষ্টা, তারাই প্রথম ডাক ব্যবস্থা চালু করেছিল। তাদের সম্বন্ধে তাদের শত্রুদের হৃদয়েও শ্রদ্ধা ছিল। তারা বলত — ইরানী জাতি কখনও মিথ্যা বলে না, মিথ্যা বলতে তারা জানে না, তারা মৃত্যুঞ্জয়ী। এই গৌরবময় অবস্থার সামনে দাঁড়িয়ে ইরানী তরুণদের হৃদয় অবশ্যই উদ্বেলিত হয়, তাদের ভাবতে শেখায় — আমরা কোথায় ছিলাম আর কোথায় এসে পৌঁছেছি। কোথায় আমরা একদিন পৃথিবীর শাসক, শিক্ষক এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচারক ছিলাম আজ তার সমস্তটুকু খুইয়ে পরিবর্তে আরবের মরুভূমির শুকনো বালি ঘরে তুলছি। আর এরকম ভাবের উদয় হতেই তাদের দৃষ্টিপথ থেকে শাহ আব্বাস কিংবা নাদির শাহ হটে যায়। দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয় অখামনশী ও সাসানি বংশের বীরের দল। ইরানী তরুণেরা তার ভূমিতে জন্ম নেয়া এবং তার সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্যে পালিত হওয়া বীরদেরই তাদের যথার্থ পূর্বজ বলে স্বীকার করে। তারা উচ্চকণ্ঠে বলে — ইরান দীর্ঘজীবী হোক দারয়োশ, কোরোশ দীর্ঘজীবী হোন। অদেশিরের রোম বিজয়ের কাহিনি পড়ে তারা গর্বিত হয়। শোপোর — ইতিহাস যাকে ইরানের সমুদ্রগুপ্ত নামে অভিহিত করেছে — তাঁর হাতে রোমান সম্রাটের বন্দী হওয়ার ইতিহাস পড়ে উচ্ছ্বসিত হয় আবার অনাবশিরবানের ন্যায়প্রিয়তার কথা জেনে মুগ্ধ হয়। তাদের বাদশাহ খুসরো রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে, পবিত্র সলীব—যার ওপরে রেখে যিশুখ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল—জয় করে ইরানে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁকে স্বাগত জানাতে হৃদয় এগিয়ে আসে। আবার তারা এই ইতিহাসও জানে যে ৬৫২ খ্রিস্টাব্দ ইরানের বীরত্ব ও স্বাধীনতার অন্তিম বছর, তখন তারা হৃদয়ে তীর বৈধায় যন্ত্রণা অনুভব করে। তা সত্ত্বেও যখন তারা পড়ে যে শেষ শাহানশাহ যজদগির্দ তাঁর সমস্ত শক্তি একত্র করে উমরের অসভ্য আরব সওয়ার বাহিনীর মোকাবিলা করতে এগিয়ে যান তখন ইরানি তরুণদের মন তাঁর প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন তারা ভুলে যায় যে তাদের বর্তমান ধর্ম ইসলাম আরব বিজেতাদেরই দান। তারা মাঝে মধ্যে বিস্মুদ্ধ হয়ে ওঠে তাদের পূর্বজদের প্রতি। যুদ্ধে তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন এটা ঘটনা, কিন্তু আরবদের হাতে ইরানের সর্বস্ব তুলে দেবার অধিকার কে তাঁদের দিয়েছিল। যে জরথুষ্ট্র আর অর্হুর মজদা তাঁদের মধ্যে দারয়োশ আর নৌসের বাঁ-র মতো মানুষদের জন্ম দিয়েছেন সেই অর্হুরমজদাকে ত্যাগ করে কেন তাঁরা আল্লাহকে স্বীকার করতে গেলেন। শুদ্ধ এবং মধুর পঙ্কজী ভাষার মধ্যে হাজার হাজার কর্ণকটু, নীরস আরবি শব্দ ঢুকিয়ে আরবরা তাকে একটা অপরিচ্ছন্ন ভাষায় পরিণত করেছে। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ইরানী তরুণেরা বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পায়। তাদের মতে যজদগির্দের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ইরানও অবলুপ্ত হয়েছে। বিগত তেরো শতাব্দী তাদের কাছে কোনো অর্থ বহন করে না। ওই তেরোশো বছরের ইতিহাস দাসত্ব, অপমান আর বঞ্চনায় ভরা এক অন্ধকার যুগের ইতিহাস। প্রাচীন ইরানের ঐতিহ্য আবার ফিরে আসছে শাহ পঙ্কজীর হাত ধরে। তাই তারা শাহ পঙ্কজীর প্রতিটি পদক্ষেপকে সমর্থন জানায় যাতে ইরান আবার মহান দারয়োশের সময়ের ইরান হয়ে উঠতে পারে। তারা আবার জরথুষ্ট্র ও অর্হুরমজদাকে স্মরণ করতে চায়।

যে পর্সোপোলিসকে দেখলে, ইরানী তরুণেরা ভাবাবেগে উদ্বেল হয়, জাতীয় জীবনে তার স্থান যে কোথায় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৩২ সালের খনন কাজের সময় তখত-এ-জমশীদ থেকে দুটো স্বর্ণশাসন উদ্ধার করা হয়েছে, যাতে মহান সম্রাট দারয়োশের শাসনকালের

যাবতীয় অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে। ইরানের লোক এই স্বর্ণলেখ দুটো উদ্ধার হওয়ার পিছনেও জাতীয় আবেগের প্রভাব দেখতে পায়। তারা বলে ওই দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নমুনা এতকাল উদ্ধার না হয়ে শাহ পহলবীর আমলেই কেন উদ্ধার হলো? কারণ শাহ রজাই ও দুটো অভিলেখের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কারণ তেরো শতাব্দীর পর আবার ইরান প্রকৃত ইরানীর শাসনে শাসিত হচ্ছে। দারয়োশনামা নামে পরিচিত ওই দুই স্বর্ণলেখ নিয়ে ইরানের অনেক বড়ো বড়ো কবিরাজ কবিতা রচনা করেছেন।

তখত-এ-জমশীদ এর সামনে এখন বিশাল জনশূন্য ময়দান। যখন এই জায়গা সমগ্র ইরান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল তখনও কী এরকম বৃক্ষ, শূষ্ক, জনহীন প্রান্তর ছিল? ইরানের বর্তমান রাজকীয় সরকার প্রান্তরের একটা অংশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছেন, বোধহয় ওখানে কোনো উদ্যান কিংবা অন্য কোনো স্মারক নির্মিত হবে। ডাইভারকে অনুরোধ করে কয়েক মিনিটের জন্য গাড়িকে এখানে দাঁড় করলাম। সেই মহান ধ্বংসস্থলের দিকে আমিও কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন ইরানের উদ্দেশে আমার সশ্রদ্ধ অভিভাদন জানালাম।

সিরাজ — সন্দের আলো জ্বলার সময়ে আমরা পাহাড়ের সেই জোতে পৌঁছলাম যেখানে থেকে নামতেই সিরাজ এসে গেলো। সাদী, হাফিজ প্রভৃতি বিখ্যাত অনেক কবি ও সাধু মহাত্মাদের জন্মভূমি হওয়ার জন্য সিরাজকে ইরানের এক তীর্থক্ষেত্র বলা যায়। নগরের গম্বুজ কাছে আসতেই কিছু বৃদ্ধ সহযাত্রী আল্লা হো আকবর ধ্বনি দিয়ে তাদের হর্ষোল্লাস প্রকাশ করল। পুলিশ চৌকিতে সকলের জাবাজ এবং পাসপোর্ট দেখা হলো। সিরাজে নেমে আমার প্রথম কাজ হলো থাকার একটা আস্তানার সন্ধান করা। এক সঙ্গী মেহমান খানা-ইরান-এর নাম বললেন। আর্কের (কেম্মা) কাছে, প্রধান রাজপথের ওপরেই হোটেলটি। হোটেলের পরিচালক কোনো এক সময় কিছুকালের জন্য বোম্বাইতে ছিলেন সেজন্য খানিকটা হিন্দি ভাষা বোঝেন। তিনি একথান্না বেশ বড়ো এবং সাফসুতরো ঘর দেখালেন যেখানে চেয়ার, টেবিল, খাট, বিছানা সবই খুব পরিপাটি করে সাজানো ছিল। ঘরে দেখলাম বিদ্যুতের আলোও আছে। স্নানের ব্যবস্থা আলাদা। ভাড়া জিজ্ঞেস করে জানলাম পাঁচ রিয়াল (সাড়ে বারো আনা) দৈনিক আর প্রতিবার স্নানের জন্য পাঁচ পয়সা। একটু বলতেই ম্যানেজার চার রিয়ালে রফা করতে চাইল, কিন্তু ব্যবস্থা ইত্যাদি এত ভালো এবং এত সস্তা মনে হলো যে আমি পাঁচ রিয়ালই দিতে রাজি হলাম। ইওরোপের যে কোনো মাঝারি শহরেও এরকম ব্যবস্থাদিসহ একখানা ঘরের জন্য হোটেলওলারা কমপক্ষে পাঁচটাকা ভাড়া নিত। খাওয়ার খরচ অবশ্য আলাদা ছিল, তবে তার জন্য কখনওই চার-পাঁচ আনার বেশি পড়ত না। ইরানে আজকাল সতি মিথে খুব চলে। কিন্তু মেহমান খানা-ইরান এর নীল চক্ষু প্রৌঢ় ম্যানেজারের মধ্যে আমি তেমন কিছু দেখিনি। যদি প্রত্যেক হোটেল ম্যানেজার এই ভদ্রলোকের মতো হতো, তাহলে প্রত্যেক বিদেশি ভ্রমণার্থী ইরান সম্বন্ধে এক মধুর স্মৃতি নিয়ে দেশে ফিরত। সে রাত্রিতে গরম জলে স্নান করে খাওয়া সারলাম এবং একটু সকাল সকালই শুষে পড়লাম। তেহরান ছাড়ার পর ভালো করে ঘুমোনা হয়নি। এখানে তার সবটা উসূল করে নিলাম।

সকালে উঠে (১৯ সেপ্টেম্বর) প্রাতরাশ সেরে শহর ঘুরব ঠিক করলাম। আসার পথে আলি আসগর সাহেব অনেক বড়ো বড়ো কথা বলেছিলেন — আপনাকে এই দেখাব, সেই

দেখাব, আমার বাড়ি নিয়ে যাব। যেখানে আপনি আমাদের ঘরোয়া জীবন-যাপন দেখবেন। কিন্তু কোথায় সে সব? এখানে থাকাকালীন দু-একবার তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছে এবং প্রতিবারই তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন — মাফ করবেন, আমার এই কাজ পড়ে গেছে, ওই কাজ পড়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য আমারও তাঁর সাহায্যের কোনো দরকার ছিল না। জাপান, মাধুরিয়া কিংবা রাশিয়ার তুলনায় এখানে ভাষার ব্যবধান অনেক কম। বাজারে দোকানে দরদাম করার ব্যাপারটা শিখে গিয়েছি। প্রথম দফায় প্রতিটি জিনিসের দ্বিগুণ দাম চাওয়াটা এখানকার রেওয়াজ। হোটেল ম্যানেজার বলে দিয়েছিলেন যে হাফিজ ও সাদীর সমাধিস্থল দেখতে হলে আমি যেন কোটায়ালি থেকে গাইড নিয়ে নিই, তাহলে দেখতে সুবিধা হবে। এখানে কোটায়ালিকে আরবি ভাষায় বলে ‘নজমিয়া’। তবে আমি ইরানে থাকতে থাকতেই ওই আরবি শব্দের বদলে ‘শহবানি’ এই ফারসি শব্দটির ব্যবহার সরকারিভাবে শুরু হয়ে যায়। আমার হোটেল থেকে নজমিয়ার দূরত্ব বেশি নয়। নজমিয়ার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমার সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং আমার সঙ্গে একজন লোককে দিয়ে দিলেন। এই রাস্তাটির নামও কবি হাফিজের নামে— খোয়াবানা - এ - হাফিজ। তবে হাফিজ এবং সাদী কবি হিসেবে যত উচ্চস্তরেরই হোন না কেন, ইরানে তাঁরা সেই মর্যাদার সঙ্গে আলোচিত হন না, যা হয়ে থাকেন কবি ফিরদৌসী। বর্তমান ইরান সরকার ইরানি জাতিসত্তার আত্মগৌরব বাড়ে এরকম প্রতিটি বিষয়কেই উৎসাহিত করেন। সেজন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উপেক্ষিত পড়ে থাকা হাফিজের মকবরার সংস্কার করা হচ্ছে। আরব থেকে আসা ধর্মের ওপরে পরোক্ষভাবে যত আঘাত হানা যায় তা হানতে বর্তমানে ইরান সরকার কসুর করছে না। হাফিজ ও সাদীর সমাধিস্থলে তাঁদের ছবি টাঙানো তারই এক নিদর্শন। হাফিজের সমাধিস্থল দেখে সাদীর সমাধিস্থল দেখতে গেলাম। জায়গাটা এখান থেকে এক মাইল দূরে, করিয়া সাদী নামে এক গ্রামের মধ্যে। বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে। দূর থেকে পাহাড়ের কাছে হলুদ রঙের পাতাঙলা কিছু গাছ দেখতে পেলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি, কাছে যেতে তবে বুঝলাম পাহাড়ের নীচের সমতল ভূমিতে সারি সারি ওই গাছ লাগানো হয়েছে। প্রত্যেকটা গাছের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফাঁক আছে। জিজ্ঞেস করায় দুবুখি চালক বলল— ওগুলো আঙুর গাছ। এখানে আঙুর গাছ লতানো ধরনের হয় না। গাছ মাটি থেকে হাতখানেক উঁচু হলে ডালপালা ছেঁটে দেওয়া হয়। কয়েক বছর পর ওই গাছগুলোই খুব ইষ্টপুষ্ট হয়ে বেড়ে ওঠে। নতুন করে ডালপালা গজায়। ওই ডালগুলোতেই গুচ্ছাকারে আঙুর ফলে। মাঝেমধ্যে আবার ডালপালা ছাঁটতে হয়। সিরাজের আঙুর সম্বন্ধে কী আর বলব। এক একটা দেড় ইঞ্চি লম্বা মোটা সোনালি রঙের ফল। ফলের মধ্যে দানা বা বিচি নেই বললেই হয়। স্বাদ আর মিষ্টত্ব এত ভালো যে খেয়ে পেট ভরে গেলেও মন ভরে না। এখন থেকে দুমাস আগেই আঙুরের মরশুম শেষ হয়েছে, ফসল উঠে গেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সিরাজের রাস্তায় ফেরিওলারা গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে এক অনায়াস এক সের আঙুর বিক্রি করছিল। একবার মনে হলো, কী হবে আর দেশ দেশান্তরে ঘুরে? শাহ রজার রাজত্বে অন্তত ‘হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী’ গোছের কোনো ব্যবস্থা নেই, অতএব থেকে যাই এখানে। সিরাজ ছাড়ার পরেও বহুদিন পর্যন্ত ওখানকার আঙুরের স্মৃতি তাজা ছিল। আজ এতদিন পর আমার ভ্রমণলিপি লিখতে বসে সেই আঙুরের কথা মনে করে জিভে জল আসছে। ফসলের মরসুম শেষ

হওয়ার পরও যদি এত সস্তা দরে আঙুর বিকোয়, তাহলে ভরা মরশুমে কি আধ পরস্যা সের দরে আঙুর বিকিয়ে ছিল?

সাদীর সমাধিস্থলে যাবার আগে ছোট একটা খালের মতো জলশ্রোত দেখলাম। শূন্যল্যাম এটি সাদীর সমাধিস্থল পর্যন্ত গিয়েছে। ওখানে একটি বার্না আছে যার নাম আব-এ-সাদী। খালের জলে প্রায় ডজন দুয়েক মেয়েরা জামা কাপড় ধুচ্ছিল। ওই জমায়েতে প্রায় সব বয়সের মেয়েরাই আছে। অল্প বয়সিদের সকলের চুলই ছোট করে ছাঁটা, আর প্রবীণাদের সামনের দিকে কাটা হলেও পিঠে বেনী ঝোলানো আছে। প্রথমে আমাকে যখন কেউ বলে ছিল যে ইরানে শত শত মেয়েরা পুরানো নিয়ম ভেঙে চুল ছোট করে কাটছে, তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়নি। আজ নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস করতেই হলো। কিছুদূর পর্যন্ত সামান্য চড়াই, তারপর পৌঁছাল্যাম সাদীর মকবরাতে। একটা ছোট বাগানের মধ্যে মকবরাটি রয়েছে। কিংবা একথাও বলা যায় যে মকবরাকে ঘিরেই বাগানটি তৈরি হয়েছে। বাগানটি অবশ্য তেমন আহামরি কিছু নয়, সামান্য কয়েকটা পাইনের গাছ, খানিকটা সবুজ ঘাস আর কয়েকটা ফুলগাছ। মকবরাটি একটি ইটের তৈরি দোতলা বাড়ি। আমরা সমাধি ঘরে ঢুকলাম। ঘরের চারদিকে মার্বেল পাথরের জালি দেওয়া। দরজার ওপরে সাদীর এক প্রাচীন প্রতিকৃতির ফোটোগ্রাফ লাগানো আছে। সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে নানা ভাবের উদয় হচ্ছিল। আর হবেই বা না কেন, আমি যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছি তার নীচে পশ্চিম এশিয়ার এক মহান কবি চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। সাদীর মৃত্যু অন্য কোনো জায়গাতে হয়েছিল এবং সেখানেই তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ ছিল। পরে সেখান থেকে তুলে এনে তাঁর জন্মভূমিতে তাঁকে পুনরায় সমাধিস্থ করা হয়। ফেব্রার পথে সেই নীরস পার্বত্য ভূমি দেখে মনে হলো যে প্রকৃতি এই অঞ্চলকে তার নিজস্ব সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করেছে, অথচ এই উষর মাটিতে হাফিজ ও সাদীর মতো সরস কবির জন্ম হয়েছে। এটা কী প্রকৃতির কোনো কৌতুক, নাকি এই অঞ্চলের শ্রীহীনতাই দুই কবিকে অন্য কোনো মানসলোকে যেতে বাধ্য করেছে এবং সেখানে তাঁরা প্রকৃতি নটির শৃঙ্গার লীলা অভিনীত হতে দেখেছেন এবং তারই বর্ণনা তাঁদের লেখনী নিঃসৃত হয়ে কবিতার জন্ম দিয়েছে।

২০ সেপ্টেম্বর ছিল শুরুব্বার। যদিও পরে দেশে ফিরে স্টেটসম্যান পত্রিকা মারফত জেনেছি যে ইরান সরকার শুরুব্বার সাপ্তাহিক ছুটির দিনকে বদলে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করেছেন। ছুটির দিন না হওয়ায় জুম্মার নামাজের দিনটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে খুবই পবিত্র। তবে সাম্প্রতিক কালের ইরান তুরস্কের মতোই এক অন্য ভাবনায় মাতোয়ারা। ইসলাম কি বলবে এনিয় তাই তার কোনোমুখা বাঁথা নেই। মন থেকে তারা তো চায় সেই সব কিছুকেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে, যা আরবেল্লা ইরান জয় করে জোর জবরদস্তি তাদের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছে। ইরানের নতুন বাদশাহ এটা খুবই ভালো বোঝেন যে প্রথমে ইরানিদের সুপ্ত জাত্যভিমানকে জাগিয়ে তুলতে হবে। একবার সেটা যদি সম্ভব হয় তাহলে যে কোনো সংস্কার বা বিপ্লব করা যেতে পারে, ধর্মের গোঁড়ামি কিংবা ধর্মের ফেরিওলা মোল্লার দল তখন আর কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। তবে রজা শাহ আফগানিস্তানের শাহ আমানুল্লাহর মতো ভুল করতে চান না। রজা শাহও আমানুল্লাহর মতো দেশের দ্রুত উন্নতি দেখতে চান, কিন্তু তিনি শাহ আমানুল্লাহর মতো অত তাড়াতাড়ি কিছু করতে চান না। খুব ভালো করে ভাবনা চিন্তা করে, কঠিন সিদ্ধান্তগুলো নিতে

চান। আমি যখন ওখানে ছিলাম তখনও শুরুরাই সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল। ওই দিন অনেক দোকান পাট বন্ধ থাকে। শাহ রজার পিছনে সমস্ত ইরানী তবুণদের সমর্থন আছে। ইরানের সামরিক বাহিনীর কাছে শাহ দেবতার মতো। শাহর আমলে সামরিক বাহিনীর প্রভূত উন্নতি হয়েছে। একজন সাধারণ সৈনিক থেকে উচ্চতম অফিসার পর্যন্ত বাকবাকি উর্দি পরে যা তাদের মনে এক বিশেষ ভাবনা সৃষ্টি করে। সাধারণ সৈন্যদের মাসিক বেতন পনেরো টাকা। যা ওখানকার জীবনধারণের মান এবং জিনিসপত্রের দাম কম হওয়ার জন্য, যথেষ্ট বলা যায়। প্রতিমাসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাইনে চুকিয়ে দেওয়া হয়। সৈন্যবাহিনীর মতো পুলিশও শাহ রজার অত্যন্ত অনুগত। সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী এবং দেশের তবুণ সমাজ যাঁর পিছনে আছে, তাঁর ক্ষতি কে করতে পারে? শাহ রজার প্রতাপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একজন গ্রামের লোক আমাকে একটা ঘটনার কথা বলেছিল। সমস্ত ইরান যখন শাহকে বাদশাহ বলে মেনে নিয়েছিল তখনও পারস প্রদেশ আর তার রাজধানী সিরাজ সাহকে সার্বভৌম বাদশাহ বলে মানতে অস্বীকার করে। শাহ একের পর এক সৈন্যবাহিনী পারসে পাঠান কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। অবশেষে শাহ নিজে সৈন্য বাহিনী নিয়ে সেখানে যান এবং তাঁর বিশাল গোলন্দাজ বাহিনীকে কামান দাগার আদেশ দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিপক্ষের কামান স্তব্ধ হয়ে গেলো এবং পারস প্রদেশও শাহর সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে নেয়।

শহরের রাস্তায় এখনও দু-একজন বন্দুক কাঁধে সৈন্যকে আসা যাওয়া করতে দেখলাম।

ইরানের লোক খুব সিনেমা দেখতে ভালোবাসে। সবাক ও নির্বাক দু ধরনের চলচ্চিত্রই এখানে দেখানো হয়। তাজিকিস্তান সোবিয়েট প্রজাতন্ত্রের ভাষা ফারসি এবং ওই ভাষাতে তাঁরা বেশ কয়েকটি সবাক চলচ্চিত্র তৈরি করেছে। চলচ্চিত্রগুলোর মানও যথেষ্ট উন্নত। সাধারণভাবে ইরানের সঙ্গে সোবিয়েটের সম্পর্ক ভালো। কিন্তু অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের মতো তারও সাম্যবাদ ভীতি আছে। আর সোবিয়েটের যে কোনো প্রজাতন্ত্রে নির্মিত চলচ্চিত্রে কিছু না কিছু সাম্যবাদী ভাবধারার পক্ষে প্রচার থাকবেই, এটা ধরে নিয়ে ও দেশের ছবি ইরানে আসতে দেয়া হয় না। যদি তাজিকিস্তানের ফারসি ভাষার ছবি এখানে দেখানো হতো তাহলে ইরানীরা তাকে ভালোমতো বুঝতে পারত। ইরানে সাধারণত যে সব ছবি দেখানো হয় তার অধিকাংশই ফারাসি অথবা আমেরিকান। দর্শকেরা ছবির ভাষার এক বর্ণও বোঝে না, সবাক চলচ্চিত্র তাদের কাছে নির্বাক চলচ্চিত্রের মতোই লাগে। সেজন্য এখন কাহিনির ঘটনা পরম্পরা ইরানী অথবা রুশ ভাষায় লিখে পর্দায় প্রতিফলিত করা হয়। রুশ বিপ্লবের পর লক্ষ লক্ষ রাশিয়ান নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে বাস করছে। আজ তারা ইউরোপ, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে আছে। কয়েক লক্ষ রুশ ইরানেও বসবাস করছে। পছলবী, তেহরান আর মশহদ শহরে তাদের সংখ্যা বেশ ভারী। এছাড়া এখানকার অনেক ছোটোখাটো শহরেও রাশিয়ানরা বসতি করেছে। এইসব স্থিত রুশদের পরিবারের মেয়েরা ইরানী হোটেলগুলোতে পরিচারিকার কাজ করে এবং সাংহাইয়ের মতো এখানেও কয়েক হাজার রাশিয়ান মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সব রুশ ভাষী দর্শকদের জন্য সিনেমাতে রাশিয়ান ভাষাতেও হেঁড়ং দেখানো হয়। কোথাও কোথাও আবার পর্দার কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে কাহিনীর বিবরণ দেয়।

ইরানের সমস্ত শহরেই রাস্তাঘাট অত্যন্ত পবিত্রতার পরিচ্ছন্ন এবং যথেষ্ট চওড়া। রাস্তাগুলো এত সোজা চলে গেছে যে দেখেই বোঝা যায় যে যথেষ্ট পরিকল্পিতভাবে ওগুলো তৈরি। সত্যি কথা বলতে ইরানের সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন রাস্তা ভারতবর্ষে যা একটু নয়া দিল্লিতেই আছে। যখন শুনি এই সমস্ত নির্মাণকাজ দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে হয়েছে, তখন বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। সিরাজের রাস্তাঘাটও তেমনই সরল-সোজা এবং চওড়া। তেহরান থেকে বুশায়র হয়ে জাহাজে করাচি কিংবা বোম্বাই যাওয়া চলে কিন্তু আমার স্থির সিদ্ধান্ত যে আমি স্থলপথেই দেশে ফিরব। অতএব ওদিকে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। তবে শুনলাম সিরাজ থেকে বুশায়রের পথে বেশিরভাগটাই উতরাই। আর তা হবে নাই বা কেন, সমুদ্রতট থেকে সিরাজের উচ্চতা ৪২০০ ফুট। অতএব সমুদ্রতটে যেতে হলে উতরাই তো অবশ্যই থাকবে। সিরাজে আমি দুজন পাঞ্জাবি মুসলমান যাত্রীকে পেয়েছিলাম। ফেব্রার পথে তাদের সঙ্গে পরিচয়। দুই ভদ্রলোকই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট এবং সরকারি কর্মচারী। এদের মধ্যে একজন কো-অপারেটিভ বিভাগের কর্মী, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁরা সঙ্গে একটা যন্ত্র এনেছিলেন যা দিয়ে নিংড়ে ফলের রস বের করা যায়। তাঁরা খুব অবাক হয়ে বলেছিলেন যে এক রিয়ালের আঙুর কিনে এক বোতল রস পাওয়া গেছে, দেশে এই এক বোতল আঙুরের রসের কত দাম হবে? ওদের মধ্যে একজন আবার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষার সর্বোচ্চ পরীক্ষা মুনসী- ফাজিল পাশ করে এসেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, যে ইরানের ফারসি তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না। আমি বললাম — তাহলে তো দেখছি আপনার চেয়ে আমার অবস্থা ভালো। কাজ চলার মতো ফারসি বুঝতে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। যদিও আমার ফারসি জ্ঞান কয়েকটি ছোটোখাটো বই আর গুলিস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঘটনা হচ্ছে এই যে, ভদ্রলোক ফারসি ভাষা শিখতে গিয়ে যথেষ্ট মোটা মোটা বই পড়েছেন ঠিকই, কিন্তু দেশ, কাল ভেদে একই ভাষার নানা রকম উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটে। সেটা জানেন না। আমি তো প্রত্যেক জায়গার প্রতিটি শব্দকে ভাষাতত্ত্বের নিরিখে জানার বা বোঝার চেষ্টা করেছি। যার ফলে আমি বুঝতে পেরেছি যে ‘কমকম’ শব্দ কখনও কখনও ‘চমচম’ হয়ে যায় কিন্তু অর্থ একই থাকে। অর্থাৎ স্থানভেদে ‘ক’ শব্দ ‘চ’ কিংবা ‘গ’ শব্দ ‘জ’ হয়ে যায়। তাছাড়া ইরানীদের ফারসি উচ্চারণে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের দেশের ছাপড়া অথবা বালিয়া জেলার মতো এখানেও বাক্যের অন্তিম শব্দটিকে একটু দীর্ঘায়িত করে সাংগীতিক ধ্বনিতে উচ্চারণ করা হয়। যেমন ‘আপনি কোথায় যা - ছ - ছে - এ - ন’ আর ইরানী ফারসিতে ‘শুমা কুজা র - বী - ঙ - ঙ’ এই দুই উচ্চারণে অনেক মিল আছে তবে কেন আছে তা বলতে পারব না। আমার ওই দুই স্বদেশি ভাইয়ের ইরানের কিছু কিছু বিষয়কে খুব আশ্চর্যজনক মনে হয়। জাতীয়তাবাদের কাছে ইরানে ধর্মের যে দুর্গতি হচ্ছে সেটা তাঁদের কাছে নতুন এক অভিজ্ঞতা। তাঁরা ভেবেছিলেন যে ভারতবর্ষের মতো পৃথিবীর সর্বত্রই বোধ হয় আগে ধর্মকে রেখে দেশকে পিছনে রাখা হয়। তাঁরা তো আমার কাছে রীতিমতো অভিযোগ করলেন যে ইরানীরা কেন ধর্ম থেকে এতদূরে সরে যাচ্ছে। তাঁদের বোঝাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ মাত্র সাতদিন হয়েছে তাঁরা ইরানে এসেছেন। এখনও তাঁদের অনেক কিছু দেখার বাকি আছে এবং সেই সঙ্গে বাকি আছে অবাক হওয়াও। তবে একটা পরামর্শ আমি তাঁদের দিলাম। তাঁরা সমুদ্রপথে

দেশে ফেরার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমি বললাম — ইরানে এসেছেন ইম্পাহান, তেহরান এবং মশহদ নিশ্চই দেখবেন, তারপর যে পয়সা খরচ করে মশহদ থেকে সমুদ্রতীরের বন্দর শহরে পৌঁছাবেন, সেই খরচে আপনারা লাহোর পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন। ভাবছিলাম আরও এগিয়ে গিয়ে যখন তাঁরা কয়েক হাজার মসজিদ আর কয়েক লক্ষ কবর উৎখাত করার কাহিনি শুনবেন তখন তাঁদের মনের অবস্থা কী দাঁড়াবে। তবে এটা নিশ্চিত যে তাঁরা একটা পরিষ্কার ধারণা নিয়ে দেশে ফিরবেন, সেটা নিন্দারও হতে পারে আবার প্রশংসারও। কোনো জীবিত জাতিকে উন্নতির পথে চলতে গেলে সমস্ত অন্তরায়কে ইরানের মতোই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হয়, এই ধারণাতে তাঁরা বিশ্বাসী হবেন, আর না হলে নিশ্চয়ই কেয়ামতের দিন সমাগত, এই বিশ্বাস নিয়ে ফিরবেন, কারণ ওদেশে ইসলামের প্রতি নিয়ত আঘাত আসছে। তবে আমাদের তিন জনেরই একটা কথা মনে হয়েছে যে আমাদের আরও আগে সাক্ষাৎ হলে ভালো হতো।

তেহরানে ফেরা

২১ সেপ্টেম্বর সূর্যাস্তের পর আমাদের মোটর রওনা হলো। তেহরানের জন্য ৫৭ রিয়াল (সাড়ে নটাকা) দিয়ে বিলেত (টিকিট) নিলাম। সাড়ে ছশো মাইল দীর্ঘ রাস্তার অনুপাতে ভাড়া এমন কিছু বেশি নয়। একটানা গাড়ি চলে রাত্রি দুটোর সময় এক জায়গায় থামল। আবার সকাল সাতটায় যাত্রা শুরু। পথে আবাদি বসতি পড়ল। এ জায়গাটা সাংগরতট থেকে ৬০০০ ফুট উঁচু, তাই ঠান্ডাও খুব। জনসংখ্যা পাঁচ হাজারের মতো। এর পর পৌঁছালাম যজদখাস্ত, এ জায়গাটা ৬৭৫০ ফুট উঁচু। বেশ প্রতিষ্ঠিত গ্রাম যজদখাস্ত। দেখে মনে হয় একসময় এখানকার অবস্থা খুবই ভালো ছিল, তবে এখন চাষবাসই সম্বল। গ্রামটির অবস্থান একটা ছোট পাহাড়ের ওপরে। পাহাড়টার কিছু অংশ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জল গড়িয়ে এমনভাবে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে, যে দূর থেকে দেখলে কোনো প্রাচীন ইमारতের ধ্বংসাবশেষ মনে হয়। গ্রামের নীচের দিকে ফসলের খেত, সেখানে নালার সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা আছে। রসুন জাতীয় কোনো ফসলের গাছ দেখলাম বাতাসে ঢেউ-এর মতো দুলছে। দেখতে বেশ ভালো লাগল।

সূর্য ডুবে অন্ধকার নামার মুখে আমরা ইম্পাহানে ঢুকলাম। হাজার হাজার বৈদ্যুতিক বাতির আলোতে শহর ঝলমল করছিল। সন্ধ্যা সাতটার সময় শহরের মধ্যে এসে গাড়ি থামল। চার রিয়াল দিয়ে একটা ঘর ভাড়া করলাম। ২৩ সেপ্টেম্বরটা আমার ইম্পাহানে থাকার ইচ্ছে ছিল কারণ যাবার পথে খুব তাড়াহুড়ো করে শহর দেখেছি। যে রাস্তার ওপরে আমার হোটেল, সে রাস্তার ওপরেই অনেক পরিবহন কোম্পানির অফিস। এখানে কয়েকটি ভারতীয় দোকানও আছে। তিজাবুখানা-সাহেব সিংহ, ভারতীয় দোকানের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। তেহরান এবং আরও অন্য শহরে এদের শাখা আছে। সেদিন এক শিখ তরুণ আমাকে বলল, বাদশাহ ইরানে হ্যাট পরা কেন চালু করেছেন জানেন? আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করায় বলল— বাদশাহ চান না, যে ইরানীরা নামাজ পড়ুক। প্রথমে কপালের কাছে কার্নিশের মতো বার করা গোল ক্যাপ পরার রেওয়াজ ছিল। মাথায় ঢাকনা দিয়ে নামাজ পাঠ করলে, খোদার দরবারে তা স্বীকৃতি পায় না, আবার নামাজ পাঠের সময় কপাল মাটিতে ছোঁয়া লাগা দরকার। ওই গোল টুপি পরে নামাজ পড়লে কপাল

মাটিতে ঠেকানো যায় না, টুপির কার্নিশ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিছু কিছু লোক এর একটা উপায়ও বের করে। নামাজের সময় টুপির ওই কার্নিশের দিকটাকে মাথার পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিত। তাতে টুপিও পরা থাকত আবার কপালও মাটিতে ঠেকত, বাদশাহ এই চালাকি ধরে ফেললেন এবং হ্যাট পরার আইন জারি করলেন। হ্যাটের তো চারদিকেই কার্নিশের মতো খানিকটা অংশ বেরিয়ে থাকে। শিখ তবুণের কথার সত্যতা কতটা ছিল জানি না তবে তার ব্যাখ্যাটি বেশ কৌতুকপ্রদ ছিল। শিখরা শূয়োরের মাংস খুব পছন্দ করে। আর ইরানের মতো মুসলমান দেশে তার নাম নেয়াও হারাম। এমন অবস্থায় কিভাবে তা মিলতে পারে? এর উত্তরও ওই তবুণের কাছেই পেলাম। বাড়িতে শূয়োর পালা বারণ। কিন্তু বুনো শূয়োরকে পালতে হয় না, আর বুনো শূয়োর ইরানে প্রচুর পাওয়া যায়। ইরানের নব্য তবুণেরা মহা উৎসাহে বুনো শূয়োরের মাংস খাচ্ছে। কেউ কোনো প্রশ্ন তুললে তারা স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইয়ে ছাপা, সাসানি বংশের সম্রাট খুসরো পরভেজের একটি শিকারের ছবি দেখিয়ে বলে যদি বুনো শূয়োর ইরানীদের কাছে নিষিদ্ধ হতো তাহলে খুসরো পরভেজ নিশ্চয়ই ওগুলোকে শিকার করতেন না আর সরকারও তাঁর শূকর শিকারের ছবি স্কুলপাঠ্য বইতে ছাপত না।

২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরের পর বেলা আড়াইটা নাগাদ আমাদের গাড়ি ছাড়ল। গাড়িটি বেশ নতুন এবং বসার গদিগুলো বেশ পরিষ্কার এবং আরামদায়ক ছিল। সব কিছু দেখে বেশ পুলকিত বোধ করলাম। ভাবলাম এবারকার ভ্রমণ বেশ উপভোগ্য হবে। কিন্তু রাত্রি বারোটার সময় একটা আওয়াজ করে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। শুনলাম গাড়ির কোনো বিশেষ কলকজা ভেঙে গেছে। সামনের বিশ্রাম ছাউনিটি ছিল সাত মাইল দূরে। আশপাশে কোনো গ্রামও নেই। দশবছর আগের ইরান সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু সহযাত্রীরা বলাবলি করছিল যে, তখন রাত্রিবেলা তো দূরের কথা দিনের বেলাতেও এই জনমানব শূন্য রাস্তায় পথ চলার অর্থ ছিল বিপদকে ডেকে আনা। আর এখন যে সময় আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন হলে আমাদের একজনও প্রাণে বাঁচত না। রাত্রিতে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছিল, ঠান্ডার মধ্যে ঘুমও আসে না। বসে বসে নিজের নিবুদ্বিতাকে গালাগাল দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। তেহরান থেকে ওভারকোটটা অন্তত না আনায় বোকামির দায় বহন করতে হলো। ড্রাইভার কলকজা ঠিক করে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো একটি যন্ত্রাংশ এমনভাবে ভেঙেছে যে তাকে না বদল করলে গাড়ি চলবে না। সহযাত্রীদের অধিকাংশই গাড়ি থেকে নেমে বাইরে গেলো, আমি ঠান্ডার প্রকোপে গাড়ির মধ্যেই বসে রইলাম। ড্রাইভার আশা দিলো যে এপথে অন্য কোনো গাড়ি এলে, তাতে আমাদের তুলে দেবে। কিন্তু সেই গাড়ি কখন আসবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। আজকের মধ্যেই তেহরান পৌঁছানো দরকার। অবশেষে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা আরম্ভ করলাম। গাড়ির যুবক ড্রাইভারও আমার সঙ্গে নিল। রাস্তায় যেতে যেতে অনেক পরিত্যক্ত বাড়ি ঘর দেখতে পেলাম। সন্দের ড্রাইভার বলল, মহাযুদ্ধের সময় সমস্ত ইরান ইংরেজ পলটনে ভর্তি ছিল, তখন এই বাড়িগুলোতে ভারতীয় সৈন্যরা থাকত। আর আমরা ইরানীরা তখন আমাদের নিজেদের দেশেই পরের মতো থাকতাম। এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গাতে যেতে হলে পুলিশ টোঁকি থেকে অনুমতি পত্র নিতে হতো। রাস্তায় চলায় জন্যে আমাদের ট্যাক্স দিতে হতো।

রাষ্ট্র হিসাবে ইরান বহুকাল ধরেই অপমানিত ছিল। ইরানের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী বলতে সামান্য কিছু কাজার বংশীয়, যারা তৎকালীন শাহর দারোয়ান গোছের ছিল। শাহ নিজের বিলাস-ব্যসনের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে কর ছাড়াও অ্যাংলো-পারসিয়ান তেল কোম্পানি থেকে ভালো টাকা রয়্যালটি পেতেন। সেই টাকাতে শাহ নিজেকে লক্ষ্যের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ বানিয়ে ফেলেছিলেন। ইউরোপ এবং এশিয়াতে ভোগের যা কিছু পুরানো এবং নতুন আবিষ্কৃত, তার সবটাই ভোগ করা শাহর জীবনের লক্ষ্য ছিল। যুদ্ধের সময় এবং তার পরও বেশ কয়েক বছর ইরানের মান মর্যাদা ধুলোয় গড়াগড়ি খেতো। যুদ্ধের আগে ইংলন্ড ও রুশের সাম্রাজ্যবাদীরা ইরানকে তিন ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। দক্ষিণ ভাগ ছিল ইংরেজদের অধীনে আর উত্তর ভাগ রুশদের অধীনে। মাঝখানের জায়গাটা তারা এজন্যই ছেড়ে রেখেছিল যাতে উত্তর আর দক্ষিণ ইরানের লোক সরাসরি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ না রাখতে পারে। ইরানের যখন এরকম হীন দশা, তখন একজন অস্বাভাবিক সৈনিক নিজের শক্তি এবং প্রভাব বাড়িয়ে চলেছিল। লোকে বলে রজা খাঁ একবার শাহর বিরোধিতাও করেছিলেন। তিনি বেশ কিছুদিন রাশিয়াতে থেকে সেখানকার সৈনিক সংগঠন সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। তারপর সময় হলে, তিনি দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে ইরানে ফিরলেন। ততদিনে ইরানবাসীদের চোখে তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে পৌঁছে গেছে। ধীরে ধীরে রজা খাঁ সৈন্যবাহিনীর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলেন। যেখানে অন্য শাহী পলটনদের মাইনে মাসের পর মাস বাকি পড়ে থাকত, তাদের উর্দি ছিল ছেঁড়া, ফাটা বিবর্ণ এবং পুরানো। সেখানে রজা খাঁর সৈন্যদল নিয়মিত উৎকৃষ্ট বেতন পেত, তাদের ইউনিফর্ম ছিল জমকালো এবং প্রভাবান্বিত। ১৯২১ সালে জেনারেল রজা খাঁ তেহরান অবরোধ করেন। পরবর্তী ঘটনা ইরানের ইতিহাস পর্যায়ে আগেই বর্ণিত হয়েছে।

সাড়ে নটার সময় কুম থেকে তেহরানগামী বাস পেলাম। আসবার সময় রাত্রি ছিল। আর এখন দিনের বেলা। কিছুদূর যাবার পর লবণাক্ত জলের কুম হ্রদটিকে দেখতে পেলাম। কুম হ্রদকে দেখলে কোনো সমুদ্র দেখছি বলে ভ্রম হয়। এত বিশাল এই হ্রদ। চারিদিকের সমস্ত পাহাড়ের জল গড়িয়ে এখানে জমা হয়। কিন্তু এই কুপণ হ্রদ এক গল্ফ জলও প্রসন্ন মনে কাউকে দিত না। সেজন্য আল্লাহ্‌ অভিশাপ দিয়ে তার জলকে লবণাক্ত করে দিয়েছে। এখানেও রাস্তার ধারে কয়েকটা পরিত্যক্ত বাড়ি রয়েছে তবে সংখ্যা বেশি নয়। সঙ্গীরা বলল, যখন মোটর গাড়ির চল হয়নি তখন লোকে হেঁটে কিংবা ঘোড়া অথবা উটের পিঠে চড়ে যাতায়াত করত। তখন ওই বাড়িগুলো তাদের বিশ্রামের জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হতো, লোকে রাত্রিবাস করত। এখন মোটর গাড়ির যুগে ওগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে এবং বিশ্রাম নেবার জায়গাগুলো অনেক দূরে দূরে হয়েছে। সেখানে চা এবং অন্যান্য হালকা খাবার দাবারও মেলে। ইরানীরা চায়ে চিনি ছাড়া আর কিছু মেশায় না। চিনি এখানে মহার্ঘ। বাইরে থেকে অনেক শুল্ক দিয়ে আনাতে হয়। যদিও ইরান সরকার এখন বিট থেকে চিনি তৈরির কারখানা খুলেছে। সরকারের নীতি হলো দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ দেয়া এবং তাকে সম্ভাব্য বিদেশি প্রতিযোগীর হাত থেকে রক্ষা করা। সেজন্য বিদেশি মালেষ ওপরে কড়া হারে শুল্ক ধার্য করা হয়। ইরান এই কাজে সোবিয়েট দেশের অনেক সহায়তা পেয়েছে, কারণ অন্য দেশের মতো বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিপ্রায় তার নেই। নিজেদের জন্য

কোনো বাজার দখল না করার সঙ্গে সঙ্গে সোবিয়টের অভিপ্রায় যে পৃথিবীর সর্বত্র বাজার সাম্রাজ্যবাদীদের দখল মুক্ত হোক। সেজন্যই তারা ইরান ও তুরস্কের মতো দেশগুলিকে শিল্পে স্বয়ম্ভর করার লক্ষ্যে সমস্ত রকমের সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তায় দুজায়গাতে চা খাবার জন্য গাড়ি থেমেছে এবং বিকেল তিনটের সময় তেহরান পৌঁছে গেলাম। খয়বান সড়কে মেহমান-খানা-সিরাজ বাজারখানিতে ৫ রিয়াল দৈনিক ভাড়ায় একটা ঘর নিলাম। ঘরটি বেশ বড়ো এবং আসবাবপত্রও যেমনটি প্রয়োজন তেমনই আছে, কিন্তু সিরাজের হোটেলের মতো এই হোটেল অত পরিষ্কার ছিল না। আমার ভিসার মেয়াদ এক মাস। কাজেই একমাসের মধ্যে আমাকে ইরান দেখে, ইরান ছেড়ে চলে যেতে হবে। ইরানে থাকার মেয়াদ আরও কদিন বাড়াব বলে ভাবলাম। পাসপোর্ট অফিসে গেলাম, তাঁরা বললেন যে ওই অর্জি পরেও জানানো যেতে পারে। কুক কোম্পানির অফিসে গিয়ে ৩০ ডলারের চেক ভাঙিয়ে ৫২০ রিয়াল নিয়ে ফিরলাম।

আমার তোলা ছবিগুলোর ফিল্ম ওয়াশ করতে দেবার জন্য এক ফোটোগ্রাফারের দোকানে গেলাম। দোকানদার যখন জানল যে আমি জাপান এবং রাশিয়া ঘুরে ইরানে এসেছি তখন তার কৌতূহল বেড়ে গেলো। দুটো দেশ সম্বন্ধে সে প্রচুর প্রশ্ন করল। তাকে বিশদভাবে বোঝাতে হলে যেরকম ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন তা আমার নেই, তখন সে পাশের দোকান থেকে এক দাঁতের ডাক্তার হামিদ খাঁকে ডেকে আনল। সকলের পরনেই ইওরোপীয় পোশাক, তাই পোশাক দেখে বোঝার কোনো উপায় ছিল না যে কে মুসলমান, আর কে খ্রিস্টান আর কে ইহুদি। পরে জানলাম ডাক্তার হামিদ খাঁ ইহুদি। তাঁর বাবা এবং ভাইও ডাক্তার। বাবা অনেকদিন প্যারিসে ছিলেন। ছেলেও ভালোই ফরাসি বলতে পারে। ওই সময় আমার হাতে একখানা ইরানী দৈনিক পত্রিকা ছিল। ফোটোগ্রাফারের দোকানে একজন তুর্কি ভদ্রলোকও বসে ছিলেন, তিনি তুর্কি দূতাবাসের কর্মী। তাঁর বয়স খুব বেশি হলে কুড়ি-একুশ হবে। আরবি অক্ষরে ইরানী পত্রিকা দেখে তিনি নাক সিটকালেন। আমি বললাম— কিছুকাল আগেও এই অক্ষরগুলোকে আপনাদের দেশেও মহান করে দেখা হতো। উত্তরে ভদ্রলোক বললেন— আমরা সেই নির্বুদ্ধিতা থেকে মুক্ত হয়েছি। আমরা এই নিষ্কর্মা লিপিকে আমাদের দেশ থেকে দূরদূর করে তড়িয়ে দিয়েছি। আমাদের তুর্কি ভাষা এখন রোমান লিপিতে লেখা হয়। ইরানি ফোটোগ্রাফারটি বলল — কিছুদিন সবুর করুন। আমাদের শাহান শাহ পছন্দীও সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, তখন আমরাও এই নিষ্কর্মা ভাষার হাত থেকে মুক্তি পাব।

আমি বললাম, আপনারা আপনাদের নিজেদের দেশের বর্ণমালা বাতিল করে তার জায়গাতে উপযুক্ত মনে করে একটা বিদেশি বর্ণমালা নিয়ে এসেছেন। আমাদের দেশ ভারতে, বহুকাল থেকে একটা লিপি চলে আসছে যার অনেক ভাগ রোমান লিপির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম আসার পর আপনাদের মতো আমাদের দেশেও আরবি লিপি এসেছে এবং শূনে অবাধ হবেন, বহুলোক ওই আরবি লিপিকে আপনাদের ফারসি লিপি বলে জানে। আর তাকে রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলমানরা আসমান-জমিন এক করে ফেলছে। তাদের বক্তব্য, ইসলামের জন্য নাকি ওই লিপির প্রয়োজন, ওটা তাদের ধর্মীয় লিপি।

পাশে বসা ইরানী তরুণ উত্তেজিত হয়ে বলল — আপনাদের দেশের তরুণ সমাজ এরকম

ধর্মকে তাহলে দূর করে দিচ্ছে না কেন?

আমি হেসে বললাম — আপনি যাকে দূর করে দিতে বলছেন, সেই কাজ কী আপনারাও করতে পারতেন। যদি না আপনারা স্বাধীন জাতি হতেন এবং রাজশাহ পহ্লবীর মতো দেশের শাসক না পেতেন?

তুর্কি তরুণটি তো শুন্যেই অবাক, যে তুর্কি টুপিকে তাদের দেশ থেকে বহুকাল আগেই বিদায় দেওয়া হয়েছে তাকে এখনও ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ধরে রেখেছে। কিছুক্ষণ এধরনের আড্ডার পর ডাক্তার হামিদ আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাঁর বাড়িতে, তাঁর বাবা, ভাই, স্ত্রী এবং বিমাতার সঙ্গে পরিচয় হলো। পরে তাঁর আগ্রহ হলো যে আমি তাঁদের বাড়িতে, তাঁদের সঙ্গে বসে আহার করি। খাদ্যবস্তুর মধ্যে ছিল পাতলা চাপাটি, ভাত আর ক্বিনা মসলায় রাঁধা দুধার মাংস। সঙ্গে ছিল একটা রেকাবিতে পুদিনা পাতার মতো দেখতে একধরনের পাতা ও কয়েক টুকরো পেঁয়াজ। খাবার দাবারে আমি খুব মসলা প্রেমী নই, তার ওপরে সাড়ে তিনমাস জাপানে থেকে, সেখানকার লোকের খাদ্যবস্তুতে মসলা বয়কট করতে দেখে আমিও মসলার স্বাদ প্রায় ভুলেই গিয়েছি। রান্নায় লংকা, মসলা ইত্যাদির আধিক্য ঘটলে, গলা দিয়ে তা নামতেই চায় না। সকলের শেষে রেকাবি ভর্তি করে আঙুর এল। আঙুর মিষ্টি ছিল, তবে ওই মুহূর্তে তাকে খুব উঁচুদরের কিছু মনে হয়নি, কারণ এর আগে আমি সিরাজের আঙুর খেয়েছি এবং মন এখনও সেই আঙুরেই আশ্রিত হয়ে আছে। সিরাজে আঙুরের চেয়ে বুটির দাম বেশি, তাই সেখানে আঙুরের কোনো মর্যাদা নেই। সিরাজে আমি দেখেছি যে রাস্তায় পাথর ভাঙা মজুরেরা দুটো মোটা বুটির মধ্যখানে আধসেরটাক আঙুর রেখে দুপুরের খাওয়া সারছে। আমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করতাম, তাহলে তারা হয়তো বলত — কী করব আগা সাহেব, এই শুকনো বুটি দুটোকে এই নিষ্কর্মা আঙুর দিয়ে কোনোমতে গিলছি। ডাক্তার আহমদ আমার নাম জানতে চাওয়ায়, আমি ইংরেজিতে ছাপা আমার নামের কার্ড দিলাম। কার্ড দেখে প্রসন্নচিত্তে তিনি বললেন — আপনার নাম রাহুলা ? খুব ভালো নাম। আমার কখনওই মনে হয়নি যে আমার রাহুলা (Rahula) নাম কখনও রাহুল্লা (Ruhulla) হয়ে যেতে পারে। নাম বোঝাতে গিয়ে আমার প্রাণান্তকর অবস্থা কারণ রাহুলা শব্দের কোনো অর্থ ইরানী ভাষাতে নেই। তবে ডাঃ আহমদই আমার কাজ সহজ করে দিলেন। তিনি আমাকে বললেন, রাহুলা (আল্লাহর আত্মা) আমিও শির তসলিম করে তা স্বীকার করে নিলাম। তিনি তো আর জানেন না যে এই হজরত রাহুল্লা আল্লাহ (ঈশ্বর) এবং বুহ (আত্মা) এই দুই বিষয় থেকেই বহুদূরে বাস করে। ডাঃ আহমদের সঙ্গে পরামর্শ হলো যে আজ সন্ধ্যায় নুমায়শী-মর্কজীতে (কেন্দ্রীয় নাট্যালয়) গিয়ে ইরানী নাটক দেখব। যথা সময়ে আমরা দুজন সেখানে পৌঁছালাম। যদিও আজ কোনো ছুটির দিন নয় তবুও ভিড় যা হয়েছিল, বলার মতো নয়। অনেক কষ্টে পাঁচ রিয়াল দিয়ে দুটো দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিট কাটা হলো। দ্বিতীয় শ্রেণিতে তবু কোনোক্রমে বসার জায়গা পেলাম। তৃতীয় শ্রেণিতে দেখলাম বহুলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নাটক দেখছে।

প্রায় দুহাজার দর্শক ছিল আর তার মধ্যে চল্লিশ শতাংশ মহিলা। তাঁদের অনেকের মাথাতেই কালো ওড়না, কিন্তু মুখ খোলা। তাদের বসার জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই। তাঁরাও পুরুষের পাশে বসেই নাটক দেখছিল। রঙ্গমঞ্চটি মুক্ত আকাশের নীচে, শুধু যেখানে নাটক অভিনীত হয়,

সেই স্টেজের ওপরে খানিকটা ছাদ আছে। আমার ইচ্ছে ছিল কোনো ঐতিহাসিক নাটক দেখার। কিছুদিন আগে ‘কোরোশ বুজুর্গ’ নামে একটি ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আজকের নাটকের নাম ‘মেহরে-গিয়াহ’ (প্রেমবুটি)। নাটকের কুশীলবদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ছিল। নাটকের সঙ্গে ইওরোপীয়ান নাচ ও বাজনা ছিল। প্রথম নাটকটির ঘটনা ছিল আধুনিক স্ত্রীর বায়নাঙ্কাকে কেন্দ্র করে। ফাসনেবল স্ত্রীর আবদার পূরণ করতে বেচারী স্বামীর কী করুণ অবস্থা, নাটকে সেটাই দেখানো হলো।

দ্বিতীয় অংকে দেখানো হলো যে বিবিসাহেবা হলো বয়ে বশীকরণ বড়ি খুঁজছেন। অবশেষে এক ফালগিরের (জ্যোতিষী) কাছ থেকে বিষ বটিকা সংগ্রহ করেন। বটিকার প্রয়োগে বিবি সাহেবার স্বামী পাগল হয়ে যায়। নায়িকার চরিত্রে লোরিতা নামের এক আর্মেনিয়ান সুন্দরী চমৎকার অভিনয় করেছিল। কিন্তু দর্শকদের সহানুভূতি ওই পাগল স্বামীর প্রতি ছিল। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে অন্য একটি নাটক শুরু হলো। নাটকের নামটা মনে পড়ছে না। একজন স্ত্রীলোক তার উপপতির সঙ্গে ধরা পড়ে। স্বামীর বকাবকিতে, উপপতি তাকে বোঝায়, এবং বলে — মিএগ দুনিয়ায় এটাই দস্তুর। তারপর দুজনে পরামর্শ করে মড়ার মতো পড়ে থাকে। দুজনকেই মৃত ভেবে স্ত্রী তৃতীয় এক প্রেমিককে ডেকে আনে এবং সেই দৃশ্য দেখে দুই মৃত ব্যক্তিই উঠে দাঁড়ায়।

দুটো নাটকেই মেয়েদের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা প্রদর্শিত হয়েছিল। বহু শতাব্দীর কঠোর কারাবাসের পর আজ যখন ইরানের নারী সমাজ খানিকটা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, তখন এই ধরনের নাটককে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে ভালো বলা যায় না। জানি না, কেন সরকার এখনও এধরনের নারী বিদ্বেষী নাটকের অভিনয় হতে দিচ্ছে।

মশহদে

২৮ সেপ্টেম্বর সকালে মশহদে যাবার অনুমতি পত্র জাবাজ নিয়ে এলাম। সন্ধ্যাবেলা ৩৬ রিয়াল দিয়ে মশহদের টিকিট কাটাও হয়ে গেলো। রাত্রি সাড়ে আটটায় গাড়ি ছাড়ল, যদিও ড্রাইভারের পাশে বসার জায়গা পেয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে না ছিল কোনো হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা আর না ছিল সামনের দিকে পা রাখার সঠিক জায়গা। রাত্রি দুটো পর্যন্ত একটানা গাড়ি চলে জাবুন গ্রামে বিশ্রামের জন্য থামল। মুসাফির খানার মেঝেতে বিছানা পেতে ঘুমোবার জায়গা পেলাম। দ্বিতীয় দিন (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে প্রাতরাশের পর আবার যাত্রা শুরু। এবারকার রাস্তা চড়াইয়ের। গাড়ির একটানা যান্ত্রিক শব্দ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। বড়ো একটা পাহাড়ি জোত পার হয়ে, খানিকটা উতরাই নেমে সাড়ে আটটার সময় এলাম ফিরোজকুল বসতিতে। বসতিটি ভালোই। রাস্তার ধারে কয়েকটি দোকান আছে। খরমুজ আর আঙুর ফেরিওলারা হেঁকে হেঁকে বিক্রি করছে। মাইকদার (মদের দোকান) সাইনবোর্ডটি বেশ উজ্জ্বল রঙে লেখা। মদ্যপান ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী হওয়ায় আগে ইরানে মদ খাওয়ার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি ছিল। যদিও এর অর্থ এই নয় যে তখন কেউ মদ খেত না। খেত, তবে লুকিয়ে। এখন সরকারি তরফ থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। গ্রামের গা ঘেঁসে ছোট একটা নদী বয়ে গেছে। সেই নদীর ঘাটটি লোকের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সারার জায়গাতে পরিণত হয়েছে, দেখে মনে হলো যে এই সব বিষয়ে ইরান আমাদের দেশের যোগ্য সঙ্গী। এখানকার দোকানদারদের অধিকাংশই আর্মেনিয়ান।

খাওয়া দাওয়ার পর আবার চলা শুরু হলো। চারদিকে প্রকৃতিতে একটা রুক্ষতার ভাব। শুধু এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে কিছু ছোট ছোট দেবদারু গাছ দেখতে পেলাম। আমার মনে হলো আমি যেন তিব্বতের কোনো অঞ্চলে রয়েছি। সেই নগ্ন ছোট ছোট পাহাড়, সেই নির্জন বিস্তীর্ণ প্রান্তরভূমি, সেই ভেড়ার পাল। এখানকার সমস্ত ভেড়াই দুধা জাতীয়। মেষ পালকদের মাথায় ক্যাপ ধরনের গোলটুপি কপালের কাছে রোদ আটকাবার জন্য খানিকটা বের করা। এই টুপিই বলে দিল যে সমস্ত ইরানই প্রায়, শাহ পহ্লবীর আদেশ শিরোধার্য করে নিয়েছে। তিব্বতের মতো এখানকার পাহাড়ি গ্রামগুলোতে সফেদা আর বিরি গাছ দেখলাম। আমাদের বাসে এক বৃদ্ধ কৃষক যাত্রী ছিলেন। তাঁকে বয়স জিজ্ঞেস করায় বললেন-‘চহল-বো-পঞ্জাহ’ (৪০+৫০=৯০), কেউ যদি তা থেকে এক বছরও কমায় বৃদ্ধ রেগে যাচ্ছিলেন। এক বিঘত দীর্ঘ দাড়ির সবটাই সাদা নয়, কিছুটা ধূসর, আর ভালো করে খুঁজলে দু-একটা কালো রঙের দাড়িও পাওয়া যেতে পারে। শরীর লম্বা চওড়া এবং এবয়সেও যথেষ্ট শক্ত পোক্ত। চেহারার মধ্যে একটা গ্রাম্য সরলতার ভাব। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হলো যে বৃদ্ধ কোনো অবস্থাতেই তাঁর মাথার হ্যাট খুলবেন না। ওই নব্বই বছরের বৃদ্ধের জেদ দেখে আমার প্রত্যয় হয়ে গেলো যে ইরানে হাওয়ার গতি কোন দিকে। চলতে চলতে আমাদের সামনে বসনম-এর জোত এল। এটার অবস্থান এত উঁচুতে যে শীতের দিনে এখানে প্রচণ্ড তুষারপাত হয়, এবং কখনও কখনও এক সপ্তাহ, দুসপ্তাহ ধরে রাস্তা বন্ধ থাকে।

দুপুরে শেমরান পৌঁছলাম। এখান থেকে খোরাসান প্রদেশ আরম্ভ হচ্ছে। শেমরানের অবস্থান একটা বড়ো সমতল ভূমিতে। এর উচ্চতা ৪০০০ ফুট। বসতি খুব বড়ো এবং ঘন নয়। এখানেও বিদ্যুতের সংযোগ আছে। ইরানে পেট্রল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেজন্য দেশের মধ্যে এর মূল্য খুবই কম। আবার বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কাজে লাগে এরকম বিদেশি যন্ত্রপাতির ওপরে যথেষ্ট শুল্ক ছাড় দেওয়া আছে। যার ফলে দেশের ছোট ছোট বসতিতেও কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। শেমরানে তেলের জন্য কুয়ো খোঁড়ার কাজ চলছে। যদি তেল পাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে এখানে হয়তো বিশাল শহর গড়ে উঠবে। শেমরানের জামা মসজিদটি অনেক পুরানো। আমির অজল বখ্তিয়ার ১৮৬৭ সালে এটি তৈরি করেছিলেন।

ভারতবর্ষে যেমন বারাণসী, ইরানে তেমনই মশহদ। শিয়া সম্প্রদায়ের বারোজন ইমামের একজন ইমাম রজা এখানেই অত্যাচারীদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর সমাধি থাকার জন্য মশহদকে (শহীদ হবার স্থান) এত পবিত্র জ্ঞান করা হয়। আমার বাসের সহযাত্রীদের অধিকাংশই স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে, এই তীর্থের মাজার জিয়ারতের জন্য যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যেই তারা ইমাম রজার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে দুজন মোল্লা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অত খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ ছিল না কিন্তু আর একজন সমস্ত বিষয়েই অত্যন্ত সচেতন থাকতেন। তিনি নামাজের সময়ে অত্যন্ত কঠোরতার ভান করতেন। দুপুর বেলা, হয়তো চা খাওয়ার জন্য গাড়ি কয়েক মিনিটের জন্য দাঁড়িয়েছে, ঠিক গাড়ি ছাড়ার আগের মুহূর্তে তাঁর মনে হল নামাজের সময়। তিনি হাত মুখ ধুয়ে তার জন্য তৈরি হলেন। বাধ্য হয়ে ড্রাইভারকে আরও খানিকক্ষণ গাড়ি দাঁড় করাতে হলো। গাড়ি চলার শুরু থেকেই তিনি এরকম করছেন। সেদিন বিরক্ত হয়ে ড্রাইভার

তাকে বলল — খবরদার নামাজ টামাজের নাম করে গাড়ি দাঁড় করাবেন না, নয়তো আপনাকে রেখেই গাড়ি নিয়ে চলে যাব। গাড়ি যতক্ষণ সকলের জন্য থামবে, তার মধ্যেই ওসব সারতে পারলে সারবেন নচেৎ নয়। বেচারা মোল্লা সাহেব করুণ চোখে সহযাত্রীদের দিকে চাইলেও কেউ কিন্তু তাঁর পক্ষ নিয়ে ড্রাইভারকে একটি কথাও বলল না। সকলেরই তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর তাড়া ছিল। মনে মনে মোল্লা সাহেব নিশ্চয়ই সকলকে অভিসম্পাত করছিলেন। বিশেষ করে ড্রাইভারকে, যার খোদার প্রতিও ভয় নেই। তবে বাস থামিয়ে নামাজ পাঠের প্রবণতা তাঁর আর দেখা যায়নি। আমার সহানুভূতি ওই ধর্মভীরু মোল্লার প্রতি ছিল। গাড়ি নিয়ম করে চা খাওয়ার জন্য, কিংবা দুপুরের খাবারের জন্য থামত। কিন্তু নামাজের জন্য নয়। পাঠক ধরে নিতে পারেন যে রাত্রি দুটো থেকে ভোর পর্যন্ত আল্লা মিঞারও শোয়ার সময়। তখন তো ফেরেস্তাদেরও অন্তপুরে আসা বারণ থাকে, তাহলে বেচারা মোল্লা সাহেব কী করবেন। ড্রাইভারের ধমকে তিনি বাসের সিটে বসেই নাককান ছুঁয়ে কোনোমতে নামাজ পাঠের চেষ্টা করতেন। চলন্ত গাড়িতে তো আর মাটিতে কপাল ঠেকানো যায় না কাজেই ওটা বাদ দিয়েই তাঁকে যা কিছু করার করতে হতো। অন্য যাত্রীদের এনিয়ে কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। তারা তো এ ব্যাপারটাকে হাসাহাসির পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই দুজন মোল্লা, ওই গৌফ দাড়ি কামানো, হ্যাট পরা ড্রাইভারকে অবশ্যই শয়তানের অবতার ভেবেছে, আর আমি নামাজও পড়ি না আবার সহযাত্রীদের ‘আল্লাহো আকবর’ ধ্বনির সঙ্গে গলাও মেলাই না। তাই আমার অবস্থান নিয়ে তাঁরা দুজনেই যথেষ্ট ধ্বংস রয়েছেন বলে মনে হলে। বয়স্ক মোল্লাটি আমাকে জিজ্ঞেসও করলেন — আপনি কি জরথুষ্ট্রিয়ান? আমি হ্যাঁ, বলে দিলাম। মনে হলো যদি বৌদ্ধ বলি, তাহলে সেটা কী বস্তু বোঝাতে বোঝাতে মশহদ পার হয়ে যাবে। তার চেয়ে হ্যাঁ বলাই ভালো, প্রকৃতপক্ষে আর্য ধর্মের বিচারে বৌদ্ধ আর জরথুষ্ট্র দুজনে ধর্মভাই।

রাত্রি দুটোর সময় শাহরুদ পৌঁছলাম। এখানেই বাকি রাতটা বিশ্রাম নেয়া হবে। শাহরুদ একটা গঞ্জ ধরনের জায়গা। অনেক রকমের দোকানপাট আছে। মোটর গ্যারাজের কাছেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। এখানে এরকমই নিয়ম যে গ্যারাজের মালিকেরাই যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। তাছাড়া গাড়িতে যদি কোনো মেরামতির প্রয়োজন থাকে সেগুলো দেখাও তাদের দায়িত্ব। থাকার জায়গার ভাড়া খুবই সামান্য। পথে এধরনের গ্যারাজ ও তার সঙ্গে লাগোয়া মুসাফির খানা থাকার ফলে যাত্রীদের খুব সুবিধা হয়েছে।

৩০ সেপ্টেম্বর আবার সকালে যাত্রা শুরু। রাস্তা জনহীন এক পার্বত্য মালভূমির ওপর দিয়ে গেছে। দূর থেকে ময়দানের মধ্যে একটা কেলা দেখতে পেলাম। ওর নাম মিয়ান-দস্ত অর্থাৎ কান্তার মধ্য। কেলাটি শাহ আব্বাসের আমলে তৈরি হয়েছিল। আরও খানিক এগিয়ে অব্বাসাবাদ গ্রাম, এটিও বেশ বর্ধিক্ষু গ্রাম। দূরপাল্লার যাত্রী ও বাসের জন্য এখানেও রাস্তার ধারে গ্যারেজ আছে। গ্যারাজ সংলগ্ন মুসাফির খানার মেঝেতে চাটাই বিছানো রয়েছে। এখানে দুপুরে খাওয়া সারলাম। ভাত, হাতির কানের আকারের বড়ো বড়ো বুটি, কাবাব, পেরঁজ কুচির সঙ্গে সেই পুদিনা পাতার মতো পাতা। কাবাবের নাম শুনে কেউ যেন একে আমাদের দেশের কাবাবের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলেন। হোটেলের খাবারের তালিকায় কাবাবের উল্লেখ দেখে আমিও লাফিয়ে

উঠেছিলাম। এই ভেবে যে, অনেকদিন পর কাবাব আশ্বাদন করা যাবে। কিন্তু যখন ওটি প্লেটে করে পরিবেশিত হলো, তখন দেখলাম মাংসের কয়েকটা টুকরোকে ভারি কিছু দিয়ে খেঁতলিয়ে তাওয়ায় রেখে খানিকটা আগুনেরও ছোঁয়া তাতে দেওয়া হয়েছে। নুন ছাড়া আর কোনো কিছু তাতে দেওয়া নেই। আমার সহযাত্রী এক ভারতীয় মুসলমান তীর্থযাত্রী তো সাথেদে বলেই ফেললেন যে— খানা আর গানা, হিন্দুস্থানেই যথার্থ পাওয়া যায়। গানের নামে ইরানীরা অযথা গলা ফাটায়, আর রান্নায় মশলার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। গানের বিষয়ে আমি সহযাত্রী বন্ধুর সঙ্গে সহমত ছিলাম। সত্যি, যখন কোনো ফারসি গজল অথবা গীতকে সুন্দর করে কোনো হিন্দুস্থানি গায়ক বা গায়িকাকে গাইতে শুনতাম, তখন ভাবতাম, অন্য দেশের গাইয়েরাই যদি ওই গান এত ভালো গায়, তাহলে এগুলো যাদের নিজস্ব, সেই ইরানে না জানি কত সুন্দর করে গাওয়া হয়। কিন্তু এখানে এসে বিপরীত অভিজ্ঞতাই হয়েছে। তবে খাওয়ার ব্যাপারে অত মশলাভক্ত আমি নই। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে কোনো মশলার নামোল্লেখ না দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে এই সুস্বাদু বস্তুটি মুসলমানদের হাত ধরেই আমাদের দেশে এসেছে, আর এটাও মানতে হবে যে, মশলাদার মাংস রান্নার কথা উঠলেই মুসলমান বাবুর্চির মুখ মনে পড়ে। মশলার আবিষ্কার কিন্তু ভারতে, যদিও প্রাক মুসলমান যুগে এর ব্যবহার ছিল না। ইরানী গাইড বইয়ে লেখা দেখেছিলাম যে আব্বাসাবাদে পাখির মাংশ খুব সস্তা। কিন্তু ঘটনা যা দেখলাম তাতে মনে হলো বিদেশি ভ্রমণার্থীদের পকেট কাটার জন্য আব্বাসাবাদীদের গুটা একটা রটনা।

রাশিয়া থেকে ফেরার সময় আমি কতকগুলো বিষয় লক্ষ করেছি, পথে ঘাটেও দেখেছি, যেগুলোকে একান্তভাবে এশীয় বলা যায়। ককেসাস থেকে এশিয়া শুরু। এখান থেকে আরম্ভ হয়, তাওয়ায় সেকাঁ বুটি, ভারতীয় ধরনের জুতো আর মেয়েদের পরনে ঘাগরা জাতীয় পোশাক। কিন্তু ওই খানা আর গানার মধ্যে বেসুরো বেজেই চলে যতক্ষণ না আমরা বোলান গিরিপথ পার হই।

খাওয়া দাওয়ার পর আবার চলা। রাত্রি নটায় পৌঁছালাম সবজবার। এখানকার উচ্চতা ৩১১৫ ফুট। জনসংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর কিছু ইমারত রয়েছে। শহরের রাজপথটি বেশ প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন। যে গ্যারাজে আমাদের বাস দাঁড়াল, তাদের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র আছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বড়ো ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। গ্যারাজের প্রধান গেটের কাছেই তাদের নিজস্ব ভোজনালয়। ভোজনালয়টি খাদ্যের গুণমান, দামের স্বল্পতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যবস্থাপনার দিক থেকে অত্যন্ত উচ্চমানের। আমার খাওয়ার খরচ পড়ল পাঁচ আনা। মার্বেল পাথরের টেবিলে, ইওরোপীয়ান কায়দায় খাদ্য পরিবেশিত হয়েছিল। ঘর এবং বিছানার ব্যবস্থা দেখে ওখানেই রাত কাটাতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু ডাইভার রাজি হলো না। চোখের পাতায় কয়েক মন ওজনের ঘুম নিয়ে আমরা আবার রওনা হলাম। যখন আমরা নৈশাপুর (উচ্চতা ৩৯১৭ ফুট, জনসংখ্যা ১২ হাজার) পৌঁছালাম তখন ঘড়িতে ভোর সাড়ে চারটা। তখন আর ঘুমোতে যাবার কোনো মানে হয় না। রাস্তার এক ধারে বাস দাঁড়াল। আমি বাসে বসে বসেই খানিক ঝিমিয়ে নিলাম। শহরের দক্ষিণ পূর্বে দুমাইল দূরে ওমর খৈয়ামের সমাধি। সাকি আর সরাবেবের একান্ত প্রেমিক এই কবির মধুশালাটিকে দেখার ইচ্ছে ছিল। ওমর

খৈয়ামের জন্য ইরানীরা খুব গর্ববোধ করে। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি বিরাট স্মারক নির্মাণের কাজ চলছে। সূর্য উঠতে না উঠতেই ডাইভার 'চলো, চলো' বলে তাড়া দিতে আরম্ভ করল। ওমর খৈয়ামের সমাধি দেখতে না পাওয়ার দুঃখ মনে নিয়েই আবার রওনা হলাম। ইরানে এক শহর থেকে আরেক শহরে মোটর বাসে যাতায়াত করাটা খুব সস্তা হয়। কিন্তু মাঝ পথে যদি কোনো দর্শনীয় স্থান থাকে, গাড়ি তার জন্য দাঁড়ায় না, ভ্রমণার্থীদের কোনো বিশেষ স্থান দেখার স্বাধীনতা থাকে না। ভ্রমণ আরামপ্রদ এবং কম খরচে হয় যদি চারজনের একটি দল থাকে, এবং ইরানে ঢুকেই দৈনিক ভাড়ায় ট্যাক্সি নিয়ে নেয়া যায়। আরও ভালো হয় নিজস্ব গাড়ি নিয়ে বালুচিস্তানের পথে এখানে এলে। সীমান্ত থেকেই একজন দোভাষীকে সঙ্গে রাখলে সমস্ত পথে ভাষা সমস্যাও থাকে না। আমাদের ভাই বন্ধুরা যে সমস্ত আনন্দ উপভোগের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ইওরোপে যান, সেই সব আনন্দই আমাদের প্রতিবেশী দেশ ইরানে অনেক কম খরচেই পাওয়া যাবে। যদি কোনো বিবেচক ভারতীয় মুসলমান একমাস ইরানে বেড়িয়ে আসে তাহলে সে অবশ্যই ভারতীয় হয়ে ফিরবে, আর যদি কোনো হিন্দু ওদেশে যায়, তাহলে সে তার অনেক সংকীর্ণতাকে দুজদারের মরুভূমিতে রেখে বোলান গিরিপথে ঢুকবে।

আমি ডাইভারকে কিছু টাকাও দিতে চেয়েছিলাম যাতে সে অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য ওমর খৈয়ামের সমাধিটি দেখার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু ডাইভারের পাষণ্ড হৃদয় গেলেনি। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম, যে অন্তত সাকি আর সরাবের সমাবাদার কবির দেশে পদার্পণ তো অন্তত করেছে। যে মাটিতে ওমর খৈয়ামের জন্ম, সেই মাটিতেই জন্মানো একটা খরমুজ খেলাম। এজন্মে তো আশা নেই, ইচ্ছেও নেই, তবে এই খরমুজের দৌলতে যদি পরজন্মে অন্তত ছোটোখাটো এক ওমর খৈয়াম হয়ে জন্মাতে পারি। হাফিজ আর সাদীর জন্মস্থানের মতো নৈশাপুরও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত। তিব্বতের উজাড় পাহাড়ি অঞ্চলেও একদল কোকিলকে বাসা বাঁধতে দেখেছিলাম। হয়তো কবিরাজ হলো ওরকমই।

সকাল দশটার সময় চা খাওয়ার জন্য এক গ্রামে গাড়ি দাঁড়ালো। সেখানে দুই পারসি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁরা নিজেদের ব্যবসায়িক কাজে ইরানে এসেছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তো ইরান সম্বন্ধে আশাই ছেড়ে দিয়েছেন। মিথ্যে কথা বলা, লোক ঠকানো, জালিয়াতি ইত্যাদি যত দুর্গুণ আছে সবই তিনি ইরানীদের মধ্যে দেখতে পান, সেজন্য নিজেকে হিন্দুস্থানি বলে পরিচয় দিতেই পছন্দ করেন। দশ বছর আগের ইরান যারা দেখেনি, অথচ বর্তমান ইরানকে দেখেছে, তাদের এরকম ধারণা হতেই পারে। কিন্তু দশ বছর আগের অবস্থা তো আরও শোচনীয় ছিল, আর রাতারাতি সমস্ত মানুষের হৃদয় পরিবর্তিত হয় না। তবুও এটা ভোলা উচিত নয়, যে এরা সেই ইরানী জাতিরই বংশধর যারা শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক সত্যতা (পিন্দার-নেক, গুফতার-নেক, করদার-নেক) পালনের অঙ্গীকারকে জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও কঠোরভাবে প্রয়োগ করত। গ্রিকরা ইরানীদের কটর শত্রু ছিল, কিন্তু তারাও স্বীকার করেছে যে ইরানীরা মিথ্যাভাষণ জানে না। ওরকম অনেক সদগুণ তাদের মধ্যে ছিল, তাই মনে হয় আজকের দুর্গুণগুলোও তাদের জীবনে স্বাভাবিক নয়, আরোপিত। আমার তো মনে হয় এই অধঃপতন আরম্ভ হয়েছে সেদিন থেকে, যেদিন থেকে ইরানীরা আরবদের কাছে তাদের স্বাধীনতা খুইয়েছে। যদি কোনো উচ্চ সভ্যতা ও

সংস্কৃতির ধারক বাহক জাতিকে বাধ্য করা হয়, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে, তাহলে সেই জাতির জীবনে এরকম অধঃপতন অনিবার্য। ইরানী সভ্যতা যখন এক উচ্চস্তরে অবস্থান করছিল, সেই সময় অসভ্য আরবেরা তলোয়ারের জোরে, আর স্বর্গের অঙ্গরার লোভে গড়ে ওঠা একেবারে শক্তিতে ইরানকে পরাজিত করেছিল। ইরান যদি শুধুমাত্র পরাধীন হতো, তার জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন না হতো, তাহলে হয়তো তার সাদাচারের পরম্পরা আজও বজায় থাকত। একথা মনে রাখা দরকার, যে কোনো জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি দু-এক বছরে গড়ে ওঠে না, শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগে যায় তার বিকাশে। কিন্তু ইরানকে বাধ্য করা হয়েছে, তার উন্নত সংস্কৃতি ত্যাগ করে অনুন্নত আরবি সংস্কৃতির ধাঁচে গড়ে উঠতে। যদিও ইরানীরা আরবিদের আল্লাহর ফারসি রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তা কখনওই অর্হুর্মজদার বিকল্প হয়ে ওঠেনি। অর্হুর্মজদা থেকে বিশ্বাস তুলে নিতে যাদের বাধ্য করা হয়েছিল, তারাও তাদের বিশ্বাসকে ষোলোআনা আল্লাহর প্রতি অর্পণ করেনি। সপ্তম শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, ইরানী বিচারকদের বিশ্লেষণগুলিকে যদি অনুধাবন করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে প্রথম এক শতাব্দী বাদ দিলে, ইরানী বুদ্ধিবৃত্তি সব সময় চেষ্টা করেছে আরবি অধীনতা থেকে মুক্ত হতে। ওমর খৈয়াম, সমসতবরিজ, বুমী, হাফিজ, ফিরদৌসী সকলেই সেই বিদ্রোহের সেনাপতি। যদি ইরানের শেষ বাদশাহর কন্যার সঙ্গে ইসলাম সংস্থাপকের দৌহিত্রের বিয়ে না হতো, আর এভাবে যদি আলির বংশধরদের শরীরে ইরানী রক্তের দেখা না মিলত তাহলে হয়তো বিদ্রোহ আরও ভয়ানক কোনো রূপ নিত। ইরানীদের মানসিক পতন সম্বন্ধে আমি আমার এক জাপানি বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলাম। আমি তাঁকে উদাহরণ দেখিয়ে বলেছি যে ১৮৬৭ সালের পর জাপান যেভাবে পশ্চিমী জীবনধারাকে তাদের জীবনে গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন যদি সামান্যতম বাধা না রেখে, অঙ্কের মতো তাদের ভালো মন্দ সবই গ্রহণ করত, উপরাজ শোতকু থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসা জাপানি সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলত, তাহলে কি তারা বুশিদো (জাপানি ক্ষত্র ধর্ম)—যার জোরে একজন জাপানি দেশ ও নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য নির্ভয়ে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতে পারে—প্রতিষ্ঠা করতে পারত।

বৃদ্ধ পারসি ভদ্রলোকের তবুগ সঙ্গী অবশ্য এতটা হতাশ নন। তার মধ্যে জরথুষ্ট্র ও দারয়োশের প্রতি ভক্তিভাবও ছিল আবার নির্দিষ্টায় একথাও স্বীকার করত যে শাহ পহলবীর আমলে ইরানে অনেক সংস্কার হয়েছে। সে তো শাহর প্রশংসায় যাকে বলে পঞ্চমুখ। তার বক্তব্য, যদি শাহ তাঁর মতো আরও কয়েকজনকে পেতেন, তাহলে দেশ কোথা থেকে কোথায় চলে যেত। তবে কাম্পিয়ান সাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত যে রেললাইনের কাজ আরম্ভ হয়েছে তাতে যুবকটিকে বেশ অখুশি মনে হলো। আমিও ও বিষয়ে তার সঙ্গে একমত। এই দীর্ঘ রেললাইন উত্তর ও দক্ষিণ ইরানের সংযোগ ঘটাবে। এজন্য অসংখ্য পাহাড় কাটতে হবে, সুরঙ্গ খুঁড়তে হবে, এবং ব্রিজ তৈরি করতে হবে। এই খাতে যে খরচ ধরা হয়েছে, প্রকৃত খরচ তার চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বেশি হবে। ইরানের জনবসতি খুব কাছাকাছি নয়। সেজন্য ওই রেলপথে পর্যাপ্ত যাত্রী কিংবা মাল সেই পরিমাণে পাওয়া যাবে না যাতে রেলপথটি লাভে চলতে পারে। অতএব এই প্রকল্পটি একটি সাদাহাতি পোষার মতোই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হয়ে দাঁড়াবে। পাকা সড়ক তৈরির জন্য ইরানের

মাটি আদর্শ স্থানীয়। এবং শাহর আমলে এই সড়কের জাল রাজধানী থেকে শুরু করে সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। রাস্তা এত মজবুত যে ন-দশ টনের লরি মাল নিয়ে দিনরাত যাতায়াত করছে। বিশ্বের সর্বত্রই সড়ক পরিবহনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রেল পরিবহন এঁটে উঠতে পারছে না। সেখানে ইরানের রেল ও খানকার সড়ক পরিবহনের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবে না, কারণ ইরানে পেট্রল সস্তা। এজন্যই এই রেলপথে বিনিয়োগ করা দেশের পক্ষে লাভজনক নয়। পারসি তবুণ বলছিল যে, এই ন্যায্য কথাগুলো বিভাগীয় অধিকারিকরা শাহকে জানায় না। তাঁর আরও বক্তব্য যে শাহর শাসনের প্রথম তিন চার বছর আমলারা যথেষ্ট সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে কিন্তু এখন তারা অনেকটা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এই রেললাইন প্রকল্পেও নিশ্চয়ই তাদের কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে। অথচ রেললাইন প্রকল্প বাতিল করে সেই খরচের এক দশমাংশ খরচ করলে, গোটা সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা আরও উন্নত ও আধুনিক হতে পারে। তখন পনেরো টনের লরিও অনায়াসে চলতে পারবে।

মশহদ — নৈশাপুর থেকে মশহদ পর্যন্ত আর তেমন কিছু উল্লেখ করার নেই। মশহদের উচ্চতা ৩১৯৭ ফুট এবং জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার। একটা পাহাড়ি ঘাট পার হতেই দূর থেকে মশহদ শহর দেখতে পেলাম। আটটার সময় সোনালি রঙের ইমাম রজার সমাধিস্থল দেখে তীর্থ যাত্রীরা আল্লা হো আকবর ধ্বনি দিয়ে উঠল। এক জায়গাতে বাস থামিয়ে ভক্তরা রাস্তার পাশে পড়ে থাকা পাথর দিয়ে ইমাম রজার নামে নকল গম্বুজ তৈরি করে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। পাহাড় থেকে নেমে এক বিশাল সমতল ভূমির ওপরে শহরটি প্রতিষ্ঠিত। শহরের চারদিকে প্রচুর বাগান এবং সেখানে যথেষ্ট গাছপালা আছে। পাহাড়ও আছে তবে তা বেশ দূরে দূরে। শহরে ঢোকান আগে পাসপোর্ট ও জাবাজ পরীক্ষা করা হলো। এরপর মেহমান খানা-মিল্লীতে (জাতীয় হোটেল) ছয় রিয়াল দৈনিক ভাড়ায় একটা ঘর নিলাম।

মশহদ খোরাসান প্রদেশের রাজধানী। পথঘাট তেহরানের মতোই সাজানো। জিয়ারত গাহর চারদিক খুব চওড়া রাস্তা দিয়ে ঘেরা, তারপর ওগুলোই শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মশহদ পৃথিবীর সমস্ত শিয়া মুসলিমদের কাছে কারবালার পর দ্বিতীয় পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখনকার পান্ডারা যাত্রী আনতে হিন্দুস্তান পর্যন্ত যায়। শহর প্রাচীন এবং তাকে ঘিরে প্রাচীর ও পরিখা আছে। যদিও প্রাচীরের জায়গায় জায়গায় ভাঙা এবং পরিখা প্রায় বুজে এসেছে। পুরানো সমস্ত দোকান পুরানো মহল্লাতেই আছে, আর নতুন তৈরি রাস্তার ধারে হাল ফ্যাসনের দোকান পাট বসেছে। ইরানের কালিন (গালিচা) এবং খোরাসানের খনির ফিরোজা পৃথিবী বিখ্যাত। প্রধান রাজপথটি সোজা উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গিয়েছে। জিয়ারত গাহর ওপরের অংশের নাম বালা-খয়াবান আর নীচেরটাকে বলে পাই-খয়াবান। প্রতিবছর প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মতো তীর্থযাত্রী ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের সুদূরতম অঞ্চল থেকে আসে। আগে সোবিয়েটে এশীয় অঞ্চলের প্রজাতন্ত্রগুলি থেকেও যথেষ্ট সংখ্যায় তীর্থযাত্রী আসত। বলশেভিকরা বিপ্লবের পর আল্লা মিঞাকেই দেশ ছাড়া করেছে, সেখান থেকে কে আবার তীর্থ করতে আসবে। শহরের পশ্চিমে বহিস্তান-শাহেরজা নতুন এবং শেষ ইমারত। সড়কের চৌমাথার মোড়ের নির্মাণকাজই বলে দিচ্ছিল যে এটা পহলবী আমলের কাজ। এরকম চওড়া এবং সোজা রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে না জানি কত মসজিদ ও কবর উচ্ছেদ

করতে হয়েছিল। লোকে বলছিল যে জিয়ারত গাহর আশপাশের মাটি কবরেই ভরা ছিল, আর রাস্তা তৈরির জন্য অন্য কোনো জায়গাও ছিল না, অতএব উৎখাত। মসজিদের বেলাতেও তাই। রাস্তার সামনে যে মসজিদই পড়েছে, রাস্তাকে এক ইঞ্চিবাঁকা না করে মসজিদটিকে ভাঙা হয়েছে। রাস্তা যাতে সুন্দর দেখতে লাগে সেজন্য ইটের জালিদার প্রাচীর তৈরি করে তাতে রং করা হয়েছে। বেড়ার ধারে সফেদা গাছ লাগানো হয়েছে। যাদের ব্যক্তিগত জমি রাস্তার প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করতে হয়েছে, তাদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। যাদের জমি একটু ভিতরের দিকে ছিল, রাস্তা চওড়া হওয়ায় তাদের জমি এখন একেবারে রাস্তার ধারে এসে গেছে, ফলে তাদের জমির দামও কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। জিয়ারত গাহর পশ্চিম দিকে একটা আধ ভাঙা মসজিদ আমি নিজের চোখে দেখলাম। এক হিন্দুস্থানি তীর্থযাত্রী বলল—গত বছর শাহ রজা তুরস্কে গিয়েছিল। সেখানে কামাল পাশার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছে যে এরপর মৃতদেহকে আর কবর দেওয়া হবে না, পোড়ানো হবে। প্রমাণস্বরূপ সে বলল—এখন ইরানে কারও মৃত্যু হলে সরকার তার আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে মৃতদেহ নিয়ে নেয়। আর কোনো লোক তো নিজে নিজেকে কবর দিতে পারে না, এবার দাফনকারি মহকুমা (কর্মচারী) আত্মীয়দের খবর দেয়, অমুক জায়গাতে মৃতদেহটিকে কবর দেওয়া হচ্ছে, আত্মীয়স্বজনেরা ইচ্ছে করলে সেখানে গিয়ে ফাতেহা পাঠ করতে পারে। সঙ্গীর বক্তব্য এগুলো ইচ্ছে করেই করা হচ্ছে যাতে মৃতের আত্মীয় পরিজনরা হয়রান হয়, এবং বিরক্ত হয়ে মৃতদেহের দায় অস্বীকার করে, সরকার তখন ওগুলোকে কবর দেওয়ার পরিবর্তে জ্বালিয়ে দিতে পারবে। মৃতদেহের সংকারের দায়িত্ব যখন সরকার নিজের হাতে নিয়েছে, তখন তাদের পক্ষে কবর দেয়ার চেয়ে পুড়িয়ে ফেলা অনেক সহজ।

সর্বজনীন হ্যাট পরার ফরমান যখন জারি হয়, তখন সামান্য কিছু জায়গা থেকেই তার বিরোধিতা করা হয়েছিল। এর দুটো কারণ ছিল প্রথমত, সারা দেশ জুড়েই তখন প্রবল জাতীয়তাবাদের এবং পরিবর্তনের হাওয়া বইছিল আর দ্বিতীয়ত, মোম্বারা খুব সংগঠিতভাবে এর বিরোধিতা করতে পারেনি। মশহদকে ইরানের কাশী বলা চলে। এখানকার মোম্বাদের জোর কিছু বেশি ছিল। তারা শাহর ফরমানের বিরোধিতা করে ভাবল তাদের কথাই থাকবে। মশহদ শহর আফগানিস্তানের সীমানার কাছে। ওখানে মোম্বাদের বিরোধিতার মুখে পড়ে শাহ আমানুল্লাহর যে হাল হয়েছিল, ইরানেও শাহ রজার ওরকম হাল করার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু শাহ রজা শক্ত ধাতুতে গড়া। তিনি কোনো নিয়ম চালু করার আগে অনেকদূর পর্যন্ত ভাবেন আবার প্রয়োজন হলে তাঁর ইম্পাতের পাঞ্জা দেখাতেও কসুর করেন না। মোম্বারা জিয়ারত গাহতে সভা ডাকল। প্রাদেশিক গভর্নর তাদের সাবধান করে সভা ডাকতে নিষেধ করল। কিন্তু কে শোনে ওসব। গভর্নর তেহরানে ফোন করলেন। সেখান থেকে নির্দেশ এল, সমবেত জনতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ফেরত পাঠাও, যদি কথা শোনে, ভালো। না শুনলে কোনো দুর্বলতা দেখানো যেন না হয়, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা যেন দেয়া হয়। তেহরান থেকে মশহদ তার, বেতার এবং বিমান, তিন ভাবেই যুক্ত। আন্দোলনে জনসাধারণের অংশগ্রহণ তেমন ব্যাপক ছিল না, মূলত কিছু পাভা-পুরোহিত এই আন্দোলন চালাচ্ছিল। জিয়ারত গাহতে জুড়ে হওয়া ওই ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে প্রশাসন কী ব্যবহার করেছিল। সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। একজন বললেন, জিয়ারত গাহর সবকটি

দরজার মুখে কামান বসানো হয়েছিল। জমায়ত হয়েছিল হাজার তিন লোকের, একজনও বাঁচেনি। লরি বোঝাই করে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে গণকবর দেওয়া হয়। প্রাথমিক গুলি চালনায় সবাই মরেনি, অনেকে আহত হয়েছিল। তারা যখন সৈনিকদের বলল, আমি মরিনি, আহত, তখন নাকি সৈনিকেরা বন্দুক উচিয়ে বলেছিল কিছু পরোয়া নেই, এখন তাহলে মরো, এটাই শাহর হুকুম। অন্য একজন বললেন, অতএব মৃতের সংখ্যা ছিল হাজার দেড়েক। তৃতীয় জন বললেন, সব বাজে কথা। তিন হাজারও মরেনি, দেড় হাজারও মরেনি, মরে ছিল গোটা চল্লিশেক, বাকিরা সব সৈন্য দেখেই ভেঁ দৌড়। প্রাণে বাঁচলে তবে তো খোদার নাম। সরকার চেয়েই ছিল যে জনতা যাতে মোম্বাদের খপ্পরে না পড়ে। মোম্বাদের ভীৰুতা এবং পালাবার জন্য অমন তাড়াহুড়ো দেখে লোকের শ্রদ্ধা তাদের ওপর থেকে অনেক কমে গেছে, এবং সরকারের ইচ্ছাও পূর্ণ হয়েছে। জিয়ারতের ভিতরে সমস্ত ইরানীদেরই হ্যাট পরে যেতে হয়। এক হিন্দুস্থানি তীর্থযাত্রী বিদেশি হওয়ার সুবাদে পাগড়ি পরে ভেতরে ঢোকার বিশেষ অনুমতি পেয়েছিল। সে অত্যন্ত স্ফোভের সঙ্গে বলল — দেখে শুনো তো মনে হচ্ছে এটা গির্জা হয়ে গেছে। লোকে টুপি হ্যাঙারে ঝুলিয়ে খোলা মাথায় জিয়ারতের গাহতে ঢুকছে। তার আরও বক্তব্য যে জিয়ারতে কোটি টাকার হিরে-জহরত ও অন্যান্য মূল্যবান রত্ন ছিল, সে সব তো সরকার বাজেয়াপ্ত করেইছে, উপরন্তু জিয়ারতের নিত্যকার আমদানিও দখল করেছে। আর-একজন, বলল, না সব বাজেয়াপ্ত হয়নি কিছু বুপোর জিনিসপত্র আছে। হিন্দুস্থানি তীর্থযাত্রী রেগে গিয়ে বলল — জনাবে আলি, ওগুলো আমাদের, হিন্দুস্থানি তীর্থযাত্রীদের বেওকুফ বানানোর জন্য রাখা হয়েছে। যদি কিছুই না থাকে, তাহলে লোকে ভেটই বা চড়াবে কেন? ওরকম হলে সরকারের আমদানি যাবে বন্ধ হয়ে, তাই ওই ফাঁকিবাঁজিটুকু করা হয়েছে।

পুরানো বাজারটা উড়ালপুলের তলা দিয়ে একটা রাস্তা গিয়েছে তারই এক ধারে। এখানকার জাতীয় উদ্যান যাকে বাগ-এ-মিল্লি বলা হয়, সেটি একটি সুন্দর জায়গা। সন্ধ্যাবেলা সেখানে বেশ ভীড় হয়। ভেতরে একটা চায়ের দোকান আছে, তার সামনে বড়ো বাঁধানো চত্বরে কয়েকশো চেয়ার পাতা। বেড়ানোর সঙ্গে মৌজ করে একটু চা খাওয়া, এই শৌখিনতার বিষয়ে মেয়েরা এখানে ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে। সিনেমা, থিয়েটার এবং অন্যান্য মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাদিতে মশহদ তেহরানের চেয়ে খুব পিছিয়ে নেই। একদিন এখানকার হামামে স্নান করতে গেলাম। বোধ হয় চার আনা দিতে হয়েছিল আর তার মধ্যেই গরম জল, স্নানাগারের ভাড়া এবং অন্যান্য সামগ্রীর খরচও ধরা ছিল। একজন পরিচারক এসে গোটা শরীরটা খুব ভালো করে মালিশ করল। আমি যে হোটেলে ছিলাম সেখানকার পরিচারকদের মধ্যে দুজন মেয়ে ও একজন পুরুষ রাশিয়ান ছিল। কয়েক হাজার রাশিয়ান মশহদে বাস করে, এদের অধিকাংশই বিপ্লবের সময় পালিয়ে এসেছে। এদের কেউ শাক-সবজি বিক্রি করে, কেউ বুটি তৈরি করে ফিরি করে। দু তারিখে আমার হোটেলে একটা ঘটনা ঘটল। আমি আমার মানিবাগ ওভারকোটের পকেটে রেখে শৌচাগারে গিয়েছিলাম। শৌচাগারটি আমার ঘর থেকে মাত্র দশ পা দূরে ছিল। সেখানে মিনিট তিন চারের বেশি সময় আমার লাগেনি, ফিরে এসে দেখি মানিবাগ উধাও। মানিবাগে একশো টাকার মতো আমেরিকান ডলার, আর কিছু ইরানী মুদ্রা ছিল। সবচেয়ে দামি জিনিস তার মধ্যে যা ছিল, তা হল বুশ ভ্রমণের সময় আলাপ, এমন কিছু বন্ধু-বান্ধবের ঠিকানা লেখা একটা কাগজ। দেশে ফিরে তাঁদের চিঠি লিখব, এরকম প্রতিশ্রুতি তাঁদের আমি দিয়েছিলাম। সাধারণভাবে ঘরের দরজা ঠিকমতো বন্ধ

করা, বা তালা দেয়া, এসব ব্যাপারে আমি যথেষ্ট সতর্ক থাকার চেষ্টা করি। এমনকি যেখানে জিনিসপত্র খোয়া যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেরকম জায়গাতেও আমি দরজায় তালা লাগাই। আমি সব সময় বলি নিজের অসাবধানতায় কোনো কিছু চুরি হলে তারপর নির্দেশ লোকেদের সন্দেহ করা ঠিক নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমিই সতর্কতা লঙ্ঘন করেছি। নিজের মনকে প্রবোধ দিতে বেশি দেরি লাগেনি। আমার অসাবধানতার উচিত দণ্ড পেয়েছি এবং ভবিষ্যতে এরকম আর কখনও যাতে না হয়, সেই শিক্ষা নিলাম। হোটেলের মালিককে ঘটনাটা জানানোয়, সে বলল, আপনার কাকে সন্দেহ হয়? বুশ ঝাড়ুদারনি মেয়েটি হোটেলে নতুন বহাল হয়েছে। আমি অযথা কাউকে সন্দেহ করতে রাজি নই। ঝাড়ুদারনি ছাড়াও ওই মুহূর্তে বারান্দায় আরও কত লোক ঘোরাঘুরি করেছে।

ফিরদৌসীর সমাধি — দোসরা অক্টোবর, আড়াই তুমান (তিন টাকা) দিয়ে একটা দুবুখকি ভাড়া করলাম। বেলা তিনটে নাগাদ তুসের উদ্দেশে রওনা হলাম। তুস ইরানের এক প্রাচীন শহর। মশহদের খ্যাতির আগে তুস-ই এই অঞ্চলের বড়ো শহর ছিল। ইরানের জাতীয় কবি এবং শাহনামার অমর স্রষ্টা ফিরদৌসী এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ফিরদৌসীর সমাধিও এখানে। পথে যেতে যেতে দু-চারটি গ্রাম পড়ল। আমাদের রাস্তা অনেকটা দূর পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ খালের কিনারা ধরে চলল। রাস্তার দুধারে সুন্দর সুন্দর ফলের বাগান। এদিকে দেখলাম কার্পাসের প্রচুর চাষ হয়েছে। কার্পাসের ফসল (তুলো) এখনও সম্পূর্ণ তোলা হয়নি। শহর থেকে বের হয়ে কয়েক মাইল যেতেই বাঁ দিকে চিনির কারখানা দেখতে পেলাম। ইরানের বেশিরভাগ চিনি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় যা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সেজন্য এখানে বিট থেকে চিনি তৈরির কারখানা বসিয়েছে। কাপড়ের কল কিংবা উলের মিলগুলোর মতো চিনির কারখানাতেও রাশিয়ান কারিগরির সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

দু ঘণ্টায় প্রায় আঠাশ কিলোমিটার চলে অবশেষে তুস পৌঁছালাম। প্রথমে ছোট একটি নদীর পুল পার হলাম, তারপর প্রায় ভগ্নস্থাপে পরিণত হওয়া একটি উজাড় গ্রাম অতিক্রম করে তুস নগরে প্রবেশ করলাম। তুসের একদা বিশাল নগরের অধিকাংশই এখন পরিত্যক্ত। পুরানো ভাঙা বাড়িঘরকে একেবারে ধূলিসাৎ করে চাষের খেতে পরিণত করা হয়েছে। প্রাচীন ইমারতের মধ্যে তখত-এ-হারুণ অথবা সৈয়দের মকবরটি রয়ে গেছে। ইমারতটা ইটের তৈরি, কিন্তু তার ভিত গাঁথা হয়েছিল বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে। গম্বুজটি যদিও অটুট আছে কিন্তু তার অবস্থা সঙিন। পাশেই অর্ক অর্থাৎ পুরানো কেল্লার ধ্বংসাবশেষ। নতুন সড়ক সোজা ফিরদৌসীর সমাধি পর্যন্ত চলে গেছে। ফিরদৌসীর সমাধিস্থল ও তাকে ঘিরে উদ্যানটি সম্প্রতি তৈরি। পুরানো কবরটিকে খুঁড়ে মার্বেল পাথর দিয়ে ইরানি ধরনে নতুন করে বানানো হয়েছে। ইমারতের থামগুলোতে সেই পুরানো আমলের শিল্পকাজ করা আছে যেরকম পর্সোপোলিসে দেখেছি। কিছু ফেরেস্তাদের মূর্তিও রয়েছে দেখলাম। সমাধিটি দক্ষিণমুখি এবং পূর্বদিকের দেয়ালে কবিতার ছন্দে একটা দীর্ঘ লেখা লেখা আছে। তাতে ফিরদৌসী সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাবাক্য বলা হয়েছে।

দরজার কাছে ওঠার সিঁড়িতে পাঁচটি ধাপ আছে। ওই ধাপের গায়ে নানা ধরনের চিত্র অঙ্কিত আছে। এর মধ্যে দারয়োশ সহ আরও অনেক ইরানি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের — যাদের

সম্বন্ধে ফিরদৌসী শাহনামাতে গীত রচনা করেছেন — চিত্র আছে। একটা ধাপে দেখলাম পাগড়ি মাথায় এক রাজার ছবি। মনে হয় ওটি মাহমুদ গজনভির ছবি। সুলতান মাহমুদ গজনভি ফিরদৌসীকে প্রতি পৃষ্ঠার জন্য এক আশরফি করে দিয়ে শাহনামা লিখিয়েছিলেন। ফিরদৌসী কিন্তু সোনার আশরফি পাননি। মামুদ গজনভি তাঁকে সোনার পরিবর্তে রূপোর আশরফি দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে ধর্মাত্মক সুলতান মাহমুদ গজনভির, সহায়তাতেই শাহনামা লিখিত হয়েছিল এবং তার ফলে ইরান এক বহুমূল্য রত্নলাভ করেছে।

ফিরদৌস— খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে তুস ইরানের এক বিখ্যাত নগর ছিল। আফগানিস্তান, হিন্দুস্থান, তুর্কিস্তান, আরব এমনকি ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য যে পথ ধরে হতো, সেই পথ গিয়েছিল তুস হয়ে। সেজন্য তখন তুসের ভাগ্য রেখা ছিল তুঙ্গে। তারও তিনশো বছর আগে ইরান তার জাতীয় স্বাধীনতা হারিয়েছিল আর তখন বিশ্বজুড়ে আরব খলিফাদের দুন্দুভি বাজছিল। ইরানী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস হওয়ার পর থেকে তার বুদ্ধিজীবীরাও সৃজনশীলতা হারিয়ে, অনামা ব্যক্তি হয়ে জনারণ্যে মিশেছিল। ফিরদৌসীর পরিবারও অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে অবশেষে তুসে এসে বাস করতে থাকে। তুস শহরের পশ্চিমে বিবরানকেবাজ নামে এক গ্রামে ৩২৯ হিজরি সনে ফিরদৌসীর জন্ম হয়। ইরানে সাসানি বংশের শাসনকাল থেকেই তুস লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই নিবাসস্থল ছিল। খোরাসান প্রদেশ তখন সাসানিদের শাসনাধীনে ছিল। ইরানের জাতীয় ভাবধারা অনুসারে এখানকারও অধিকাংশ লোক শিয়া মতাবলম্বী। ফিরদৌসীও শিয়া মতানুসারি ছিলেন, এবং দু'একটা ছোটোখাটো ভ্রমণের কথা বাদ দিলে, জীবনের অধিকাংশ সময় (৮৭ বছর) এই তুস শহরেই কাটিয়েছিলেন।

কয়েক শতাব্দীর আরবি শাসনে, ইরানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপরে ক্রমাগত যে আঘাত হানা হয়েছিল, তার ফলে সেগুলো প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন ধর্মীয় উন্মত্ততার শ্রোত একটু মন্দ হলো, তখনই আবার আম জনতার মধ্যে প্রাচীন ইরানের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা জন্মাতে থাকে। তাদের এই শ্রদ্ধা ভালোবাসা ইতিহাস, সাহিত্য ও ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। তখনকার কবিরা ফারসি ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন এবং প্রাক্ আরব যুগের ইরানী ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনের নানা কাহিনি লিখেছেন। ইরানে আরব অধিকারের প্রথম পর্বে, সমস্ত বইপত্র জ্বালিয়ে হামামের স্নানের জল গরম করা হয়েছিল। কিছু কিছু ইতিহাস, কাহিনি লোকমুখে কিংবা এদিকে ওদিকে ছিটকে থেকে বেঁচেছিল। সেগুলোকে সংগ্রহ করার চেষ্টা চলল। ফিরদৌসী সেই সংগ্রহের ভিত্তিতে কাব্যের ছন্দে ইরানের ইতিহাস লিখেছেন, যা শাহনামা নামে আজ বিশ্বখ্যাত। ৫৮ বছর বয়স পর্যন্ত ফিরদৌসীর জীবন শান্তিতেই কেটেছিল। তারপরেই যে ধরনের আর্থিক দুরবস্থা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার থাকা সাহিত্য সেবীদের জীবনে আসে, ফিরদৌসীর জীবনেও তেমন দুরবস্থা এসেছিল। ইরানের বর্তমান সময়ের একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক বলেছেন — ফিরদৌসীর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হলো, সমস্ত জীবন ধরে একা এমন এক কাজ করেছেন যা তাঁর আগে বেশ কয়েকজন দেশভক্তরা সমবেতভাবে চেষ্টা চালিয়েও সফল হতে পারেননি। সুলতানি আমলেই শাহনামা লেখা হয়েছিল এবং অবশিষ্ট অংশটুকুও যাতে শেষ হয়, সেজন্যই

পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। এই সব ঘটনা পরম্পরা দেখে মনে হয় শাহনামা শেষ করার সময় কবি বার্বাক জীবনের অস্তিম লগ্নে প্রায় পৌঁছেছিলেন। ফিরদৌসীকে ইরানে একজন মহাপুরুষের সম্মান দেওয়া হয়। জীবিত অবস্থায় অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও তিনি ইরানীদের জন্য ইরানের প্রকৃত ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর আরও তারিফ ওই জন্যই করতে হয় যে ওই ধুমুয়ার সময়েও তাঁর শাহনামাতে আরবি শব্দের ব্যবহার প্রায় করেননি বললেই হয়। শাহনামার ভাষা শুদ্ধ ফারসি ও পহলবী। তিনি সরাব আর সরাবেবের ঝারি, ঠোট, আর মাথার চুলের ওপরেই তাঁর প্রতিভার অপচয় করেননি। তিনি তাঁর কাব্যপ্রতিভাকে মৃতপ্রায় ইরানী জাতির পুনরুজ্জীবনের কাজে ব্যবহার করেছিলেন। ফিরদৌসী তাঁর সময়ের আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার জন্য তাঁর রচনা সে যুগের দেশভক্তদের কাছে ‘বেদ’ রূপে স্বীকৃত হয়নি, তার জন্য হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফিরদৌসীর নিজস্ব ধর্ম ছিল ইসলাম। কিন্তু শাহনামাতে যাঁদের বীরত্বগাথা তিনি লিখেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন অগ্নিপূজক, কাফের। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় কোনো পক্ষপাতকে সামনে আসতে দেননি। ৪১১ হিজরিতে (ভিল্লমতে ৭১৬), যখন ফিরদৌসীর দেহাবসান হয় তখন তাঁর প্রতি যথাবিহিত সম্মান দেখানোর বদলে তুসের সুলতান ফতোয়া দিয়েছিল যে কাফের গুণগানেই জীবন ব্যয়িত করেছে, সে নিজেও কাফের। মুসলমানদের কোনো গোরস্থানে তাঁর স্থান হবে না। অতঃপর ফিরদৌসীকে তাঁর বাড়ির আঙিনার এক কোণে কবরস্থ করা হয়। ফিরদৌসীর রচনা বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যাওয়ার অনেক আগেই তাঁর কবর জনমানসের বিস্মৃতির গর্ভে চলে গিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে তুস শহরও একদিন প্রায় পরিত্যক্ত এলাকায় পরিণত হয়। দেশভক্ত ইরানীদের পক্ষে ফিরদৌসীর আসল কবরকে খুঁজে বার করা মোটেই সহজ কাজ হয়নি। তুসের ভগ্নস্থূপের যে দিকটাতে ফিরদৌসীর বাড়ি ছিল বলে অনুমান করা হয়েছিল সেখানে বিস্মৃতভাবে খনন কাজ চালানো হয়, অবশেষে সেই বাঞ্ছিত কবরটিকে খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে আবুল কাশেম ফিরদৌসী তুসির দেহাবশেষ ছিল। কবরের ওপরের শিলালেখটিকেও পাওয়া গিয়েছিল। এভাবে প্রকৃত কবরটির উদ্ধার হওয়ার ঘটনার পিছনে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকা সত্ত্বেও এক মোল্লা সাহেব বললেন — এসবই সাজানো। ফিরদৌসীর আসল কবর কবেই হারিয়ে গেছে। রজা শাহ আর তাঁর অনুগামী ইসলামের দূসমন ইরানীরা মিলে এক মিথ্যে কবর তৈরি করে সেটাকে ফিরদৌসীর কবর বলে চালাচ্ছে। এদের এসমস্ত ষড়যন্ত্রের একটাই উদ্দেশ্য, ইসলামকে ইরান থেকে হটানো। দেখছেন না, যে বৃত (মূর্তি) পূজাকে হটানোর জন্য পয়গম্বর মুহাম্মদ কত কষ্ট সহ্য করেছেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে কোনো সমঝোতা করতেও পছন্দ করতেন না, ইসলামের সমগ্র ইতিহাস তারই সাক্ষী দেয়। সেখানে ফিরদৌসীর কবরের দরজার ওপরে আজ সেই মূর্তিই বসানো হয়েছে। আমি তাঁকে বললাম—আপনারা সকলে মিলে গিয়ে ওই মূর্তিগুলো ভেঙে দিচ্ছেন না কেন? ওখানে তো একজন সশস্ত্র পুলিশও প্রহরায় নেই। একথার পর বেচারা নানা অজুহাত দেখাতে লাগলেন। মনে হয় শাহ পহলবী মশহদের মোল্লাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তাতে তুসের মোল্লাদেরও বোধোদয় হয়েছে।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে ইরান ফিরদৌসীর জশন-হাজার-সালার অর্থাৎ জন্ম সহস্র বার্ষিকী পালন করে। তুসের ভগ্নস্থূপ সেদিন আবার জনসমাগমে ভ্রমজমাট হয়ে উঠেছিল। শুধু

ইরান নয়, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক অঞ্চল থেকে জ্ঞানী, গুণি পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। এই উৎসবে, জাপান থেকে আসিকাগা, রাশিয়া থেকে বোলোতনিকোফ্, ইংলন্ডের কবি ড্রিংকওয়াটার এবং স্যার ডেনিসন, জার্মান থেকে ডক্টর সার, যুগোস্লাভিয়া থেকে বেরকতোরবিচ্, আমেরিকা থেকে ডক্টর গুহার, ফ্রান্সের মঁসিয়ে মার্সে, তুর্কি থেকে নাহাদ-বেগ ইত্যাদি প্রচুর খ্যাতনামা ব্যক্তির সমবেত হয়েছিলেন। হিন্দুস্থান থেকে যারা এসেছিলেন, তাঁর হলেন—আগা মুহাম্মদ ইসহাক্, প্রফেসর মুহাম্মদ তাহরে রিজভি, প্রফেসর হাফিজ (আলিগড়) মৌলবি নিজামুদ্দীন, মৌলবি হাদী হাসান। এরা ছাড়াও শ্রী বাহরাম গোর, আংক্রে সারিয়া, উলওয়ালা এবং সর্দার দস্তর নৌসেরবাঁ ভারতের পারসি সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। হিন্দুস্থানের অন্য প্রতিনিধিরা সে দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথার্থ প্রতিনিধি ছিলেন না। এটা বড়োই পরিতাপের বিষয় যে, হিন্দুস্থান ফিরদৌসীর স্মৃতি সম্মেলনে যথার্থভাবে উপস্থিত থেকে ইরানের প্রতি তার সদভাবনার পরিচয় রাখতে পারল না। যদি বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে ফিরদৌসী যে সংস্কৃতির জয়গান করেছেন তার সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ভগিনী প্রতিম সম্বন্ধ। এভাবে এক বোনের কোনো উৎসবে আর-এক বোনের অনুপস্থিতি চোখে পীড়ার উদ্রেক করে। হিন্দুস্থানের হিন্দু মহাসভা তো রাজ্যের যত প্রগতি বিরোধীদের এক জায়গায় জড়ো করে হৈচৈ করাকেই কর্তব্য মনে করে। কিন্তু ভারতের জাতীয় মহাসভা কিংবা অন্যান্য সংস্থা কেন এই উৎসবে তাঁদের প্রতিনিধি প্রেরণ করেননি?

ফিরদৌসীর কবর ঘিরে চমৎকার একটি বাগান তৈরি হয়েছে। সেখানে একটি গ্রন্থাগার আছে। পাশেই ছোট একটি গ্রাম এবং সেখানকার বাগান বিস্তৃত হয়ে ফিরদৌসীর সমাধি উদ্যান পর্যন্ত চলে এসেছে। দুপুরের রোদ বেশ চড়া দেখে পাশের বাগানে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেব ভাবলাম। বাগানের মালিক চট করে সুন্দর একখানা কালিন এনে ঘাসের ওপরে বিছিয়ে দিয়ে, চায়ের কথা বললেন। সেই দুপুরে বিনা দুধের চায়ের চেয়ে ইরানের মিঠে খরমুজ (সরদা) খাওয়া অনেক বেশি ভালো। এখানকার লোকের কাছে খরমুজের তেমন বিশেষ কদর নেই। খরমুজ, আঙুর ইত্যাদি এখানে প্রচুর ফলে তাই দামও কম, এবং ইজ্জতও কম। এদের কাছে দাম বেশি হলেই জিনিস ভালো হয়। দু-তিন খানা সবুজ খরমুজ এল, ওপরে সবুজের মধ্যে মধ্যে সাদা দাগ ছিল। কাটার পর ভিতরটা একেবারেই সবুজে ভরা পেলাম আর মিষ্টত্ব? সে সম্বন্ধে কী আর বলব। খরমুজ খেয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিলাম। বেলা দুটোর সময় আবার মশহদে ফিরে এলাম।

আফগান কনসালের কাছ থেকে কাবুলের ভিসা নেবার ছিল। তেহরান থেকে আমাকে বলা হয়েছিল যে আমি যেন মশহদ থেকে ভিসার আবেদন করি। এখানে এসে শূনি আফগান কনসাল দেশে ফিরে গেছেন। অতএব আফগানিস্তান হয়ে দেশে ফেরার আশা ত্যাগ করতে হলো। মশহদ থেকে সোবিয়ত সীমানাও দূরে নয়। ওখান থেকে অস্কাবাদ রেল স্টেশন পর্যন্ত মোটর যায়। এরপর অস্কাবাদ থেকে রেল সোবিয়ত তুর্কমেনিস্তানের ভিতরে চলে যায়। আবার মশহদ থেকে হিরাট (আফগানিস্তান) পর্যন্ত মোটর রাস্তা আছে, ওখান থেকেও কাবুল যাওয়া যায়। আমার ইচ্ছে ছিল যে ফেরার পথে আফগানিস্তানটাকেও ঘুরে নেব। কিন্তু ভিসার গন্ডগোলে খাইবার গিরিপথ ধরে ফেরার আশা থেকে বঞ্চিত থাকতে হলো।

ভারতে

সাত তুমান (প্রায় দশটাকা) দিয়ে জাহেদান (প্রাচীন নাম দুজ্জাব) পর্যন্ত টিকিট কেটে আনলাম। সৌভাগ্যবশত আমেরিকান এক্সপ্রেসের কিছু চেক আলাদা করে রাখা ছিল, তাই মানিব্যাগ হারানো সত্ত্বেও তেমন বড়ো বিপদের মধ্যে পড়তে হয়নি। ইরানের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে টমাসকুক, আমেরিকান এক্সপ্রেস ইত্যাদি কতকগুলো বড়ো বড়ো আন্তর্জাতিক ভ্রমণ পরিচালন সংস্থার চেক ভাঙানো যায়। তেসরা অক্টোবর রাত্রি নটায় মোটর ছাড়ল। মোটরটি ছিল একটি মালবাহী লরি, যার অর্ধেকের বেশি অংশ মালে ভর্তি ছিল। বাকি জায়গাতে ১৮ জন যাত্রী কোনোমতে বসে ছিল। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে পাঞ্জাবের দীনানগর গুবুদাসপুর অঞ্চলের পণ্ডিত মস্তুরাম শর্মা, তাঁর স্ত্রী ও ছোট একটি বাচ্চা এবং তাঁর পিসিমা ছিলেন। আরেকজন ছিলেন, আম্বালার আলমদাদ হুসেন। ওই সদাহাস্য মুখ ভদ্রলোকের মুখের হাসিকে অতি কঠিন পরিস্থিতিতেও হারিয়ে যেতে দেখিনি। বস্তুত তাঁর জন্যই এই ভ্রমণের কষ্টকে কষ্ট বলে মনে হয়নি। তাছাড়াও গুজরাটের এক মোল্লা পরিবারও আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। মোল্লা সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিবি, মেয়ে ও জামাই ছিলেন। এরা সকলেই মশহদে জিয়ারত করতে এসেছিলেন। মোট আঠারো জন যাত্রীর মধ্যে নজন ভারতীয় এবং নজন ইরানী। গাড়ি চলতে শুরু করলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠল কিভাবে বসা হবে। চলন্ত গাড়িতে বসা অবস্থায় বিমুনি আসে। সেই অবস্থায় কেউ যদি কারও গায়ে ঢলে পড়ে তাহলে কী হবে এমন বাঁকা প্রশ্নও সামনে এল। অনেক সলাপরামর্শের পর ঠিক হলো যে মাথা বাদ দিয়ে শরীরের বাকি অংশকে যাত্রাপথে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা চলবে না। অতএব ঘুমের মধ্যে কেউ কারও গায়ে ঢলে পড়লে তা অপরাধ মনে করা হবে না। এবার প্রশ্ন উঠল মাল নিয়ে। ওপরের দিকে রাখা মাল যদি গাড়ির ঝাঁকুনিতে নীচে গড়িয়ে পড়ে তাহলে কী হবে। লরির গায়ে লেখা ছিল ‘মখসুম-হল্লবার’ অর্থাৎ কেবল মাল পরিবহনের জন্য। অতএব আমরা মিছিমিছি আমাদের মালের থেকে আলাদা করে ভাবছিলাম। তিন থেকে সাতই অক্টোবর, এই কদিন আমাদেরও মাল হয়ে, এদিক ওদিক গড়িয়ে, এ ওর ঘাড়ে পড়ে, প্রকৃত মালের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হলো। সওয়ারিদের নেয়ার ব্যাপারে পুলিশ কোনো কড়াকড়ি কেন করতে যাবে? কারণ এই গাড়িগুলোতে তাদের প্রয়োজনে তারা বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করে। তাছাড়া নগদ বিদায়ও থাকে। অতএব লরিওলারা আইন ভেঙে যাত্রী তুললেও কেউ কিছু বলার নেই।

রাত্রি একটার সময় গাড়ি গেলো খারাপ হয়ে। প্রকৃত ক্ষমতার দু-তিনগুণ বেশি ওজন বেচারী গাড়ির ওপরে চাপানো আছে, বিগড়োতেই পারে। ভাগ্য ভালো যে কোনো কলকজা ভাঙেনি, যান্ত্রিক গণ্ডগোল সারিয়ে গাড়ি আবার চলল, এবং রাত্রিতে কোথাও বিশ্রামের জন্য না থেমে একটানা চলল। ভোরের দিকে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব লাগছিল। এদিককার পাহাড়গুলো খুব সন্নিবিষ্ট। কোনো পাহাড়ের গায়ে একতিল সবুজ নেই, বিলকুল ন্যাড়া। বেলা একটার সময় পৌছলাম তুর্বত-এ-হায়দারি। বারো হাজার জনসংখ্যার ছোট এক শহর। এখানে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য মেহমান-খানা ছিল, এবং যার ঘরগুলোও যথেষ্ট সাফসুতরো ছিল, কিন্তু আমাদের ড্রাইভার এক মাত্র বিজর্নদ ছাড়া আর সমস্ত রাস্তায় যাত্রীদের শোয়ার বা বিশ্রামের কথা ভাবেওনি। হয়তো ভেবেছে মালের আবার রাস্তিদের ঘুম কি দরকার? সারাদিনে বার তিন-চার গাড়ি খাওয়া দাওয়ার

জন্য থামত, আর বাকি সময় চলত। লরির চারদিক ঢাকা থাকায় বাইরের দৃশ্যাবলী দেখারও সুযোগ নেই, অতএব সেই অভাব ভিতরের ঘটনা দেখেই পূরণ করতে হতো। মোল্লা সাহেব গুজরাটের খোজা বংশের লোক এবং শিয়া মতাবলম্বী, শিয়াপ্রধান ইরানের ওপরে তাঁর তেমনই ভক্তি যেমন ভক্তি সুন্নি মুসলমানেরা এক সময় তুরস্কের ওপরে রাখত। মশহদ প্রভৃতি তীর্থের জন্য ইরান তাঁর কাছে দ্বিতীয় আরব। কিন্তু ইরানীদের পোশাক, আহার, আচার ব্যবহারে ইওরোপীয়ান ধরন দেখে তিনি বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, তিনি দেখেছেন ইরানী মেয়েরা চুল ছেঁটে ফেলে মেম সেজে রাস্তায় বের হচ্ছে। হোটেলে বা অন্যত্র পুরুষদের সামনে নাচতে গাইতেও তাদের লজ্জা বোধ হচ্ছে না। কয়েকশো মসজিদ আর কয়েক হাজার কবর উৎখাত করে রাস্তা তৈরি করার খবরও তাঁর অজানা ছিল না এবং পাগড়ি ও জামা পরার জন্য ইরানের মোল্লাদের কিরকম হেনস্তা সইতে হয়, তাও তাঁর জানা ছিল। তিনি নবীন ইরানের প্রতিটি পদক্ষেপের পিছনেই শয়তানের হাত দেখতে পাচ্ছিলেন। মোল্লা সাহেবের জামাই বাবাজিও শ্বশুরের সঙ্গেই সহমত ছিলেন। তবুণ আলমদাদ সাহেবের সমর্থন কোনদিকে ছিল স্পষ্ট করে বলতে পারব না তবে তিনি যেভাবে মোল্লা সাহেবের প্রতিটি কথায় সায দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে তাঁর সমর্থন নির্ভেজাল নয়। একদিন মোল্লা সাহেব ইরানীদের এবং সেই সঙ্গে তাদের বাদশাহেরও শ্রদ্ধা আরম্ভ করলেন। বলতে বলতে এমনও বলে ফেললেন—আরে ভাই এখন তো সর্বত্রই ইসলাম কমজোর হয়ে পড়েছে, একমাত্র তুরস্ক আর ইরানের ওপরই যা কিছু আশা ভরসা ছিল। এখন তুরস্কের যা হাল হয়েছে, আর ইরানও যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে মনে হয় পয়গম্বর সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীই ফলতে যাচ্ছে। পয়গম্বর সাহেব দেহ রেখেছেন, তেরশো বছর হয়ে গেছে, এখন চারদিকে কেয়ামতের (মহাপ্রলয়) চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কারও হুঁশ নেই; তাঁর জামাই তাঁকে সমর্থন করে বললেন—কী আর করা যাবে সাহেব। হজরত নুহও (নোয়া) লোককে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, কেয়ামত আসছে, এখনও সংযত হও, কিন্তু সেদিন তাঁর কথা কেউ শোনেনি। তিনি নিজের নৌকা বানানো শুরু করেন, তিনি বলেছিলেন তুফান আসবে, এবং সেটা মিথ্যা ভয় দেখাতে নয়, কিন্তু লোকে তাঁকে উপহাস করেছিল। তারা বলেছিল নুহ লোকটা পাগল নাহলে তুফান এসে পৃথিবী ডুবিয়ে দেবে, এমন অসম্ভব কথা কেউ কখনও বলে? অবশেষে কিন্তু নুহর কথাটা সত্যি হয়েছিল এবং আর সকলের অনুতাপ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। সেদিনকার লোকদের মতো এদেরও বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

আমি আমার স্বদেশি বন্ধুদের সাহস দিয়ে বললাম, কেয়ামত এলেও হিন্দুস্থান বেঁচে যাবে। বিগত কেয়ামতে হজরত নুহর নৌকা যে মহাপর্বতে আটকেছিল, সেই মহাপর্বত হিন্দুস্থানেই ছিল। হজরত নুহর নৌকায় আশ্রয় পাওয়া সামান্য কিছু প্রজাতির জীবজন্তু আর গাছপালা হিন্দুস্থানের পবিত্র মাটিতে আবার নতুন করে জীবন প্রবাহ শুরু করেছিল। বিগত প্রলয়কে কেউ কেউ অবিশ্বাস করলেও এখন যে প্রলয় আসতে যাচ্ছে তাতে হিন্দুস্থান ছাড়া আর সবাই ধ্বংস হতে যাচ্ছে। পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ নিয়ে রাশিয়া, তারা তো আল্লা সহ সমস্ত ধর্মের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করেছে এবং আঠারো বছরের চেষ্টায় ওখানকার লোককে ঈশ্বর, আল্লাহ, গড,

সকলের নামই ভুলিয়ে ছেড়েছে। এখনও যদি কেউ ওখানে আল্লাহর নাম করে তবে নিশ্চিত জানবেন তার বয়স পঞ্চাশের ওপরে। নতুন প্রজন্ম আল্লাহর নাম শুনে সেভাবেই পালাচ্ছে যেভাবে খরগোসের মাথা থেকে সিং। ইউরোপ আমেরিকাতে রবিবার আল্লাহর ঘর খালি পড়ে থাকে। চীন ইত্যাদি দেশের অবস্থাও ওরকম। জাপানের মতো কিছু দেশে ধর্মের প্রভাব এখনও আছে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ আলাদা ধর্ম। সেখানে খোদার জায়গা নেই। তুরস্ক আর ইরানের অবস্থা আপনি নিজের চোখেই দেখলেন। আর এবার হিন্দুস্থানের দিকে তাকান। সেখানকার লোক এখনও মনেপ্রাণে আল্লাহ ও তাঁর মজ্জহবকে মানে। সেখানে এখনও প্রচুর খোদার বান্দা আছে যারা তাদের সমস্ত আস্থা আল্লাহর ওপরে সমর্পণ করে বসে আছে। হিন্দুস্থানের লোক কী চূপ করে বসে থাকত যদি তাদের রাস্তার জন্য মসজিদ, কবর, এমনকি হিন্দু মন্দিরও ভাঙা হতো? ইরানে তাজিয়া নিয়ে যাওয়ার মিছিলে গ্রিসিয়া পড়া বা বুক চাপড়ানো পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ভাবুন তো এরকম ঘটনা হিন্দুস্থানে ঘটলে কী হতো। রাস্তার নদী বয়ে যেত, আর রাজা শাহরা টের পেত যে দুনিয়ায় এখনও অনেক খোদার বান্দা রয়েছে।

মোম্বা সাহেব আমাকে সমর্থন করায় আমার সহস আরেকটু বাড়ল। বললাম— শয়তানের এই অত্যাচার দেখার পর আমাদের আর চূপ চাপ বসে থাকা উচিত নয়। যদিও হিন্দুস্থানের লোক যথেষ্ট সাবধানী, কে জানে কখন ইরান, তুরস্ক, রাশিয়ার ঢেউ আমাদের দেশের তরুণদের মস্তিষ্কে ঠাই করে নেয়, সেজন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। হিন্দুস্থানের সাধারণ লোক এতসব খবর জানেও না, কিন্তু আপনাদের মতো অভিজ্ঞ লোকেরা সবই জানেন, বোঝেন। অতএব দেশে ফিরে আপনাদের চাক্ষুস অভিজ্ঞতার কথা লোককে বলুন, বোঝান, প্রয়োজনে হিন্দুস্থান থেকে ইসলামি জাঠা (মিছিল) ইরানে আসুক এবং সহিংস বা অহিংস যে কোনো উপায়েই ইরানীদের সঠিক পথে আসতে বাধ্য করা হোক।

মোম্বাসাহেব একটু দুঃখ করে বললেন, আমি বোঝালেই কি ইরানীরা বুঝবে? ওরা আমাদের কী বলে জানেন? বলে তোমরা দাস, গোলাম। ওরা আমাদের ঘৃণা করে। তাছাড়া আমাদের কাছে কী এমন হাতিয়ার আছে যা দিয়ে ইরানীদের শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। আমার আর মোম্বা সাহেবের মধ্যে যখন এরকম আলোচনা চলছে, তখন পণ্ডিত এবং আলমদাদ অনেক কষ্টে তাঁদের হাসি চাপছিলেন। মশহদের কোনো তরুণীর সঙ্গে আলমদাদ সাহেবের প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মেয়েটির নাম সাকিনা। আলমদাদ সাকিনাকে বিয়ে করতে চান, সাকিনাও গররাজি নন, কিন্তু আলমদাদের ভাষায়, — কমবখ্ত এদেশের কানুন, এদেশে থেকে এদেশের মেয়ে বিয়ে করো, কিন্তু তাদের দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

আমি বললাম — আলমদাদ সাহেব, আপনি কী সাকিনাকে বলেছেন, যে আপনাকে বিয়ে করে হিন্দুস্থানে গেলে তাঁকে কিভাবে থাকতে হবে। আম্বালায় গিয়ে সাকিনা কী ইউরোপীয় পোশাক, যা এখানে সে পরে তাই পরার অনুমতি পাবে। এখানকার অভ্যাসমতো ওখানেও যদি সে চুল হেঁটে, মুখ খোলা রেখে, জালিদার ওড়নায় মাথা ঢেকে রাস্তায় বের হতে চায় আপনার পরিবার তাতে রাজি হবে?

আলমদাদ একটু স্তব্ধ হয়ে বললেন — সাকিনার জন্য আমি সবই করতে পারি। কিন্তু

আমার ওয়ালিদ (বাবা) সাহেবকে রাজি করানো কঠিন।

আমি বললাম — যদি আপনি আপনার পিতৃদেবকে সেরকম অবস্থার জন্য তৈরি না করতে পারেন, তাহলে জানবেন, হিন্দুস্থানে আসার পর সাকিনা ও আপনার ভালোবাসা সামান্য কয়েকদিনের মেহমান (অতিথি) মাত্র হয়ে থাকবে।

আলমদাদ হোসেন এমনিতে খুব খোসমেজাজের মানুষ। তিন থেকে বারো অক্টোবর এই ন-দশ দিন আমরা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই একসঙ্গে কাটিয়েছি। আমাদের দুজনের মধ্যে এত প্রীতি ও স্নেহ জন্মে গিয়েছিল যে বিদায় মুহূর্তে মনে হয়েছিল কী যেন এক মূল্যবান জিনিস ফেলে যাচ্ছি। আলমদাদ এর আগেও কয়েকবার ইরানে এসেছে। হিন্দুস্থানে কিছুদিন কাটিয়ে আবার ইরানে ফিরে যাবে তারপর সাকিনাকে হিন্দুস্থানে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। ৬ অক্টোবর সন্ধ্যাবেলা আমরা বিজ্ঞান্দ পৌছলাম। বিজ্ঞান্দ বেশ জমজমাট এলাকা। সমুদ্রতট থেকে উচ্চতা ৪৫০০ ফুট জনসংখ্যা বারো হাজার প্রায়। উচ্চতার জন্য এখানে বেশ ঠান্ডা এবং রাত্রিতে লরির মাথার তেরপলে জমা জল সকালে দেখলাম বরফ হয়ে গিয়েছে। শহরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে। মুসাফির খানাটিও থাকার পক্ষে বেশ ভালো, কিন্তু খাওয়া দাওয়া সারা হতেই ড্রাইভারের আদেশ এঙ্কুনি গাড়ি ছাড়বে। মধ্য রাত্রিতে শোবার জন্য একটা গ্রামে গাড়ি দাঁড়াল। ৯ অক্টোবর (সোমবার) সকাল নটার সময় আমরা শোরাব পৌছলাম। খুব ছোট একটি গ্রাম। গ্রামের পাশে সুন্দর একটি ঝর্ণা আছে। ডালিম ও আরও অনেক ফলের বেশ কয়েকটি বাগান এখানে থাকায় সস্তায় ডালিম বিক্রি হচ্ছিল। সকলোই বেশি বেশি করে কিনল। আমিও গোটা পাঁচেক কিনলাম। কিন্তু রাস্তাতেই সব শেষ। সেদিনকার খাওয়া ইত্যাদি শোরাবেই হলো। গরম দুধ পাওয়া যাচ্ছে দেখে লোভ হলো এবং অনেক দিন পর দুধ বুটি খেতে বেশ ভালোই লাগল। এর পরের এলাকাই সিস্তান অঞ্চল, মাটিতে বালির ভাগ বেশি। জলাভাবের জন্য এদিকে লোক বসতিও সামান্য। এক সময় এখানে প্রাচীন শক জাতি লস করত। মরুভূমির মতো বালি আর ন্যাড়া পাহাড় দেখে যখন বিরক্তিকর লাগছিল তখন শুনলাম এখানকার জাফরান নাকি খুব বিখ্যাত। হিং এবং জিরাও এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয় কিন্তু ইরানী খাদ্যে এ দুটোর কোনো ব্যবহার না থাকায় সমস্তটাই হিন্দুস্থানে চালান যায়। এমনকি এগুলো রপ্তানির কাজ যারা করে তারাও জানে না যে হিন্দুস্থানিরা এগুলো দিয়ে কী করে। সন্দের দিকে আমরা জাহেদান পৌছলাম।

জাহেদান — জাহেদানের আগেকার নাম ছিল দুজদাব (জলচোর) এই অপরাধ নামটিকে বদলিয়ে নতুন নাম রাখা হয়েছে জাহেদান। ভালোই করা হয়েছে। জাহেদান শহরটির চারদিকে কয়েকটা ন্যাড়া পাহাড়। গত মহাযুদ্ধের সময় বালুচিস্তান থেকে এপর্যন্ত রেললাইন পাতা হয়েছিল। সেই রেললাইন, স্টেশন ঘর ইত্যাদি এখনও আছে। সে সময় ইরানের অবস্থা ছিল—‘দুর্বলের বউয়ের সকলোই দেবর’ গোছের। আর সেজন্য ইংরেজরা বালুচিস্তান থেকে বিনা বাধায় এ পর্যন্ত রেললাইন পেতেছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল এটাকে আরও ভিতরে নিয়ে মশহদ হয়ে অস্বাভাবিক পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং সেখানে রাশিয়ান রেল পথের সঙ্গে এর সংযোগ থাকবে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী কালে ইরানের মধ্যেও আর লাইন পাতা যায়নি। যদিও মীরজাবা— যেখান থেকে বৃটিশ ভারতের আরম্ভ — সেটা জাহেদান থেকে চব্বিশ-পঁচিশ মাইল। কিন্তু জলাভাবের

জন্য মীরজাবা থেকে ব্রিটিশ ভারতের ভিতরে নেককুন্ডি পর্যন্ত পঞ্চাশ মাইল রেলপথ পরিত্যক্ত হয়েছে। ব্রিটিশরা রেল লাইন পাতার খরচ ইরানের কাছে পরে দাবি করেছিল, কিন্তু ইরান সরকার সে দাবি মানেনি। তাদের বক্তব্য, — আমরা কবে তোমাদের রেললাইন পাততে বলেছিলাম? আবার টাকা না মেটালে ইংরেজ সীমানা থেকে ইঞ্জিন, কামস্কা, ওয়াগন অন্যান্য রেলের যন্ত্রপাতিও এখানে আনা যাবে না। ইংরেজদের জন্য এটা দুর্ভাগ্য যে সীমান্ত অঞ্চলে এত জলাভাব যে রেলপথ বন্ধ করতে হয়েছে অথচ আর একটু এগোলেই ইরানের মধ্যে যথেষ্ট জল আছে। রেললাইন জাহেদানের প্রধান রাস্তা পর্যন্ত এসেছে। জাহেদানের লোক সংখ্যা পাঁচ হাজার। এখানে কয়েকটি ভালো ভালো দোকান আছে। ভারতীয়দের দোকানই এখানে বেশি। এখানকার অধিবাসীরা বালুচ এবং এদের ভাষার সঙ্গে ফারসির কোনো মিল নেই। সম্পূর্ণ বালুচিস্তানই আগে ইরানের অধিকারে ছিল, কিন্তু যখন বুশরা ইরানের কাছ থেকে ককেশাস আর বাকু ছিনিয়ে নেয়, তখনই ইংরেজরাও বালুচিস্তানের অনেকটাই তাদের দখলে নিয়ে নেয়।

মহাযুদ্ধের সময় জাহেদানে ইংরেজ পলটনদের বণ্ডে একটা ছাউনি ছিল। যুদ্ধের সময় ইংরেজরা ইরানের জন্য আশি কোটি টাকা খরচ করেছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে সব কিছু ছেড়ে তাদের চলে যেতে হয়। তখনকার আমলে তৈরি বহু বাড়ি এমনি খালি পড়ে আছে। আর কিছু বাড়িতে ইরানী সৈন্য থাকে। এখানকার গুমরগের (কাস্টমাস বিভাগ) গুদামে কয়েক হাজার বস্তা জিরা, হিং, বাদাম আর পেস্তা পড়ে আছে। এর বদলে ভারত থেকে আসবে চিনি, কাপড়, মোটর-গাড়ি আর ভারি যন্ত্রপাতি। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ জানাল যে ইরানীরা এখন প্রতি পদে পদে তাদের অপমান করে অথচ ইংরেজ সরকার তার প্রজাদের হয়ে কোনো প্রতিবাদই করে না। আমরা জাহেদানে পৌঁছানোর কয়েকদিন আগের ঘটনা, আব্দুল্লা নামের এক ভারতীয় ড্রাইভারকে ইরানী পুলিশ তার কোনো অপরাধের জন্য প্রচণ্ড মারধর করছিল। মারের চোটে বেচারার ড্রাইভারের সারা শরীরে কালশিটে পড়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ী (হিন্দু, শিখ, মুসলমান) খুব হৈচৈ করে। তেহরানে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে একের পর এক টেলিগ্রাম পাঠায়, কিন্তু তারা ভালোমতোই জ্ঞানত যে ব্রিটিশ সরকার কিছুই করবে না। প্রকৃত সমস্যা হলো যে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এখনও ইরানের পুরানো জমানার কথা ভুলতে পারেনি। তখন ইংরেজদের মতো ভারতীয় বানিয়ারাও ভাবত যে তারা ইরানী আইনের উর্ধ্বে। তখন যদি কোনো ভারতীয়, ইরানীদের মারধোর করত, তাহলে বিষয়টাকে সেখানেই কোনোভাবে ধামা চাপা দেওয়া হতো। যেমন ভারতবর্ষে ইংরেজরা ভারতীয়দের মারধর করলে করা হয় ॥ হিন্দুস্থানি ব্যবসায়ীদের আরও দুঃখ যে অনেক ব্যবসা দিনকে দিন তাদের হাত থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইরানের সমস্ত পরিবহন ব্যবস্থাই ছিল ভারতীদের হাতে। তখন ভাবা হতো যে টাকা পয়সার হিসেব রাখা এবং কলকজার ব্যাপার বোঝা ইরানী মাথার কন্ম নয়, কিন্তু এখন পরিস্থিতি পালটেছে। এখন জাহেদান থেকে নেককুন্ডি পর্যন্ত পথ ছাড়া বাকি গোটা ইরানের পরিবহন ব্যবসার মালিক ইরানীরাই। তবে মোটরের যন্ত্রাংশের ব্যবসাটা এখনও ভারতীয়দের হাতেই আছে। ইরানের হিন্দুস্তানি ব্যবসায়ীরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই হতাশ।

দশটাকা দিয়ে নেককুন্ডির জন্য টিকিট কাটলাম। গাড়ির ড্রাইভারের পাশে জায়গা জুটল। বেলা একটায় গাড়ি ছাড়ল। রেললাইন আর সড়ক পথ পাশাপাশি চলেছে, কোথাও কোনো

জলের চিহ্নমাত্র নেই। ভূমি আর পাহাড়ের সেই এক ঘেয়ে দৃশ্য। মাঝে মধ্যে কোথাও কোথাও ঝাউজাতীয় গাছের ঝোপ।

সাড়ে পাঁচটার সময় মীরজাবা পৌঁছালাম। ওখানেই জিনিসপত্রের সঙ্গে পাসপোর্টও দেখা হলো। সমস্ত কিছু সারতে সারতে রাত্রি আটটা বেজে গেলো। গাড়ি ছাড়তে গিয়ে দেখা গেলো গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। আটটা থেকে রাত্রি একটা পর্যন্ত মেরামতির কাজ চলল। ওখান থেকে ইংরেজ চৌকি সামান্যই দূরে, মাত্র মিনিট কয়েকের রাস্তা। ওখানে একটা শুকনো নালা আছে যেটা ইরান আর হিন্দুস্থানের সীমানা। নালার ওপারে ইংরেজ সরকারের চৌকি। রাত্রি দুটোর সময় চৌকির পুলিশ গভীর ঘুমে অচেতন, সে সময় তাকে জাগানো ভালো মানুষের কাজ নয় তা ভালোই বুঝেছিলাম, কিন্তু আমিই বা কী করব? গাড়ির ব্যবহারটিও তো আমার প্রতি যথার্থ হয়নি। যাইহোক, ঘুমটোখাই পুলিশ অফিসার পাসপোর্টে সই করে দিলেন। খরচ বাঁচানোর জন্য ইংরেজ সরকার তার কাস্টমস বিভাগ শুধু সমুদ্র বন্দরেই রেখেছে। স্থল সীমানায় কোনো সীমা শুল্ক বিভাগ (কাস্টমস) না থাকায়, মালপত্র খোলাখুলির ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পাওয়া গেলো। কিছু সময়ও বাঁচল। ১০ অক্টোবর রাত্রিতে ভারতীয় সীমানায় প্রবেশ করলাম।

এক ঘণ্টা চলার পর একটা কুলিদের আস্তানা পেলাম এবং সেখানেই একটা জায়গা দেখে শুয়ে পড়লাম। মরুভূমি অঞ্চল হওয়ার জন্য এদিকে যেমন বাতাসের বেগ তেমনই ঠান্ডা। যুদ্ধের সময়ে তৈরি, এমন অনেক বাড়ি খালি পড়ে আছে। আমি সেই মরুভূমির পথে চলেছি, যে মরুভূমি ভারতবর্ষের শত্রুদের এই পথ দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকতে প্রতিপদে বাধা দিয়েছে, খাইবারের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। একমাত্র শেষ বিজ়েতার ছাড়া বাকি সমস্ত আক্রমণকারীরাই এসেছিল খাইবারের পথ ধরে। কিন্তু কোনো বিদেশি আক্রমণকারীকে সহায়তা করার কলঙ্ক বোলান গিরিপথের গায়ে লাগেনি। তার প্রধান কারণ জলহীন এই মরু প্রান্তর, যেখান দিয়ে আমি এখন চলেছি। মোটরের যুগে যে দূরত্ব ছয়-সাত ঘণ্টায় অতিক্রম করছি, আগে সেই পথ পার হতে ছয়-সাত দিন লাগত। বাতাসের বেগে প্রচণ্ড বালি উড়ছিল। বালির চেয়ে তার মধ্যে কাঁকড়ই বেশি। এ রাস্তায় গাড়িতে চলার সময় একটা ভয় থাকে যে গাড়ির চাকা যেন বালিতে ফেঁসে না যায়। যদি আটকে যায় তাহলে যতক্ষণ না অন্য কোনো গাড়ি আসে ততক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। সৌভাগ্যবশত আমাদের গাড়িটি মরুভূমির বালিতে আটকায়নি। রাত্রি একটার সময় গাড়ি নেককুন্ডি পৌঁছাল।

নেককুন্ডি ব্রিটিশ বালুচিস্তানের মধ্যে ছোট একটা বাজার এলাকা। তিরিশ-চল্লিশটি দোকান আছে। ইরান থেকে আগত যাত্রীদের পাসপোর্ট দেখার জন্য একজন পুলিশ অফিসার এখানে আছে। রেলের মালপত্র এবং যাত্রীদের সংখ্যা আশানুরূপ না হওয়ার জন্য রেল সপ্তাহে একদিন যাতায়াত করে। পঁচিশ মাইল দূর থেকে জল রেলের ট্যাঙ্কারে করে আনতে হয়।

সন্ধ্যাবেলা রেল গাড়ি রওনা হলো। পুলিশের লোক আর এক দফা আমার পাসপোর্ট দেখল। দুপাশের পাহাড়গুলোর উচ্চতা যত এগোচ্ছি ততই যেন বাড়ছে। মাটি বালুকাপূর্ণ। এক স্টেশন থেকে আর-এক স্টেশনের দূরত্ব কোথাও কোথাও পঞ্চাশ মাইল। আশপাশে কোনো জনবসতি নেই। এই রেল পথটির যদি সামরিক দিক থেকে গুরুত্ব না থাকত, তাহলে এই ব্যয়বহুল রেল

তেরিই হতো না। পাহাড় এখানে আরও কিছুটা উঁচু। দুপুর একটা নাগাদ বোলান গিরিপথে প্রবেশ করলাম। (১৯২৬ সালে আমি খাইবার গিরিপথ দেখেছিলাম, তবে স্মৃতি অত সতেজ ছিল না যে উভয়ের তুলনা করি, তবে উভয় গিরিপথেই শূকনো, নগ্ন পাহাড়ের সংখ্যা বোধ হয় সমানই হবে।) অনেক জায়গাতে পাহাড় কেটে সুরঙ্গ তৈরি করতে হয়েছে। চারটের সময় ট্রেন মস্তমরোড স্টেশনে পৌঁছাল। স্টেশনের চারদিকে কোয়েটার ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। ওই ভূমিকম্পে এদিককার সমস্ত বাড়ি ভেঙে গিয়েছিল। রেলস্টেশনের জলের ট্যাঙ্কটি যে লোহার থামের ওপরে বসানো ছিল সেই থামগুলো ধনুকের মতো বেঁকে মাটি স্পর্শ করেছে। বাগানগুলোর চারদিকের কাঁচা ইটের প্রাচীরগুলোকে কেউ যেন আঁস্টে করে মাটিতে শুষিয়ে দিয়েছে। ভূমিকম্প হয়েছিল রাত্রি তিনটের সময় সে জন্য বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সঙ্গে বেলা স্বেজন্দ স্টেশনে পৌঁছলাম। এখানেই কোয়েটা যাবার গাড়ি বদলাতে হয়। এখনও বাইরের যাত্রীদের কোয়েটা শহরে যাবার অনুমতি নেই। আমিও এখানেই গাড়ি বদল করলাম।

নেককুন্ডি থেকেই আমি লাহোরে আমার বন্ধু ডাক্তার লক্ষণস্বরূপকে তার করেছিলাম। ১২ অক্টোবর সঙ্গে সওয়া সাতটা নাগাদ যখন লাহোর পৌঁছলাম, তখন ডাক্তার সাহেব স্টেশনে হাজির ছিলেন। লাহোর স্টেশনে একদিকে যেমন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, আর অন্যদিকে অনেক দিনের সহযাত্রী বন্ধু পণ্ডিত মস্তরাম শর্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ হলো। সংযোগ আর বিয়োগ, এটাই তো পৃথিবীর প্রকৃত পরিচয়।

ইরানে দ্বিতীয় বার (১৯৩৭ খৃঃ)

দিল্লী পৌছে বেশ গরম অনুভব হলো। যদিও এদিকে ওদিকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে। তবে ১৭ সেপ্টেম্বর যখন কোয়েটা রওনা হই, তখন তাপমান থানিকটা নীচে নেমে গিয়েছে।

ভাতিন্দা পার হতেই, মাঠঘাট শুকনো, চারদিকে এত ধুলো উড়ছিল যে বন্ধ দরজা জানালা ভেদ করে রেলের কামরার মধ্যে ধুলোর ঝড় বইয়ে দিলো। দিল্লিতে তাপমান থানিকটা নামলেও এখানে আবার তার তীব্রতা অনুভব হচ্ছিল। মধ্যরাত্রে ট্রেন সিঙ্কুনদ পার হলো। এ অঞ্চলের গরমের খ্যাতি ভারত জুড়ে, তাই মনে ভয় ছিল, কিন্তু বাস্তবে তেমন অসহ্য লাগেনি। সাড়ে এগারোটায় কোয়েটা পৌঁছালাম। কোনো একটা হোটেলের খোঁজ করার কথা ভাবছি, এমন সময় দুজন আর্থ সমাজের কর্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। পণ্ডিত ইন্দ্রজী দিল্লি থেকে আমার সম্বন্ধে তাঁদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন।

দুরছর আগের ভূমিকম্পে কোয়েটা শহর প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দুরছর পরও শহরের সর্বত্রই সেই ধ্বংসের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। নতুন করে বাড়ি ঘর খুব সামান্যই তৈরি হয়েছে। সরকারও চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে কম্পন সহ্য করতে পারে লোকে এমন বাড়ি বানায়। যদিও কোয়েটার চারদিকেই গাছপালাশূন্য ন্যাড়া পাহাড়ের মেলা, তবুও আশ্চর্যের বিষয় যে এখানে মাটির নীচে অল্প গভীরতাতেই জল পাওয়া যায় এবং তার স্বাদও মিষ্টি। এখানকার মানুষজনও এই সহজপ্রাপ্ত জলের ভালো উপযোগ করছে। যার জন্য এখানে মাইলের পর মাইল জুড়ে মেওয়ার বাগান দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রতট থেকে কোয়েটার উচ্চতা ৪০০০ ফুট, সেজন্য গরমের দিনেও কোয়েটাতে বেশ ঠান্ডা ভাব থাকে। মাটির তলা দিয়ে খাল নিয়ে যাওয়া ইরানের পদ্ধতি। জমি সমতল না হয়ে বন্ধুর হওয়ায় ভূগর্ভস্থ খালের প্রবাহ খুব স্বচ্ছন্দ থাকে। এই ধরনের খালের উপযোগ কোয়েটা থেকেই শুরু হয়ে যায়।

কোয়েটা থেকে নেককুন্ডির দূরত্ব তিনশো মাইল। যে রাস্তায় রেল চলাচল করে তার চারপাশ জনবসতি হীন। সাড়ে এগারোটায় ট্রেন ছাড়ল। প্রথমে যে পথে এগিয়ে ছিল, সেই পথেই অনেকটা পিছিয়ে স্পেজন্দ পর্যন্ত এল, তারপর নেককুন্ডির পথে ঘুরল। আমি ইন্টারক্রাসের যাত্রী ছিলাম। এখানে সেরকম ভীড় না থাকায় বসার জায়গা পেয়েছিলাম। এই অঞ্চল বালুচিস্তানের মধ্যে পড়ে, তাই লোকজনের ভাষাও বালুচি।

এই গাড়িতেই অগ্রবর্তী স্টেশনগুলোর রেল কর্মচারী ও কুলিদের মাইনে, মাসের রসদ এবং সপ্তাহের জল যাচ্ছিল এবং প্রতিটি স্টেশনে সেগুলো বন্টন করা হচ্ছিল। যার জন্য গাড়ি প্রচণ্ড থামতে থামতে এবং ধীর গতিতে যাচ্ছিল। দুটো স্টেশনের দূরত্ব কোনো কোনো জায়গায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত। এবং স্টেশন ছাড়াও লাইনের ধারে ধারে অনেক জায়গায় লান্ডি (কুলি আবাস) তৈরি হয়েছিল, যারা রেললাইন দেখাশোনা ও মেরামতির কাজ করে। ট্রেন সেই জায়গাগুলোতেও থামছিল। আড়াইটার সময় (২১ সেপ্টেম্বর) নেককুন্ডি পৌঁছালাম। যাত্রী এবং মালপত্র তেমন বেশি না থাকায়, এই পথে রেল সপ্তাহে একদিন করে (সোমবার) চলে। নেককুন্ডি থেকে ব্রিটিশ ভারতের শেষ সীমা আরও পঞ্চাশ মাইল দূরে। এই পঞ্চাশ মাইল, রেল লাইন পাতা আছে স্টেশন ঘরও আছে, ওখান থেকে ইরানের ভেতরে ইংরেজরা যে রেললাইন পেতেছিল, জাহেদান

পর্যন্ত, তাও আছে। শাহ রজা ইরানের শাসনভার হাতে নেবার পর ইরানের অভ্যন্তরে রেল চালাবার অনুমতি ইংরেজদের দেননি। সেজন্য যুদ্ধের প্রয়োজনে যে লাইন পাতা হয়েছিল, তা তেমনই পড়ে আছে অব্যবহৃত অবস্থায়। নেককুন্ডি থেকে ইংরেজ সীমানা পর্যন্ত অঞ্চলে জল পাওয়া যায় না, সেজন্য গাড়ি নেককুন্ডি থেকে আর এগোয় না। নেককুন্ডিতেও জল আনতে হয় একশো মাইল দূর থেকে।

নেককুন্ডি থেকে যেতে হবে লরিতে চেপে। ছ টাকা দিয়ে জাহেদান পর্যন্ত টিকিট কাটলাম। সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন কোয়েটার সর্দার রাম সিংহ, আর লখনৌর হাদী হোসেন সাহেব ও তাঁর পরিবার। সেই সময় ইরানী মুদ্রার মান অত্যন্ত পড়ে গিয়েছিল। নব নির্মাণের জন্য ইরানকে প্রচুর ভারি যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আনাতে হচ্ছিল, রপ্তানির পরিমাণ সে তুলনায় অনেক কম ছিল। যার ফলে বিদেশি মুদ্রার — টাকা, পাউন্ড ইত্যাদির — মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ইরান সরকার মুদ্রামানকে যথাসম্ভব স্থিতিশীল রাখার জন্য আইন প্রণয়ন করেছে, যার ফলে বিদেশিরা একমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক থেকেই তাদের বিদেশি মুদ্রা ইরানী মুদ্রায় বদল করতে পারবে। ব্যাঙ্ক থেকে যেখানে এক টাকার বদলে ছয় রিয়াল পাওয়া যায় সেখানে নেককুন্ডিতে দশ রিয়াল পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিল। ইরানের ভেতরেও কিছু লোক লুকিয়ে চুরিয়ে বিদেশি মুদ্রার বেআইনি বেচাকেনা করে। হিন্দুস্থান থেকে লুকিয়ে টাকা নিয়ে গিয়ে এক টাকার বদলে দশ-বারো পর্যন্ত রিয়াল রোজগার করে। সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙালে টাকায় ছ আনা লোকসান হয়। এক দেড়শো টাকার ইরানী মুদ্রা সীমান্ত থেকে নিয়ে ইরানে প্রবেশ করতে কোনো বাধা নেই। আমার কিছু সহযাত্রী ওরকমই করল, কিন্তু আমি নিজেকে কোনো বেআইনি কাজে জড়াতে চাইনি।

গাড়ি রাত নটায় ছাড়ল। বোলান পাস থেকেই গাছপালা শূন্য বৃক্ষ পাহাড় আর মরুভূমির মতো বিস্তৃত সমতল ভূমি। কোথাও কোনো লোকজন নেই। মাটি খুব বেশি রকমই শুকনো, তার মধ্যে ছয়-সাত টনের বড়ো বড়ো ছ-চাকার লরি হরদম যাতায়াত করে রাস্তাকে একেবারে ধূলিধূসর করে দিয়েছে। রাস্তায় কয়েকটি লরিকে খারাপ হয়ে পড়ে থাকতেও দেখলাম। সাধারণ যাত্রী বহনকারী লরির রাত্রিতে এপথে চলা বিপজ্জনক। যাইহোক, রাত্রি বারোটা পর্যন্ত একটানা লরি চলল। বাতাস খুব জোরে বইছিল এবং সেজন্য ঠান্ডাও বোধ হচ্ছিল। আমরা একটা পরিত্যক্ত কুলি ব্যারাকের উঁচু দেয়ালের আড়ালে শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে আবার রওনা হলাম। ভারতীয় সীমানার শেষ চৌকি কিন্না সফেদের তিন মাইল আগে লরির তেল গেল ফুরিয়ে। লরি ড্রাইভার এই আশায় বসে রইল, রাস্তায় যে কোনো দিক থেকে অন্য কোনো লরি এলে, তার কাছ থেকে খানিকটা পেট্রল চেয়ে নেবে। ওখানে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করার থেকে হেঁটে কিন্না সফেদে চলে যাওয়াটা আমার কাছে শ্রেয় মনে হলো। নেককুন্ডির মতো এখানেও পাসপোর্ট দেখালাম। এখানে ভারত সরকারের কোনো সীমা শৃঙ্খল বিভাগ না থাকায়, মালপত্র খুলে দেখা হয় না। তবে কর্তব্যরত পুলিশের যদি কোনো সন্দেহ হয়, তাহলে সে জিনিসপত্র খুলে দেখতে পারে। কিন্না-সফেদের দরজার কাছেই একটা শুকনো নালা, যেটা ভারত ও ইরানের মধ্যকার সীমানা। এখান থেকে ইরানের সীমান্ত চৌকি মীরজাবা শহর দেখা যায়, দূরত্ব দু-আড়াই মাইল হবে। ওখানে কিন্তু ইরানের সীমা শৃঙ্খল বিভাগের (গুমরগ) দফতর আছে। আমরা এগারোটায় ওখানে পৌঁছলাম।

গুমরগের দফতর, কর্মচারীদের থাকার জায়গা, সবই ইংরেজ সরকারের পয়সায় যুদ্ধের সময়ে তৈরি হয়েছিল। রেল স্টেশন, জলের ট্যাঙ্ক সবই ইংরেজরা বানিয়েছিল, কিন্তু এখন এসব কিছুই মালিকানা ইরান সরকারের। মনে হয় না ইরান সরকার এজন্য কোনো টাকা পয়সা ইংরেজদের দিয়েছে। অবশ্য না দিলেও বলার কিছু নেই। ওগুলো বানাবার সময় তো ইংরেজরা ইরানের অনুমতি নেয়নি, তাহলে কেন তারা তার দাম দিতে যাবে।

মীরজাবাতে আমাদের প্রত্যেকের বাস্প প্যাঁটা খুলে দেখা হলো। সঙ্গে কি পরিমাণ বিদেশি ও ইরানী মুদ্রা আছে, তার লিখিত হিসেবও নেওয়া হলো। মাসুল ধার্য হতে পারে এমন কোনো জিনিস আমার কাছে ছিল না, তবে আমার দুটো ট্রান্সই বইয়ে ঠাসা ছিল। আমি তো ভেবেছিলাম বইকে কেন্দ্র করে হয়তো প্রশ্ন উঠবে, কিন্তু ওখানকার কাস্টমস অফিসারটি অত্যন্ত ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এত বই দেখে আমার পেশা জিজ্ঞেস করলেন এবং আমি লেখক শূনে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমার মালপত্র খুঁটিয়ে না দেখেই ছেড়ে দিলেন। অন্য যাত্রীদের চেয়ে অনেক আগেই গুমরগ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম। গুমরগের পাশের বাড়িটিতে এক ইরানী দম্পতি একটা হোটেল খুলেছেন। দুবছর আগে আমি এই পথেই ভারতে ফিরেছিলাম, তখন ইরানী পুরুষদের হ্যাট কোট এবং মেয়েদের ইওরোপীয়ান পোশাক পরতে দেখেছি, তবে মেয়েরা মাথায় একটা কালো চাদর রাখত, যদিও মুখ তখনও খোলাই থাকত। কিন্তু এই মাঝবয়সি ইরানী মহিলাকে দেখলাম মাথায় ওড়না নেই এবং অত্যন্ত সাবলীলভাবে অতিথি আপ্যায়নের কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হলো দুবছর নয়, বহুকাল ধরেই তিনি পর্দার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন।

খাওয়া দাওয়ার পর খানিকটা বিশ্রাম নিলাম। নেককুন্ডি থেকে কিন্না সফেদ পর্যন্ত রাস্তা আর এই মীরজাবা থেকে ইরানের ভিতরে যাবার রাস্তার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এদিককার রাস্তা অত্যন্ত মজবুত, প্রশস্ত এবং নিয়মিত মেরামতি কাজের তত্ত্বাবধানে থাকে। ধুলোর পরিমাণও কম। এক জায়গায় এসে লরির টায়ার ফাটল। ব্যাস, খামোখা দুঘণ্টা বসে থাকার শাস্তি ভোগ করলাম। টায়ারটা যে ধরনের ফাটা এবং ক্ষয়া, তাতে ভয় হলো ওটাকে আদৌ সারানো যাবে কিনা এবং আমাদেরও ওখানেই থেকে যেতে হবে কিনা। যাহোক করে টায়ার সারিয়ে রাত্রি দশটায় আমরা জাহেদানে পৌঁছালাম। প্রথমেই যেতে হলো শুল্ক বিভাগের (গুমরগ) অফিসে। অত রাত্রিতে সেখানে কোনো পদস্থ কর্মচারী না থাকায় সাধারণ সেপাইরা যাত্রীদের ভয় দেখিয়ে কিছু আদায়ের ফিকিরে ছিল। তারা আমার আর সর্দার রাম সিংহের বাস্প নিয়ে পড়ল। সর্দার রামসিংহের বাস্পে অনেক জামা কাপড়, কোট, প্যান্ট ধোয়া এবং ইস্তিরি করে পাট করা অবস্থায় ছিল। তারা বলল এর জন্য মাসুল দিতে হবে। বাস্প খোলা রেখে কোথাও যেতেও পারছি না। অবশেষে সর্দার সাহেব পাঁচ রিয়ালের ভেট চড়ালেন, আমরাও জাহেদানে টোকার অনুমতি পেলাম। সর্দার রাম সিংহের এক পরিচিত ভারতীয়ের ওখানে বাড়ি আছে, আমরা সেখানেই উঠলাম।

জাহেদান — দুবছর আগে যে পথ ধরে ইরান থেকে ভারতে ফিরেছিলাম, এবারও সেই পথেই ইরানে ঢুকতে চলেছি। এজন্য পথের বিবরণ দিয়ে পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমি প্রধানত সেই

বিষয়ের কথাটি উল্লেখ করতে চাই, যা বিগত দুবছরে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনকে বুঝতে সাহায্য করবে। মহাযুদ্ধের সময় একদিকে যেমন জাহেদানে ইংরেজ পর্যটনের ছাউনি ছিল তেমনই অন্যদিকে প্রচুর সংখ্যায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি ছিল। তখন দুজদার (জাহেদান) শহরকে কোনো ভারতীয় শহর বলেই মনে হতো এবং এই শহরের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণভার ছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাতে। এখনও অনেক বড়ো বড়ো দোকানের মালিক ভারতীয়রা। বর্তমান ইরান সরকারের নীতি হলো স্বদেশি ব্যবসায়ীদের সবরকম সাহায্য করা এবং বিদেশি বণিকদের সাহায্য না করা। এর ফলে ভারতীয় ব্যাপারীরা পিছিয়ে পড়ছে এবং তাদের শূন্য স্থানে আসছে ইরানীরা। গতবার জাহেদানে রাস্তার পাশ দিয়ে ইংরেজদের পাতা রেল লাইন চলে যেতে দেখেছিলাম, এবার দেখলাম, লাইন তুলে ফেলে রাস্তা চওড়া করা হয়েছে। রাস্তার দুপাশের খালি জায়গাতে প্রাচীর তুলে দিয়ে তাতে সুন্দর রং করে দেয়া হয়েছে। শহরে একটা বড়ো রেস্তোরাঁও খোলা হয়েছে। যেখানে কেবল পরিষ্কার টেবিল চেয়ারই নেই, উপরন্তু একটা বড়ো হল ঘরে দুটো বিলিয়ার্ড টেবিল রাখা হয়েছে। রেস্তোরাঁয় আসা লোকজন খানিকক্ষণ বিনা পয়সায় বিলিয়ার্ড খেলে যেতে পারে। রাস্তায় প্রচুর ইরানী মহিলাদের ঘুরে বেড়াতে দেখলাম, সকলের পরনেই ইওরোপীয় পোশাক, স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুল ইউনিফর্ম পরে রাস্তায় চলেছে। এখানে পাঠশালাকে আগে বলা হতো মাদ্রাসা। মাদ্রাসা শব্দটি যেহেতু আরবি সে জন্য তার বদলে দবীরস্তান কথাটা ব্যবহার হচ্ছে। আগে মিউনিসিপ্যালিটিকে বলা হত ওয়ালদিয়া, এখন বলা হয় শাহদারি।

পাসপোর্ট পরীক্ষার জন্য শহবানীতে (কোতোয়ালি, পূর্ব নাম নজমিয়া) যেতে হলো। এখানকার অফিসারও খুবই ভদ্র। জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে চাও খাওয়ালেন। এখানেই জানলাম যে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে শ্রব্বার এখনও চালু আছে, তবে পরীক্ষামূলকভাবে কোথাও কোথাও রবিবারকে ছুটির দিন ঘোষণা করে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে জনমত অধিকাংশই রবিবারের পক্ষে। যদি ইরানীদের জুম্মার নামাজের প্রতি সেরকম আগ্রহ থাকত, তাহলে তারা স্থিতাবস্থা ভাঙার চেষ্টার বিরোধিতা করত। আরও শুনলাম, জাহেদানের কাছ থেকে একটা খনিজ তেলের পাইপ লাইন বেরিয়ে সমুদ্রের কাছে যাবে। বালুচিস্তান থেকে কিছু দূরে চাহেবাহার এক প্রাকৃতিক সমুদ্র বন্দর। পাইপলাইন ওই বন্দর-শহর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে শহরটিকে আরও বিকশিত করা হবে। পাইপ লাইনের পাশাপাশি একটি সড়ক পথও থাকবে। এখনও পর্যন্ত হিন্দুস্থানের সঙ্গে যা ব্যবসা-বাণিজ্য হয় তার সবটাই হয় জাহেদানের পথে। পূর্ব প্রান্তের অন্য বিদেশি রাষ্ট্রও হিন্দুস্থানের বন্দর অথবা স্থলপথে জাহেদান থেকে তাদের মালপত্র আনা নেওয়া করে। বন্দর শহর চাহেবাহারের পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে জাহেদান অনেকাংশে তার কৌলীন্য হারাবে। তখন মনে হয় কোয়েটা নেককুন্ডি রেলপথটাও লোকসানের ব্যবসা হয়ে উঠবে। বাণিজ্যের জন্য না হলেও, সামরিক প্রয়োজনের জন্যই ইংরেজরা লোকসানে চলা রেললাইনটাকে রেখে দেবে।

২৩ সেপ্টেম্বর যাওয়ার জন্য টিকিট কাটলাম, কিন্তু যাত্রী সংখ্যা কম হওয়ায়, সেদিন গাড়ি ছাড়ল না। ২৪ তারিখে বেলা সাড়ে তিনটেতে মোটর বাস ছাড়ল। সরকারের তরফ থেকে গাড়িতে নির্দেশনামা ছিল যে তেইশজন যাত্রী বসবে, কিন্তু গাড়িতে বত্রিশ জন যাত্রী ঠাসা হয়েছিল। সব যাত্রীর কাছ থেকে একই হারে ভাড়াও নেওয়া হয়নি। আমি দিয়েছি ১২ তুমান (১২০ রিয়াল

= বারো টাকা), হাদী হুসেন সাহেব দিয়েছেন ১০ তুমান। আর সাতজন তীর্থযাত্রীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল ৭ তুমান করে। গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের হলো। খানিকটা গিয়ে পুলিশ টোকিতে দাঁড়াল। তারপর সেখানে পাক্কা দেড় ঘণ্টা বসে থাকতে হলো। পুলিশের লোক আরেক দফা পাসপোর্ট দেখল, কিন্তু গাড়ির মধ্যে যে সরকারি নিয়ম না মেনে বেশি যাত্রী তোলা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করল না। বোধ হয় ড্রাইভার তাদের এই উচ্চবাচ্য না করার মূল্য অন্যভাবে মিটিয়েছিল। তাছাড়া পুলিশেরা হামেশাই এই সব গাড়িতে বিনা পয়সায় যাতায়াত করে থাকে।

লখনৌর হাদী হুসেন সাহেব সপরিবারে মশহদ শরীফ ও কারবালার তীর্থদর্শনের অভিলাষে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর সত্তর বছর বয়সের বন্ধা মা, স্ত্রী, দুই ছেলে মেয়ে ছাড়াও একটি তিন মাসের শিশু। সাত দিনের মোটর যাত্রার ধকল, ঠান্ডা ইত্যাদি অত অল্প বয়সের শিশুর সহ্য হবে কিনা, সেটা চিন্তার বিষয় ছিল। তার ওপরে শিশুটি অসুস্থও ছিল। সারা রাত ধরে গাড়ি চলল। পথে এক জায়গায় শিশুটির চোখ উল্টে গেলো, আর তা দেখে তার মা কান্না শুরু করল। গাড়িকে থামানো হলো। আমি শিশুর নাড়ি দেখলাম, ক্ষীণ হলেও সাড়া পেলাম। বাচ্চাটিকে ভালো করে কাপড়ে জড়িয়ে তার মায়ের কোলে শুইয়ে দেওয়া হলো। ২৫ সেপ্টেম্বর বেলা একটায় বিজর্দ পৌঁছলাম। ড্রাইভারটি মানুষ হিসেবে ভালো ছিল। সে বাচ্চাটার অবস্থা দেখে সেদিনের জন্য বিজর্দে থেকে যেতে রাজি হলো। এখানে ব্রিটিশ ভাইস কনসালের অফিস আছে। বর্তমান ভাইস কনসাল পেশোয়ারের এক পাঠান ডাক্তার। আমার অনুরোধে তিনি সরাইতে এসে শিশুটিকে দেখলেন এবং ওষুধ পথ্য দিলেন।

এক পাহাড়ি টিলার সানুদেশ থেকে আরম্ভ করে, চূড়া পর্যন্ত ছড়ানো বিজর্দ শহর। জনসংখ্যা দশ হাজার। কারনাত প্রদেশের গভর্নরও এখানে থাকেন। সোবিয়ত সরকারের মতো ইরানেও প্রচুর রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প উদ্যোগ গড়ে উঠেছে। আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সবটাই রাষ্ট্রের হাতে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও তার যথেষ্ট দখলদারি রয়েছে। ইরানে অনেক জায়গাতে গমের প্রচুর ফলন হয় এবং সেখানে গমের দামও খুব সস্তা, আবার যে সমস্ত অঞ্চলে গমের ফলন কম কিংবা নেই, সেখানে খুবই দুর্ভূল্য। এর ফলে সাধারণ অল্পবিত্ত লোকজন খুব অসুবিধা ভোগ করে। এই অবস্থা দূর করার জন্য, যেখানে গমের ফলন বেশি, সেখানকার চাষিদের কাছ থেকে চলতি বাজার দামে তাদের বিক্রয়যোগ্য গমের সমস্তটাই কিনে নেয়, তাতে কৃষকেরা সেই দামই পেয়ে যায় যা সে খোলা বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করলে পেত, এবার ফসলের পাইকাররা যে লাভ রেখে আটা বিক্রি করে, সেই দামেই যদি সরকার আটার ব্যবসাতে নামে, তাহলে কৃষি জমির কর তো তার থাকছেই উপরন্তু নির্দিষ্ট দামে সারা দেশে আটা বিক্রিও করতে পারবে। সরকার এজন্য সমস্ত গম ১৫-১৭ তুমানে এক সলবার (আট মন) হিসেবে কিনে নেয় তার ওপরে পাঁচ তুমান লাভ রেখে সারা দেশে একই দামে বিক্রি করে। তবে দূরত্বের জন্য কোথাও কোথাও পরিবহন খরচ এত বেশি পড়ে যাচ্ছে যে সরকারকে এখন ভর্তুকি দিয়ে এই ব্যবসা চালাতে হচ্ছে। শহরে ও গ্রামে আটা বিক্রির জন্য আধা সরকারি দোকান আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু সর্বত্র এই বন্টন ব্যবস্থা এখনও সুষ্ঠুভাবে চালু করা যায়নি তাই মাঝে মধ্যে গ্রামে ও শহরে বুটির আকাল দেখা দেয়। তখন গমের আটার সঙ্গে অন্য কিছু মেশাবার অভিযোগও শোনা যায়। সোবিয়তে যেহেতু কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই, সেজন্যই ওখানে ব্যক্তিগত লাভের জন্য ওধরনের অপরাধ কেউ করে না। তার

শাসনব্যবস্থাও সেভাবেই তৈরি। কিন্তু একটি পুঁজিবাদী দেশে সোবিয়তের কর্মসূচিকে যোলো আনা সফল করা খুব কঠিন। মনস্বী শাহকে তাই প্রতি পদে পদে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তিনি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দেশের লোককে সুখী ও দেশকে সমৃদ্ধ দেখতে চান। কিন্তু রাতারাতি ধনী হবার লোভে একশ্রেণির সরকারি আমলা এমনকি কিছু মন্ত্রীরাও শাহর সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা করছে না। তোষামোদের বাজারই গরম। শাহর সামনে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার সাহস পর্যন্ত কারও মধ্যে নেই। পহ্লবী (কাস্পিয়ান সাগরের তটে ইরানের বন্দর শহর) থেকে তেহরান পর্যন্ত যে রেললাইন তৈরি হয়েছে তার জন্য একটা ব্রিজ তৈরির দরকার হয়। একজন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আরও কিছু টাকা খরচ করে রেল ব্রিজের সঙ্গে একটা সড়ক ব্রিজ তৈরি হোক, তাছাড়া ওখানে নদীর ওপরে একটা ব্যারাজ বাঁধা হোক যার ওপর দিয়ে দুটো ব্রিজই যেতে পারবে আবার ব্যারাজের জলে আশপাশের চাষের জমিতে সেচের কাজও হবে। আধিকারিক পরামর্শ শুনে বলল, শাহ ওখানে কোনো সড়ক সেতু তৈরি করতে চান না, কারণ সড়ক সেতু হলেই লরিওলারা রেলের সঙ্গে পাল্লা দেবে এবং ওই অঞ্চলে সেচের অন্য অনেক উপায় আছে। কিন্তু দুবছর যেতে না যেতেই তিনটে জিনিসেরই দরকার পড়ল এবং দ্বিগুণ আড়াইগুণ টাকা খরচ করে সড়ক সেতু এবং একটা ব্যারাজ তৈরি করতে হলো। শাহকে প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতেন, কিন্তু আসল কথা হলো শাহর সামনে কোনো কথা বলার সাহসই কারও নেই।

একটা দিন ও রাত বিশ্রাম করে শিশুটি অনেকটাই ভালো হয়ে উঠল। ২৬ সেপ্টেম্বর আমরা আবার রওনা হলাম। পথে কায়িন শহর পড়ল। আগে গভর্নর এখানেই থাকতেন, এখন বিজ্ঞান্দে থাকেন। এখানকার জাফরান বিখ্যাত। কায়িনে পৌঁছানোর কিছু আগেই গাড়ির টায়ার ফাটল। ইরানে অধিকাংশ মোটর ড্রাইভারই খোদার ভরসায় গাড়ি চালায়, সঙ্গে এক-অধটা নতুন টায়ার টিউব রাখার প্রয়োজনও অনুভব করে না। তার ওপরে ড্রাইভারের কাছে কোনো অতিরিক্ত টায়ারও নেই। জানি না ড্রাইভার কিভাবে জোড়াতালি দিয়ে গাড়ি চালান, কিন্তু মাইল পনেরো চলে আবার যে কে সেই অবস্থা। বাধ্য হয়ে একটা গ্রামের মধ্যে আমরা আশ্রয় নিলাম। এখন গাড়ির ছ-খানা টায়ারের মধ্যে দুখানা সম্পূর্ণ অকেজো। রাস্তার অন্য কোনো গাড়ি থেকে টায়ার ধার করার আশায় ড্রাইভার বসে রইল। কিন্তু সেখানেও তাকে নিরাশ হতে হলো। আসলে সকলের অবস্থা তো প্রায় এক। অবশেষে পিছনের জোড়া টায়ার থেকে একটা করে খুলে সামনে লাগিয়ে কোনো মতে গাড়ি চলল। এতে আমাদের একটা লাভ হলো যে গাড়ির ওজন কমানোর জন্য বেশ কিছু যাত্রীকে অন্য গাড়িতে চালান করা হয়েছিল।

মেহনা বেশ বড়ো একটা বসতি। এখানে দবীস্তানে-এ-জামী নামে একটা স্কুল আছে। স্কুলে ছেলে ও মেয়েরা একই সঙ্গে পড়ে। হাদী হুসেনের দশ বছরের মেয়ে তার সাদা লখনৌভী পরে আমাদের সঙ্গে স্কুলগেটে এল। কোট প্যান্ট পরা ছেলে এবং চুল ছোট করে ছাঁটা মেয়েদের কাছে সে একটা দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে গেলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার চারপাশে একদঙ্গল ছেলেমেয়ের ভীড় জমে গেল। প্রথমে তারা আগাগোড়া ঢাকা সাদা কাপড়ের ওপরের দিকে কাটা দুটো ফুটোর মধ্য দিয়ে বেচারি চোখ দুটোকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। কেউ কেউ আঙুল বাঁকিয়ে তাকে

বিদ্রূপ করতে লাগল। সে বেচারী তো হিন্দুস্থানের মেয়ে, ওখানে তাকে দশ বছর বয়সেই বোরখা পরতে হয়। সেটাই রেওয়াজ। সে কোনোমতে তার বোরখা সহ পালিয়ে একেবারে গাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল। দুপুরের পর আমরা তুর্ভত-হায়দারিতে প্রায় দুঘণ্টার জন্য থামলাম। আমাদের সঙ্গের তীর্থযাত্রীরা এখানকার অনেকগুলো জিয়ারত গাহতে কবর জিয়ারত করতে গেলেন। এক স্থানীয় ভদ্রলোকের কাছ থেকে তুর্ভত-হায়দারি কথাটার ব্যাখ্যা জানলাম। এখানে হজরত আলির (হায়দার) সমাধি (তুর্ভত) আছে। আসল ঘটনা হলো হজরত আলির জন্ম হয়েছিল আরবে কিন্তু মৃত্যু হয়েছিল অন্যত্র। তিনি যতদূর পর্যন্ত যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন সে পর্যন্ত কোনো জায়গাতে তাঁর কবরের সন্ধান পাওয়া যায়নি। অতএব যেসব দেশে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে সকলেই হজরত আলির কবর তাদের দেশে আছে বলে দাবি করে। এটিও সেরকম দাবিরই একটি।

মশহদ শহরের গুমরগে গিয়ে যখন গাড়ি থামল তখন সন্কে হয়ে গিয়েছে। আমি এর আগে মশহদ শহরকে ভালো করে দেখেছিলাম, সেজন্য এখানে আবার থাকার কোনো ইচ্ছে ছিল না। গুমরগের কাছেই তেহরানগামী একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভার আমাকে তেহরান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য আট তুমান চাইল। আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। ড্রাইভারটি আধা হাবসি, এবং ব্যবহার বেশ ভালো। খাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়ানো ছাড়া সারা রাত ধরে গাড়ি চলল। পরদিন (২৮ সেপ্টেম্বর) রাত্রি আটটায় দমগাল পৌঁছলাম। রাস্তায় গাড়ি কয়েকবার চলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। দমগান একটি পুরানো বসতি। এখানে ইমামজাদা জাফরের তৈরি একটি মসজিদ আছে যার গম্বুজের চিত্রকারিতার সঙ্গে সারনাথের ধমেশ-স্তূপের চিত্রকারিতার অনেক মিল আছে বলে মনে হলো। নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা আর তার মধ্যে কিছু আরবি শব্দ উৎকীর্ণ।

২৯ সেপ্টেম্বর দুপুরে পৌঁছলাম সেমনান। দুবছর আগের দেখা সেমনানকে এখন প্রায় চেনাই যায় না। কোথায় সেই এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, বাড়িতে ভাঙা দেয়াল, নোংরা সবু গলি। তার জায়গায় এখন পাথর বাঁধানো চওড়া রাস্তা, গলি ঘুঁজি প্রায় অদৃশ্য। হাজার খানেক লোক বসতির ছোট একটি শহর সেমনান। রাস্তার ধারে আমেরিকান তেল কোম্পানির বিশাল বাড়ি। সেমনানে যেদিন থেকে তেল আবিষ্কৃত হয়েছে, সেদিন থেকে তার ভাগ্য খুলে গেছে। নিজেদের তেল নিষ্কাশনের আধুনিক প্রযুক্তি না থাকায় শাহ তাকে যথেষ্ট লাভ রেখে এক আমেরিকান কোম্পানিকে ইজারা দিয়েছেন। এই এলাকার উন্নয়নের কাজও তারাই করছে। এরপর আমাদের রাস্তা গেছে এক বড়ো সমতল ভূমির ওপর দিয়ে যার চারদিকেই প্রায় পাহাড়। যেতে যেতে হঠাৎই গাড়িতে একটু হালকা ধরনের বাঁকুনি অনুভব করলাম। চমকে দেখি গাড়ির ডানদিকের একটা চাকা খুলে গড়িয়ে যাচ্ছে। গাড়ি ব্রেক কষে, থেমে গেলো। নেমে দেখলাম ডান দিকের সামনের চাকা খুলে গেছে। ঘটনাটা কিছু আগে বা কিছু পরে ঘটলে আমাদের সকলকে নিয়ে গাড়ি খাদে গড়াত কিন্তু এ জায়গাটা সমতল ভূমি হওয়ায় এবারকার মতো বেঁচে গেলাম। ড্রাইভার ওস্তাদ লোক ছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে চাকা ঠিক করে ফেলল। বেলা তিনটের সময় তেহরান থেকে কাম্পিয়ান সাগরের দিকে যাওয়া রেল লাইন পার হলাম। পোল্যান্ডের একটি সংস্থা এই রেললাইন পাতার বরাত পেয়েছিল। এপথে এখন রেল যাতায়াত করে তবে যথেষ্ট পরিমাণ মাল ও যাত্রীর

অভাবে রেলগাড়ি নিয়মিত চলে না। দিনের আলো থাকতে থাকতেই সবচেয়ে বড়ো পাহাড়ি জোতটাকে পার হলাম। সন্কেবেলা গাড়ির ইঞ্জিনের পাখা খারাপ হয়ে গেলো। আর সেটা ঠিক করতে রাত একটা বেজে গেলো। গাড়ি সারিয়ে আবার চলা শুরু হলো এবং ৩০ সেপ্টেম্বর তেহরানে পৌঁছলাম। দুবছর আগে এসে খয়্যাবান চিরাগবর্কের যে হোটেলে উঠেছিলাম এবারও সেখানেই উঠলাম। যদিও সেই একই বাড়ি, তবু হোটেলের নাম পালটিয়ে হয়েছে মুসাফির খানা-এ-বতন। আর এর মালিকানা এখন বাকু থেকে পালিয়ে-আসা এক তুর্কি পরিবারের।

৩

আমার রাশিয়া যাবার সমস্ত ব্যবস্থাই হয়েছিল ডক্টর শেবস্কির আগ্রহে। ভারত থেকে রাশিয়া যাবার সবচেয়ে কাছে রাস্তা হলো আফগানিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান হয়ে কিন্তু আমার ভিসার ব্যবস্থা হয়েছিল তেহরানের কনসাল অফিস থেকে, আর সেজন্য আমাকেও তেহরান আসতে হয়েছে। তেহরানে নেমেই ইনতুর্নিশের (সোবিয়েতের অন্তর্দেশীয় যাত্রা প্রবন্ধক সংস্থা) অফিসে গিয়ে ভিসার খোঁজ করলাম কিন্তু সেদিন তারা কোনো কিছুই বলতে পারল না। পরদিন জুম্মাবার, অফিস ছুটি সেজন্য তার পরদিন (২ অক্টোবর) কনসাল অফিসে গেলাম। ওখানকার সেক্রেটারি রুশ ভাষা ছাড়া সামান্য একটু ফারসি জানে। কোনোমতে তাকে আমি আমার কথা বোঝালাম। সে বলল অনেক ভিসা অনুমোদিত হয়ে জমে রয়েছে, দেখতে হবে, দুদিন পরে আসুন। সন্কেবেলা গেলাম বাগ-এ-মিল্লি (জাতীয় উদ্যান) দেখতে। সঙ্গে ইলাহিবখ্স সাহেব ছিলেন। দেখলাম উদ্যানে বেশ ভিড়। হাজারখানেক লোক বসার মতো চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। বাগানের মধ্যে একটা আধুনিক রেস্টোরাঁ আছে, সেখানে মালাই বরফ, সোডা-লেমনেড ও হালকা ধরনের জলখাবার পাওয়া যায়। দর্শকদের মনোরঞ্জননের জন্য প্রতিদিন ওখানে ইরানী ও ইউরোপীয় নাচ, জিমনাস্টিক ও প্রহসন অভিনয় করা হয়। দর্শকদের দেখে মনে হলো, আমি ইরানে নয়, কোনো ইউরোপীয় দেশে আছি। এখানে অনেক ইরানী সুন্দরীকে দেখে মনে হলো যে তাদের ফ্যাসনের দাপটে প্যারিসের সুন্দরীরাও মাত হয়ে যাবে। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ভীড়ই বেশি, আর যারা খেলা দেখাচ্ছে তাদের অধিকাংশই মেয়ে। এই দৃশ্য কোনো মৌলবিকে দেখালে, সে স্বীকারই করবে না যে এরাও মুসলমান। যদিও বর্তমানে এরা নিজেদের পরিচয় মুসলমান না বলে ইরানী বলে দিতে পছন্দ করে। তবে সমস্ত দেশে এই পোশাক-বিপ্লব ঘটে যাওয়ায় লোকের খরচ বেড়ে গেছে। তার জন্য কর্মচারীদের মাইনে বাড়তে হয়েছে। এক হিন্দুস্থানি ব্যবসায়ী স্কোভের সুরে বলছিলেন যে আগে তার পরিচারিকা তিন তুমান মাস মাইনেতে কাজ করত, এখন আট তুমান দিতে হয়।

অক্টোবরের চার তারিখে আবার কনসাল অফিসে গেলাম। সেক্রেটারি বলল, মার্চ মাসে আমার নামে তার এসেছে এখন আমাকে ফর্ম ভরে দুকপি ছবির সঙ্গে জমা দিতে হবে। আবার অনুমোদনের জন্য মস্কোতে তার করা হবে, চার-পাঁচদিনের মধ্যেই জবাব এসে যাবে এমন আশ্বাসও পেলাম। আমি ওই দিনই আবেদন পত্র ভরে ছবিসহ জমা দিলাম। এবার জবাবের জন্য চার-পাঁচদিন অপেক্ষা করতেই হবে। হাতে কোনো কাজ না থাকলে, সময় কাটানো সতিাই মুশকিল। যদি জানতাম যে তেহরানে আমাকে একমাসের জন্য আটকে পড়তে হবে তাহলে স্থানীয় বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিংবা ওই জাতীয় কোনো বিদ্বজ্জনের সঙ্গে পরিচয় করে নিতাম।

সন্ধ্যাবেলা শহর ঘুরতে বের হতাম। শাহ রজার শাসনে বিগত দশ বছরে তেহরানের লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষ থেকে এক লাফে সাত লক্ষে পৌঁছে গেছে। শহর শুধু আয়তনেই বাড়েনি, এর রাস্তা ঘাটও প্রচুর বেড়েছে। প্রতিদিন শহরের এক এক দিকে আড়াই তিন ঘণ্টা বেড়াতাম। শহরের সর্বত্রই প্রচণ্ড চওড়া এবং সোজা রাস্তা দেখেছি। শহর জুড়ে বাড়ি তৈরি হচ্ছে। এত দ্রুত গতিতে বাড়ি-ঘর তৈরি হতে একমাত্র সোবিয়ত ইউনিয়ন ছাড়া মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী সিকিঙে দেখেছি। এখানে একা একা ঘুরলেও রাস্তা হারাবার প্রশ্ন নেই। যদি হারায়, তাহলে দুই রিয়াল দিয়ে একটা দুৰুষকি ভাড়া করলেই হবে। শহরের এক প্রান্তে একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় (দানিস্‌সরা) শহর গড়া হচ্ছে। বেড়ানোর পর হোটেলে ফিরে বুশ ভাষার কোনো বই পড়তাম। রাত্রিতে কখনও কখনও কোনো ফিল্ম দেখতে যেতাম। এবার তেহরানে কিছু রাশিয়ান ফিল্ম দেখানো হচ্ছিল। বলশেভিজমের পোকা কোনোভাবে এদেশে ঢুকে না পড়ে, সেজন্য রাশিয়ান ফিল্ম এখানে বিশেষ দেখানো হয় না। দশদিন ধরে ভাত আর ইরানী কাবাব খেয়ে এত অরুচি এসে গেছে আর তা গলা দিয়ে নামতে চায় না। এক বন্ধু খয়াবান—ইস্তান্বুলের বাজার নৌ—এর নাম বলল। সেখানে কয়েক ধরনের শুরোরের মাংস পাওয়া যাচ্ছিল, তাছাড়া মাখন, পনির, চাটনি, সস এসব তো ছিলই। আমি ওখান থেকে এক সঙ্গে পাঁচ-সাতদিনের জিনিস কিনলাম এবং নিত্যকার ফল আর রুটি বাজার থেকে আনিয়ে নিতাম। এভাবে খাওয়ার সমস্যার হাত থেকে রেহাই মিলল।

দশদিন হলো তার পাঠানো হয়েছে অথচ এখনও কোনো উত্তর না আসায় চিন্তা হচ্ছিল। রোজই কনসাল অফিসে ফোন করি, আর উত্তর পাই এখনও আসেনি। চোন্দো দিন অপেক্ষার পর অধ্যাপক শ্বেবস্কিকে তার করলাম। পরদিনই উত্তর এল—ব্যবস্থা সম্পূর্ণ, ভিসা ওখানেই মিলবে।

তেহরানের রেল স্টেশনটি পশ্চিম ইউরোপের রেল স্টেশনের আদলে বানানো হয়েছে। বাড়িটি বাহুল্য বর্জিত, সাদাসিধে এবং অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শীতের দিনে ঘর গরম রাখার জন্য গরম জলের পাইপ লাইন আছে। যাত্রীদের অপেক্ষা করার জায়গা, চা-পানের দোকান সবই খুব সুন্দর, এবং পরিকল্পিতভাবে তৈরি। স্টেশন থেকে শহরে যাবার রাস্তার মুখে শাহ রজার একটা মূর্তি আছে। তেহরানের অন্য এক দিকে পার্লামেন্ট ভবনের কাছেও শাহর একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি বসানো আছে। মূর্তি বানানো ইসলামি মতে কাফেরি কাজ, কিন্তু ইরানে কোন্ মৌলবির ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে শাহকে শরিয়তের বিধান শোনাবে।

ভিসা আসতে দেরি দেখে আমি স্থানীয় কিছু বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী হয়েছিলাম। দানিশকদাতে (ইন্টার মিডিয়েট কলেজ) ইরানী ভাষার অধ্যাপক আগা হুমায়ূর সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি ইংরাজি কিংবা ফরাসি ভাষা জানতেন না, যার জন্য আমাদের আলাপ ফারসিতেই হতো। যদিও ফারসি ভাষায় আমার জ্ঞান খুবই সামান্য, তবুও বিষয়ের ঐক্য এবং জানার আগ্রহ দুটো মিলে আমাকে যথেষ্ট বাচাল করে তুলেছিল এবং আমার অপটু ফারসি অধ্যাপক ভালোই বুঝতে পেরেছিলেন বলে মনে হলো। আগা হুমায়ূর আলবেরুনীর জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপরে লেখা বই ‘তফহিম’-এর সম্পাদনা করছেন। মূল গ্রন্থটি ইতিপূর্বে কোথাও কখনও মুদ্রিত হয়নি এবং মনে হয় এই বইয়ের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটিরও আর কোনো নকল নেই। বইটি ফারসিতে

লেখা এবং তার মধ্যে জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত শব্দের পরিভাষাও যুক্ত হয়েছে। কিছু সংস্কৃত না জানা লোক সে গুলোকে বিকৃত করেছে এবং যেখানে সেখানে ত্রুটিপূর্ণ আরবি শব্দ ঢুকিয়েছে। ‘অক্ষাংশ’, ‘অয়নাংশ’ ইত্যাদি বেশ কিছু শব্দকে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে উদ্ধার করতে হয়। আগা হুমায়ূঁ একজন প্রকৃত সজ্জন ব্যক্তি, বয়স চল্লিশের নীচে। বংশ পরম্পরায় তাঁরা অধ্যাপনার কাজ করে আসছেন। আদিতো তাঁরা সিরাজের বাসিন্দা ছিলেন, তারপর কয়েক পুরুষ ধরে ইস্পাহানে বাস করছেন। এখন তাঁর বাড়ি ইস্পাহানে। অনেক সমাদর করে আমাকে ইস্পাহানের খরমুজ খাওয়ালেন। ওঁকে খুব একটা ধর্মান্বিত বলতে পারব না, কারণ ওঁর ঘরের দেয়ালে হজরত মুহাম্মদের একখানা ছবি টাঙানো ছিল। সুফি মতবাদের দিকে তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি আছে এবং তাঁর মতে সুফি মত ধর্ম এবং ধর্মান্বিতা, এই দুইয়ের মধ্যখানে অবস্থান করে।

ডক্টর শেচবস্তির তার দেখানোর পর কনসাল আরেকবার তাঁর অফিসে খোঁজ করলেন এবং জুন মাসে পাঠানো আর-একটা তার পেলেন। যেখানে আমাকে আসা মাত্র ভিসা দেবার কথা বলা হয়েছে। ১৯ অক্টোবর এক শিখ পরিবারের বিয়ের উৎসবে যোগদান করলাম। ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান এবং ইরানী সকলেই একাসনে বসে থাকছিল। ভারতের বাইরে এলে আমাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি কতটা দূর হয়ে যায়, এই ভোজ সভা ছিল তারই এক নিদর্শন। আমার তো মনে হয় ধর্মীয় কট্টরতা দূর করার একমাত্র উপায় আধুনিক শিক্ষার প্রসার। ওই ভোজ সভাতেই এক বন্ধু জানালো যে কনসাল অফিস থেকে ফোন করে জানিয়েছে যে আমার ভিসা তৈরি। এতদিন আশা নিরাশার মধ্যখানে ত্রিশঙ্কু হয়ে বুলছি, এবার ভিসা অনুমোদনের খবরে কত যে আনন্দ হলো তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। আমি সেদিনই পাসপোর্ট জমা দিয়ে এলাম। সেক্রেটারি পরদিন এসে ভিসা অনুমোদিত পাসপোর্ট নিয়ে যেতে বললেন।

২৩ অক্টোবর যাবার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে কনসাল অফিসে গেলাম। ভাবলাম এখন তো শুধু কনসালের সঙ্গে করমর্দন করে পাসপোর্টটা নিয়ে আশা বাকি। ওখানে উনি পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে বললেন—বড়োই আপশোশের কথা আমি ভিসার কাজ শেষ করে কনসাল জেনারেলের কাছে সইয়ের জন্য পাঠিয়েছিলাম, সই করার ঠিক আগে মস্কোর বিদেশ দফতর থেকে একটা তার এসেছে—আগে থেকে অনুমতি না থাকলে যেন কোনো বিদেশিকে ভিসা না দেওয়া হয়। সেজন্য আপনার ভিসা বাতিল হয়েছে। তবে কনসাল জেনারেল নিজে আপনার ভিসা সম্বন্ধে একটা তার মস্কোতে পাঠিয়েছেন। আশা করি তাড়াতাড়ি উত্তর এসে যাবে। একথা শোনার পর আমার অবস্থা কী হলো, তা না জিজ্ঞাসা করাই ভালো। শুধু একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। একবার আমার এক বন্ধু তাঁর পর্দানসীন বিবিকে মেলা দেখাতে নিয়ে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিবি তো রাত জেগে খাবার দাবার তৈরি করে সকালবেলা ছেলের চুলটুল আঁচরিয়ে জামাকাপড় পরিয়ে তাকেও তৈরি করল। তারপর নিজের সাজ সজ্জাতেও কোনো ত্রুটি রাখল না। বেলা দশটায়, যখন বের হবার কথা, তখন বন্ধু এসে বলল—আমার অন্যত্র বদলি হওয়ার আদেশ এসেছে, আর মেলায় যাওয়া হবে না। মেলায় না যেতে পেরে বন্ধুপত্নীর মনের অবস্থা কিরকম হয়েছিল, এই মুহূর্তে আমি আমার অবস্থা থেকে অনুমান করতে পারলাম।

২৩ অক্টোবর আমার ইরানে আসার একমাস পূর্ণ হলো। ইরানের ভিসা অনুসারে আমি মাত্র এক মাসই এদেশে থাকার অধিকারী। আমি ইরানকে ট্রানসিট হিসেবে ব্যবহার করে অন্য দেশে যাব এবং সেজন্য ওভাবেই ভিসা অনুমোদিত হয়েছিল। এখন ভিসার মেয়াদ বাড়াতে হবে। ভিসার মেয়াদ বাড়ানো যে কী কঠিন বস্তু, কতবার যে পাসপোর্ট অফিসে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু আর তো কোনো উপায়ও নেই। গেলাম পাসপোর্ট অফিসে। সেখানে অনেক এশিয়ান ও ইউরোপীয়ান হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। বিরাট লাইন, আমিও সেখানে দাঁড়ালাম। একঘণ্টা পর একজন লোক লাইনের কাছে এল। ভিসার জন্য ১৩ রিয়াল ফিস দিতে হয়। অধিকাংশ লোকের কাছেই একেবারে খুচরো করা ১৩ রিয়াল ছিল না। যা ছিল তা হল ১০ ও ৫ রিয়ালের নোট। শূন্যলম একেবারে সঠিক মুদ্রায় ফিস দিতে হবে ১০ ও ৫ রিয়ালের নোট দিলে খুচরো ফেরত পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, অনেকে নিজের এবং বন্ধু বান্ধবের ভিসার মেয়াদ বাড়াবার জন্য একাধিক পাসপোর্ট এনেছিল। হুকুম হলো যার যার ভিসা দরকার তাকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পাসপোর্ট জমা দিতে হবে। কেউ কেউ দেশের বাইরে যাবার ভিসা— জাবাজ খবুজ —নিতে এসেছিল। তাদের বলা হলো দুদিন পর আসতে। কেউ জানে না, কে আর্জি লিখবে, আর কোথায় তা জমা পড়বে। অনেক কষ্টে আর্জি নবিশকে খুঁজে বার করলাম। আর্জি লিখে বহু কষ্টে অফিসে জমাও দিলাম।

২৫ অক্টোবর সকালে আমার ঘরে পুলিশ এসে হাজির, বলল—এক্ষুনি আমাদের দফতরে চলুন। দফতরে যেতেই প্রথম প্রশ্ন—আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ পার হয়ে গিয়েছে, আপনি জানাননি কেন? আমি পাসপোর্ট অফিসে ভিসার মেয়াদ বাড়াবার জন্য যে আর্জি পেশ করেছি তার প্রমাণ দেখালাম। প্রমাণ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে পুলিশ আমাকে ছেড়ে দিলো। পাসপোর্ট অফিসে গেলাম, বলল—অপেক্ষা করুন পাসপোর্ট লিখে এখনই ফেরত দেওয়া হবে। পরে বলল, —বেলা তিনটের সময় আসুন। তিনটের সময় গেলাম। তখন বলল, —কাল আসুন। কাল অর্থাৎ ২৬ অক্টোবরে যেতে বলল—৩০ অক্টোবর আসুন।

একদিকে সোবিয়ত ভিসা মঞ্জুর হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, অন্যদিকে ইরানী ভিসার মেয়াদ বাড়াবার জন্য রোজ পাসপোর্ট অফিসে দৌড়াতে হচ্ছে। এই বেকার অবস্থায় কখনও কখনও মনে হতো, এদেশের ওপরে কিছু লেখালিখি করি। কিন্তু মনের যা অবস্থা তাতে হাতে কলম উঠতে চাইল না, আর জোর করে ধরলেও মন গতিশীল হতো না। ২৮ অক্টোবর আবার ডক্টর শেবস্কিকে তার করলাম।

এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যে কয়েক ঘণ্টা আগা হুমায়ূর সঙ্গে কাটালাম, সেটুকুই আনন্দে কাটত। একদিন ইরানীদের ধর্ম পালন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। উনি বললেন—ইরানী বুদ্ধিবৃত্তি কোনোদিন ধর্মের দাসত্ব করেনি। যাঁরা মন দিয়ে এদেশের প্রকৃত ইতিহাস পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে ইরান কখনওই তার ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে যেতে দেয়নি। আরবদের প্রারম্ভিক বিজয়ের কালে যদিও মনে হয়েছিল যে সমগ্র ইরানী মেধা ইসলামের দাস হয়ে যাবে কিন্তু সেই অবস্থাতেও ইরানে সমসত ব্রহ্ম, মনসুর, বুযীর মতো প্রতিবাদীরা জন্ম নিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে ইসলামি মতবাদের সঙ্গে এমনভাবে সুফি মতবাদের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, যার ফলে ইসলাম ইরানে এক অন্য

রূপ নিয়েছে। আগা সাহেবের ঘরে বসে এক সজ্জন তো এমনও বলে ফেললেন যে কোরান শরিফ এক ইরানির তৈরি, যাঁর নাম ছিল সলমন ফারসি।

ইরানে ফারসি ভাষার মধ্যে যে সমস্ত আরবি শব্দ অনেক দিন ধরে অনুপ্রবেশ করে বসে ছিল এবং ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগও ছিল; খুঁজে খুঁজে সেই সমস্ত শব্দকে বাতিল করে, সেই বাতিল শব্দগুলোকে সকলের অবগতির জন্য কাগজে ছেপে প্রকাশ্য জায়গাতে—অফিসে, আদালতে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও প্রচার করা হয়েছে। ওই সমস্ত বাতিল আরবি শব্দের পরিবর্তে সম অর্থের ফারসি শব্দ ঢোকানো হয়েছে। এরপর যদি কেউ কোনো সরকারি আর্জিতে ওই বাতিল আরবি শব্দের প্রয়োগ করে, তাহলে আর্জি বাতিল হয়ে যায়।

বেশ কয়েকটা দিন ছোট্টাছুটি করিয়ে অবশেষে কোনো কিছু না লিখেই ৩১ অক্টোবর ইরানি দফতর আমার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিলো। আমার ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলায় ছিল, সেজন্যও পাসপোর্ট দরকার। নভেম্বরের প্রথম তারিখে কিছু গুজব কানে এল। ইরান সরকারের তরফ থেকে পনেরো-ষোলো জন ছাত্র যান্ত্রিক কলাবিদ্যা (ইঞ্জিনিয়ারিং) শিখতে জার্মানি যাবে। তারা রাশিয়া হয়ে জার্মানি যাবার ভিসা চেয়েছিল। তাদেরও ভিসা পেতে দেরি হচ্ছে। কেউ কেউ দেরির কারণ দেখিয়ে বলল, সোবিয়ত সরকার বোধ হয় কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হতে যাচ্ছে এবং সেজন্যই সীমানা বন্ধ করে রেখেছে।

৩ নভেম্বর প্রফেসর আমির আলি সাহেবের বাড়ি গেলাম। আলি সাহেব কিছুকাল লখনৌ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। প্রকৃতিতে অত্যন্ত সরল ও মৃদু স্বভাবের মানুষ তিনি। তিন পুরুষ আগে তাঁর পূর্বজ হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছিলেন। আলি সাহেব নিজে হিন্দুস্থানে জন্মেছেন, তাঁর পুত্র কন্যাদের জন্মও ওখানে। কিন্তু ইরানের সঙ্গে যোগসূত্র কোনোদিনই একেবারে ছিন্ন হয়নি। শাহ রজার নেতৃত্বে নতুন ইরান গড়ার ডাক পেয়ে ইরানে ফিরে এসেছেন। ওঁর মেয়ে তাহিরা লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং ভালো কবিতা লেখে। মেয়েটি খুবই প্রতিভাময়ী। ইরানের নারী সমাজ তার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করতে পারে।

শাহদারির (নজমিয়া অথবা কোতায়ালি) লোক আবার এল। ওদের দফতরে গিয়ে আবার ফর্ম ভরে, তার সঙ্গে তিন কপি ছবি জমা দেবার আদেশ পেলাম। ছয় তারিখের মধ্যে যে করেই হোক দেশের বাইরে চলে যেতে হবে। এই শর্তে ভিসার মেয়াদ বাড়ল। ছবি আর আর্জির প্রয়োজন হলো না। লোকে বলল, এত ঝামেলা তৈরি করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে কিছু পয়সা খাওয়া।

৫ নভেম্বর রমজান মাসের শুরু। রোজার প্রথম দিন। সারা হোটеле একমাত্র হাফিজ সাহেবই রোজা রেখেছিলেন। কয়েকজন হিন্দুস্থানের ড্রাইভার তখন হোটেলেরে ছিল। তাদের একজন বলল—ভাই রমজান আসছে। দ্বিতীয় জন বলল—কিমনিশাহ যাচ্ছ, ওখানেই রমজান ছেড়ে এসো। হাফিজ সাহেব রোজা রেখে ফেলেছেন। কিন্তু বন্ধু বান্ধবেরা তাঁর রোজা রাখা নিয়ে এমন ঠাট্টা তামাসা করতে লাগল যে তিনি এক ওয়াজের নামাজ পাঠ করতে ভুলে গেলেন। সেটা দেখে বন্ধুরা আরও ঠাট্টা করতে শুরু করল—খুব রোজাদার হয়েছে; এদিকে নামাজের সময় ভুলে যাও। দ্বিতীয় দিন এক ইরানী তরুণ হাফিজ সাহেবকে এসে বলল—হাফিজ সাহেব আপনি কী জানেন,

যে একজন বড়ো ধরনের ফেরেস্টা রেজিস্টার খাতা নিয়ে হোটেলে এসেছিল। প্রথম ঘরের দরজায় টোকা মেরে জিজ্ঞেস করল এঘরে কেউ রোজাদার আছেন? উত্তর পেল নেস্ত (না)। সেখান থেকে দ্বিতীয় ঘরে, প্রশ্ন সেই একই এবং উত্তরও এক। তারপর তৃতীয় ঘরে। সেখানেও একই উত্তর পেয়ে বেচারী হতাশ হয়ে রেজিস্টার নিয়ে ফিরে গেছে। আপনি তো আছেন সাত নম্বর কামরায়, আর ফেরেস্টা তিন নম্বর কামরা পর্যন্ত এসেই ফিরে গেছে। আপনার রোজা তো রেজিস্টার্ডই হয়নি, মিথ্যে না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। হোটেলের মালিকানি বললেন—আরে শোনো, পুরুষেরা চাইলে যত খুশি রোজা রাখুক, তাদের নসিবে বেহেস্তে গেলে সম্ভরটি হুরি জুটবে, কিন্তু আমরা মেয়েরা রোজা রাখব কী জন্য শুনি? উনসম্ভরটি সতীন পাওয়ার জন্য? আরেক জন বললেন—খোদার উচিত ছিল তিরিশ দিনের রোজাকে বারো মাসে ভাগ করে দেওয়া। আর রোজা পালিত হওয়া উচিত রাত্রিতে, দিনে নয়। এক আধাপাগল লোক আমাদের মধ্যে ছিল। সে বলল—বুড়ো ততক্ষণে কবরের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। অত ভাবার তার সময়ই ছিল না। এত টিকা টিপ্পনির ফল হলো, হাফিজ সাহেব রোজা রাখার আর নামও করতেন না।

৬ নভেম্বর খবর পেলাম আমার সোবিয়েত ভিসা মঞ্জুর হয়েছে, কিন্তু বলশেভিক বিপ্লবের কুড়ি বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে তাদের অফিস বন্ধ, নয় তারিখে ভিসা পাব। ভিসা পাওয়ার খবরে যেমন আনন্দ হলো তেমনই দুঃখ হলো এই ভেবে যে, যদি আরেকটু আগে ভিসা পেতাম, তাহলে আমি সোবিয়েতের মাটিতে থাকতাম এবং নিজের চোখে সেই উৎসব সমারোহ দেখতে পেতাম। তেহরানের সোবিয়েত দূতাবাসেও উৎসব উদযাপনের বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল। ৭ নভেম্বরের সেই উৎসবে আমিও আমন্ত্রিত ছিলাম। ইংরেজ, ফরাসি ও আমেরিকান দূতাবাসের প্রধানেরা উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। বিশাল টাক মাথার সোবিয়েত রাষ্ট্রদূত সকলকে আপ্যায়ন করছিলেন। উৎসবে খাওয়া দাওয়া ও নাচ গানেরও ব্যবস্থা ছিল। খাওয়ার পর নাচ শুরু হলো। নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠল, আর তারই তালে তালে সুন্দরীরা তাদের পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে কাঠের মেঝেতে নাচতে আরম্ভ করল। একসময় দেখলাম আঠারো জোড়া স্ত্রীপুরুষ এক সঙ্গে নাচছে। সোবিয়েত কনসাল জেনারেল ও তাঁর সেক্রেটারিও নাচে অংশ নিয়েছিলেন।

৯ নভেম্বর বেলা দেড়টায় ভিসা হাতে পেলাম। ১০০ তুমান দিয়ে পহলবী থেকে লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত জাহাজ ও রেলের টিকিট কাটলাম। ওর মধ্যেই রাস্তার খাওয়া আর চার দিনের হোটেল খরচও ধরা ছিল। ২৩ তুমান দিয়ে তেহরান থেকে পহলবী পর্যন্ত একটা গাড়ি ভাড়া করলাম যার মধ্যে মালের ভাড়া ছিল ৬ তুমান। গাড়িটি একেবারে আনকোরা ঝকঝকে। এতদিন তেহরান থাকায় অনেক ইরানি ও ভারতীয়র সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। হাফিজ ইলাহিবখ্‌সের সঙ্গে তো বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমি ইরানের সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে ২০ পাউন্ডের নোট ভাঙলাম। যাতে আমার ১০০ টাকা ক্ষতি হলো। আরও ১৫ পাউন্ড আমার ভাঙাবার দরকার ছিল। হাফিজ সাহেব বললেন—পনেরো পাউন্ডের ইরানি মুদ্রা আমি আপনাকে দিচ্ছি আপনি কেন খামোখা ৭৫ টাকা লোকসান করবেন। আমার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না, তবুও ও তরফের আগ্রহ দেখে বললাম—আপনি কী করে নিশ্চিত হচ্ছেন যে আপনার টাকা আমি ফেরত পাঠাব। উত্তরে হাফিজ সাহেব বললেন—আপনার ওপরে আমার ষোলো আনা বিশ্বাস আছে আর সেটা অর্জিত হয়েছে

আপনার কঠোর নাস্তিকতাবাদ দেখে। (রাহুল সাংক্‌তায়ান সোবিয়ত থেকে ১৫ পাউন্ড, হাফিজ ইলাহিবখ্‌সকে তাঁর হিন্দুস্থানের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—অনুঃ)

সওয়া পাঁচটায় রওনা হলাম। শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে মনে পড়ল যে টমাস কুকের ট্রাভেলার্স চেক ভুলে হোটেলের ফেলে এসেছি। চেক পড়ে রইল আর আমার কাছে লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত পৌঁছানোর পয়সাই শূন্য আছে। তাছাড়া চেকের কথা আমার পাসপোর্টে উল্লেখ করা আছে অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না চেকটা আমি পহলবীতে পাসপোর্ট বিভাগকে দেখাতে পারছি কিংবা চেকটা ভাঙানো হয়েছে এমন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারছি, ততক্ষণ ইরান ছেড়ে বের হতে পারব না। ড্রাইভার সাহেবকে অনুরোধ করে ওখান থেকে গাড়ি আবার তেহরানে ফিরিয়ে আনলাম এবং চেক সঙ্গে নিয়ে সাড়ে ছটার সময় আবার রওনা হলাম। গাড়ি খুব জোরে ছুটছিল। পথে কজনীনে ঘণ্টা খানেক আটকে থাকতে হলো। তারপর একটানা সাতঘণ্টা চলে অনেক ছোট বড়ো পাহাড়ি জোত পার হয়ে গিলান প্রদেশের রস্ত শহরে গিয়ে পৌঁছলাম। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু তেমন ঠান্ডা অনুভব হলো না। আমি গাড়িতেই শুয়ে রইলাম। সকালবেলা (১০ নভেম্বর) রস্ত শহরটিকে ঘুরে দেখলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চওড়া রাস্তা আর তার দুপাশে বাড়িঘর দেখলাম।

সাড়ে আটটায় আবার মোটর ছাড়ল। আকাশ মেঘে ঢেকে আছে, আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। রস্ত শহরে ঢোকার আগেই পাহাড়ের অন্ত হয়েছ, এখন এখান থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত অঞ্চল সমতল ভূমি। সবুজ বন আর ময়দানের বড়ো বড়ো ঘাস ভারতবর্ষের বর্ষাকালের মাঠঘাটের দৃশ্যকে মনে পড়িয়ে দিলো। সামনে একটা নদী পড়ল, নদীতে প্রচুর ঘোলা জলের স্রোত। নদীর স্রোত তার দুই কূল ছাপিয়ে মাঠের বড়ো বড়ো গর্তকে ভরে দিয়েছে। এজন্যই গিলানকে ইরানীরা বলে হিন্দকোচক (ছোট হিন্দুস্থান), এখানে দুই দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে প্রচুর মিল দেখতে পাওয়া যায়। দুবছর আগে এই পথ ধরে পহলবী থেকে তেহরান গিয়েছিলাম, তখন ফসল ভরা ধান খেতকে বাতাসের প্রবাহে ঢেউয়ের মতো দুলতে দেখেছিলাম, দৃশ্যটি স্মরণে আছে। এবার তেমন দেখলাম না, কারণ ফসল কাটা হয়ে গেছে। বর্ষা এদিকে বেশি হয়। সেজন্য এই অঞ্চলের বাড়িতে কাঁচা মাটির ছাদ হয় না। এখানকার বাড়ির ছাদ তৈরি হয়েছে খড় কিংবা খাপড়া (খোলা) দিয়ে। গিলান অঞ্চলে প্রচুর জমি অনাবাদি পড়ে আছে। এখানকার জনসংখ্যা এতই কম যে চারগুণ বাড়ালেও অনেক জমি অনাবাদি থেকে যাবে। এখানকার উৎপাদিত চালের খ্যাতি সারা ইরান জুড়ে।

সাড়ে নটার সময় বন্দর শহর পহলবীতে পৌঁছলাম। গ্র্যান্ড হোটলে দেড় তুমান ভাড়ায় একটা ঘর নিলাম। আমার জাহাজ আগামী কাল ছাড়বে। ইনভুরিস্টের প্রতিনিধিকে বলে দিলাম ইরানী ভিসার জন্য পাসপোর্ট জমা দিতে। দেড় রিয়াল দিয়ে একটা নৌকা ভাড়া করে পুরানো এলাকা দেখতে গেলাম। যদিও স্থানীয় লোকেদের বেশভূষাতে ইউরোপীয় প্রভাব এসেছে কিন্তু এখানকার বাড়ি, ঘর, গলি সবই পুরানো ধাঁচের। বাজার দোকান দেখলে মনে হয় কোনো ভারতীয় অঞ্চলে আছি। তবে সরকারের পরিকল্পনা আছে সমস্ত শহরটিকেই নতুন করে সাজাবার। এর অন্যতম কারণ বাদশাহ রজা শাহ পহলবীর নামেই এই শহরের নামকরণ হয়েছে পহলবী।

পহলবী থেকে সোবিয়ত জাহাজে যাব বাকু। সেখান থেকে ট্রেনে লেনিনগ্রাদ। দিল্লি থেকে নেককুন্ডি পর্যন্ত আসতে খরচ হয়েছিল তেইশ টাকা। আবার নেককুন্ডি থেকে পহলবী পর্যন্ত আসতে লাগল সাতাত্তর টাকা। এভাবে একশো টাকায় দিল্লি থেকে কাম্পিয়ান সাগরতীরে এই পর্যন্ত চলে এসেছি। অবশ্য এর মধ্যে থাকা, খাওয়া ইত্যাদি খরচ ধরা নেই। পহলবী থেকে লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত লেগেছে একশো তুমান। অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার খরচ ধরলে দিল্লি থেকে লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত লেগেছে দুশো টাকা। লেনিনগ্রাদ থেকে চল্লিশ টাকা খরচ করলে সোবিয়ত জাহাজে তিন দিনে লন্ডন পৌঁছানো যায়।

জাহাজ ১১ নভেম্বর রাত্রি আটটায় ছাড়বে। সাড়ে ছটার মধ্যে মালপত্র নিয়ে জাহাজ ঘাটায় পৌঁছে গেলাম। ইরানী সীমা শুল্ক বিভাগ সব জিনিসপত্র দেখল। বিদেশি মুদ্রার হিসাব পাসপোর্টের সঙ্গে মিলিয়ে নিল, তারপর জাহাজে ওঠার ছাড়পত্র পেলাম। তৃতীয় শ্রেণিতে আমি ছাড়া একজন ইতালিয়ান যাত্রী ছিল। শোবার জন্য ছিল কাঠের তক্তা। এখানেও একটা রেডিও ছিল যাতে বাকুর সম্প্রচার শোনা যাচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ছাড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বন্দর ছেড়ে কাম্পিয়ান সাগরের গভীরে পৌঁছে গেলাম।

ইরানে তৃতীয়বার

১৯৪৪-এর অক্টোবরে সোভিয়েট রাশিয়ায় যাবার পরিকল্পনা ছিল। অনেক কষ্টে পাসপোর্ট জোগাড় করা গিয়েছিল। তখন রাশিয়া যাওয়ার জন্য স্থলপথই ছিল সুলভ এবং নিরাপদ। আমিও সেজন্য ইরানের পথে সোভিয়েট যাব বলে ঠিক করেছিলাম। যদিও আমার এ যাবৎকালের কোনো ভ্রমণযাত্রাই অর্থবলের ওপরে ভরসা করে হয়নি, তবে খরচের ব্যাপারটা যত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে ভ্রমণে তত বেশি সুবিধা হয়, যাকে বলে গায়ের মাপে চাদর বানানো। যুদ্ধের জন্য বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ে অনেক বিধিনিষেধ ছিল, যেটুকু মিলল তার সঙ্গেও দীর্ঘ এক নির্দেশনামা, কোন দেশে কতটা খরচ করব ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি একশো পঁচিশ পাউন্ডের বিদেশি বিনিময় মুদ্রার অনুমতি পেয়েছিলাম, যার মধ্যে একশো পাউন্ড রাশিয়ার জন্য এবং পঁচিশ পাউন্ড ইরানের জন্য বরাদ্দ ছিল। ভেবেছিলাম, তেহরানে থাকব তো খুব বেশি হলে পাঁচ-ছ দিন, তার জন্য পঁচিশ পাউন্ড যথেষ্ট। তেহরান থেকে সোভিয়েট ভিসা নিয়ে আমার লেনিনগ্রাদ চলে যাবার কথা, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জন্য অধ্যাপনার পদ প্রতীক্ষা করছিল।

বালুচিস্তানের কোয়েটা থেকে ট্রেন ইরান সীমান্তের ভিতরে জাহিদান (পুরানো নাম দুজদাব— ফারসি ভাষায় যার অর্থ জলচোর) পর্যন্ত যেত। ১৯৪৪-এর ২ নভেম্বর আমাদের ট্রেন ভোর ছ-টার সময় জাহিদান পৌঁছাল। জাহিদান এর আগেও দুবার এসেছি এবং দু বারই স্থানীয় শুল্ক বিভাগের কাছে বেশ হয়রান হয়েছি। এবারও তেমনই আশা করেছিলাম, এবং সশঙ্কচিত্তে শুল্কবিভাগের কর্মচারীদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তখন এক সহযাত্রী বলল, ওসমন্ত পাট তো জাহিদানের আগের স্টেশন মীরজাবাতেই চুকে গেছে। চুকে গেছে? অথচ আমি কিছুই টের পেলাম না। প্রকৃতপক্ষে ইরানের শাসনকর্তা এখন অ্যাংলো-আমেরিকান শক্তি সেজন্য ইরানী শুল্ক কর্মচারীরা আর তেমন উৎসাহ নিয়ে খানাতল্লাশির কাজ করে না, যেটুকু করে দায়সারা-ভাবেই করে। স্টেশন থেকে একটা লরিতে করে জাহিদান শহরে এলাম। আগে জাহিদান শহরকে যে অবস্থায় দেখেছিলাম, শহর এখন তার থেকে আয়তনে অনেক বড়ো হয়েছে। অবশ্যই যুদ্ধই এর প্রধান কারণ। ভারত থেকে প্রচুর সামরিক ও অন্যান্য জিনিসপত্র এই পথেই সোভিয়েট রাশিয়াতে পাঠানো হচ্ছিল। লরি একটা খোলামেলা অরক্ষিত গ্যারেজে আমাদের নামিয়ে দিলো। এরকম জায়গায় মালপত্র ফেলে রেখে মোটর বাসের টিকিট ইত্যাদির খোঁজখবর করতে যাওয়াটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে না বিবেচনা করে আমার পূর্ব পরিচিত সর্দার মেহর সিং চকবালের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। বিশ্বয়ের কথা বাড়ির মালিক সর্দার মেহর সিং এবং আমার পরিচিত মেহর সিং একই লোক নন। কিন্তু সর্দার সাহেব আমাকে আন্তরিকভাবেই স্বাগত জানানেন। সেদিন তাঁর বাড়িতে ছেলের বিয়ের পাকাদেখা। দুটো ঘর মিষ্টি আর অন্যান্য জিনিসপত্রে ভর্তি এরকম একটা ব্যস্ত বাড়িতে অব্যস্তিত অতিথি হয়ে থাকার ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু মালপত্রই বা কিভাবে অরক্ষিত জায়গায় ফেলে রাখি? নিতান্ত নিরুপায় হয়ে সেখানে থাকতে হলো।

যুদ্ধের ফলে ভারতেও জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে অনেক, কিন্তু এখানে এসে দেখি তা আকাশচৌয়া। একজোড়া জুতো আমাদের দেশে যার দাম কুড়ি টাকা, এখানে একশো টাকায় বিক্রি

হচ্ছে। ওই দিনই মশহদ চলে যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু দুপুর পর্যন্ত ওখানকার শহবানিতে (কোতায়ালি) চক্কর কেটেও পাসপোর্টের হদিশ করতে পারলাম না। শূন্যলাম সেটি কোয়ারেন্টিন থেকে ফেরত আসেনি, কোয়ারেন্টিনের একজন ডাক্তার গর্বি বললেন— লরি ছাড়ার ঘণ্টাখানেক আগে আসুন আমি আপনার পাসপোর্ট দিয়ে দেবো। যত সহজে তিনি বললেন, বিষয়টা অত সহজ ছিল না। একজন পরামর্শ দিলো যে সর্দার লাল সিং-এর সঙ্গে দেখা করুন, তিনি খুব প্রভাবশালী লোক, একটা ব্যবস্থা নিশ্চই করে দেবেন। ঠিকানা নিয়ে গেলাম সর্দার লাল সিং-এর কাছে। তিনি পঞ্চাশ তুমান (এক তুমান = এক টাকা। যদিও ইরানের ব্যাঙ্ক এক তুমানকে এক টাকার কিছু বেশি মনে করত) দিয়ে একখানা লরির টিকিট যোগাড় করে দিলেন, এবং প্রচুর দৌড়ঝাঁপ করে পরদিন (৩ নভেম্বর) আমার পাসপোর্টও উদ্ধার করে আনলেন। মানুষ খুব তাড়াতাড়ি অতীত অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যায়, কিন্তু ইরানের বাস কিংবা লরিতে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা জীবনে ভোলার নয়। গাড়ির চালক যাত্রীদের জান এবং মালের রক্ষক, অতএব গাড়ি চলবে সম্পূর্ণ তার মর্জিমাফিক। শাহ রজার আমলের শৃঙ্খলার এখন ইতি ঘটেছে এবং সেজন্য সামাজিক পরিস্থিতিরও অবনতি হয়েছে। রাস্তায় এখন প্রচুর বোরখা পরা মহিলা এবং পাগড়িধারী পুরুষের ঘোরাফেরা দেখতে পাওয়া যায়, যদিও হ্যাট পরার প্রথা একেবারে বাতিল হয়নি।

রাত আটটায় লরি ছাড়ল। লরিতে একত্রিশজন বালতি (কাশ্মীর-লাদাখ মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী) যাত্রী ছিল, যারা শুধু তিব্বতী ভাষাই জানত। বাধ্য হয়ে মাঝে মধ্যে আমাকে তাদের হয়ে দোভাষীর কাজ করতে হয়েছে। বালতিরা যেহেতু সংখ্যায় অনেক ছিল, সেজন্য তারা মাথাপিছু ছাব্বিশ তুমান দিয়ে লরির টিকিট পেয়েছিল। কিন্তু ছাব্বিশ তুমানও তাদের কাছে অনেক। চারদিকে ন্যাড়া পাহাড় আর বৃষ্টিশূন্য উষর ভূমি। পথের ধারে ধারে রাস্তা তৈরির সরঞ্জাম জড়ো করা ছিল। যুদ্ধ, সড়ক-পথের ভাগা খুলে দিয়েছে। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত একটানা লরি চলে শেষে দুঘণ্টার জন্য থামল। আমরা বসে বসেই ঝিমোচ্ছিলাম। সূর্য ওঠার পর আবার লরির চাকা গড়াতে আরম্ভ করল। চা খাওয়ার জন্য বোধ হয় সামান্যক্ষণের জন্য কোথাও লরি থেমেছিল। বেলা একটাতে পৌঁছালাম বীরজন্দ। মাইল খানেক আরও এগোতেই বিপত্তি দেখা দিলো, লরির কলকজায় গন্ডগোল। ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় অচল গাড়িকে সচল করা গেলো। রাত্রির মধ্যে মশহদ পৌঁছানোর কথা। কিন্তু তার আগেই ড্রাইভারের ঘুম পেয়ে গেলো। অতএব সে রাত দুটোর সময় গুनावাদে বিশ্রাম নেবার জন্য লরি থামল। আমরাও একটু বিশ্রামের সুযোগ পেলাম। বেলা দশটা পর্যন্ত ড্রাইভারের নিদ্রা চলল, তারপর ঘুম থেকে উঠে বালতিদের বাকি টাকার জন্য তাগাদা চলল। অনেক তর্কবিতর্কের পর সাতাশজন বালতি দুপুরের মধ্যে ভাড়া চুকিয়ে দিলো এবং তারপরই লরি ছাড়ল। লরিতে সেটা আমাদের তৃতীয় দিন। এক এক দিনের খাওয়া খরচ পড়ছিল সাড়ে তিন টাকা। অঙ্ককার হয়ে এসেছিল এবং দূর থেকে মশহদ শহরের আলোকমালা চোখে পড়ছিল। ড্রাইভার সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাগরেদকে বলল (ক্বীনার)— ‘আলো দেখাবার বকুশিশ দাও’। তার কথা শূনে মনে হচ্ছিল সে যেন একাধারে ড্রাইভার এবং পাভা। গরিব বালতিরা বহু কষ্টে তাদের রক্ত জল করা পয়সা থেকে তিল তিল করে সঞ্চয় করে মশহদ শরীফে যাচ্ছিল ইমাম রজার সমাধি দেখতে। ওই সব অতিরিক্ত দক্ষিণা দেবার সাধ্য তাদের ছিল

না। তাছাড়া ইরানে জিনিসপত্রের দাম আগুন। সেজন্যও তাদের বাড়তি খরচ হচ্ছিল। তারা ওই বাতি দেখবার দক্ষিণা দিতে না চাওয়ায় ড্রাইভার রেগে তাদের ‘জংলি’ ‘বর্বর’ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করল। পথের ধারে এক জায়গায় বুশ সৈন্য লাল বাতি দেখিয়ে গাড়ি থামাল; রাত্রি নটার সময় আমরা মশহদ শরীফ পৌঁছলাম। জিনিসপত্রের জন্য আমাদের অতিরিক্ত আরও পনেরো তুমান দিতে হলো। এরপর এল মাথা গোঁজার একটা ঠাই জোগাড় করার পালা। দু-এক জায়গায় টুঁ মেরে বিফল হলাম। কোনো হোটেলেই জায়গা নেই, অতঃপর বাধ্য হয়ে এখানকার এক পান্ডা মুসা সাহেবের দ্বারস্থ হলাম। চার তুমান দিয়ে ঠিক করা একটা দুবুখকি (ফিটন) এবং দু তুমানের বিনিময়ে পাওয়া একজন মালবাহক আমাদের আগা মুসার বাড়ি পৌঁছে দিলো। অন্য জায়গার পান্ডাদের মতো এখানকার পান্ডারাও যজমানের সুখ সুবিধার খেয়াল রাখে। সোনার ডিম পাড়া হাঁসটাকে তক্ষুনি মেরে ফেলে না। তবে নানা ফন্দিফিকির করে কিঞ্চিৎ বেশি দক্ষিণা আদায়ের চেষ্টা চালিয়েই যায়। আমি অবশ্য প্রথমেই তাকে আমার আর্থিক সঙ্গতির কথা জানিয়ে দিয়েছিলাম— যথা শক্তি, তথা ভক্তি।

৬ নভেম্বর সকালে বুশ কনসাল অফিসে গেলাম, ভেবেছিলাম যদি এখান থেকেই বুশ ভিসা জোগাড় হয়ে যায়, তাহলে অস্বাভাবের পথে রাশিয়ায় যেতে পারব কিন্তু আমার কপালে অত সুখ কোথায়? ভারতীয় মুদ্রা যা সঙ্গে ছিল, তার সবটাই ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। এখন ইরানে খরচের জন্য পাওয়া পঁচিশ পাউন্ডে হাত পড়ল। দশ পাউন্ডের চেক শাহানশাহী ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে পেলাম একশো আঠাশ তুমান। তা থেকে পচাত্তর তুমান গেলো তেহরান অবধি বাসের টিকিট কাটতে। মুসা সাহেবের দক্ষিণা তিন তুমান আর মাল বাহকের খরচ সাড়ে তিন তুমান। পয়সার যেন পাখা গজিয়েছিল, উড়তে মুহূর্তকালও লাগছিল না। সন্ধ্যাবেলা গাড়ি ছাড়ল এবং পরদিন ৭ নভেম্বরও সারা দিন গাড়ি চলল। রাত্রি বারোটা নাগাদ তেহরানের পথে শেষ গ্রামটিতে বিশ্রামের জন্য গাড়ি থামল। দুই তুমান দিয়ে একটা উতাক (কামরা) ভাড়া নিলাম, কিন্তু পোকামাকড়ের উপদ্রবে সেই ঘর ছেড়ে বাইরে এসে শূতে হয়েছিল।

সকালে উঠে আবার চলা শুরু। আগের বার যখন এ পথে গিয়েছিলাম তখন সামনে অনেক কুটির দেখেছিলাম, এখন সেগুলোর চিহ্নমাত্র নেই। তার বদলে জায়গা দখল করেছে বড়ো বড়ো পাকা বাড়ি। এখানে খনিজ তেল বের হওয়ায় জায়গাটার এত দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। এখান থেকে তেহরান পর্যন্ত রেললাইনও চালু হয়েছে। আমাদের বাসেই যেতে হবে, কারণ বাস ভাড়ার টাকাটা আগাম দিয়ে দিয়েছি। দুপুরবেলা হাজিরাবাদের বুশ সামরিক টোکیতে এসে বাস দাঁড়াল। মশহদ শরীফের সোভিয়েট কনসালের দেওয়া অনুমতিপত্র ওই টোکیতে জমা নেয়। কর্তব্যরত বুশ সৈনিকটির ব্যবহার ছিল অত্যন্ত বুক্ষ। কিন্তু তার সঙ্গী, যে ছিল একজন এশিয়ান, তার সম্বন্ধে ওকথা বলা যাবে না।

আমার সহযাত্রীদের অধিকাংশই ছিল তব্রিজী তুর্ক, এবং তাদের মধ্যে টুপির চেয়ে পাগড়ি পরা লোকই ছিল বেশি। একজন ছিল সরকারি আমলা এবং তার গলায় ঝুলছিল কার্তুজের মালা। সরকারি আমলাটির একটি উদ্ভট সখ ছিল, সে বাসের মধ্যে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে তিরিয়াক (আফিং) টানছিল। সরকারি আমলা হবার সুবাদে নিজেকে মনে করছিল আইনের

উর্ধ্বে। তেহরান যখন আর মাইল তিরিশ-বত্রিশ দূরে, তখন তার আফিং ধরা পড়ল। প্রথমে সে আবগারি বিভাগের লোকদের ওপরে খুব চোটপাট করল। কিন্তু কোনো কাজ হলো না, বাস থেমে রইল। অবশেষে কার্তুজের মালা গলায় পরা মদগবী তিরিয়াকি সাহেবকে পাঁচশো তুমান ঘুষ দিতে হলো এবং সমস্ত আফিংও বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলো। সমস্ত ঘটনা মেটোর পর বাস ছাড়ল এবং সঙ্গে সাতটার সময় আমরা তেহরানে পৌঁছলাম।

প্রথমে প্রয়োজন ছিল রাত্রিবাসের আস্তানা জোগাড় করা। চিরাগবর্ক সড়কের মুসাফির খানা তেহরান নামের হোটেলে জায়গা পাওয়া গেলো। প্রথমে কথা বলার সময় বলেছিল পাঁচ তুমান ভাড়া, কিন্তু মালপত্র নিয়ে ঢোকার সময় বলল ছয় তুমান। সেই রাত্রিতেই বুঝে গেলাম যে এখানে থাকা এবং খাওয়ার খরচ পড়ে যাবে প্রতিদিন প্রায় কুড়ি তুমান, আর আমার অবশিষ্ট ছিল কেবল পনেরো পাউন্ড অর্থাৎ একশো বিরানব্বই তুমান অর্থাৎ মাত্র দশদিনের খরচ। বাস স্ট্যান্ড থেকেই একজন সহযাত্রী আমার সঙ্গে নিয়েছিল, পরদিন তাকে পাঁচ তুমান দিয়ে সঙ্গছাড়া করলাম।

পরদিন সকালে হামাম কৌরবীর কাছে কুচা-আনসারীসতে আমার পূর্ব পরিচিত আগা আমির দিমিয়াদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ছ বছর পর তাঁর সঙ্গে দেখা, মনে হলো এই ছয় বছরে তিনি যেন অনেক বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেলাম সোভিয়েট কনসাল অফিসে। সেখানে আমাকে ইংরেজ দূতাবাস থেকে সুপারিশপত্র আনতে বলল। গেলাম ইংরেজ দূতাবাসে। দূতাবাসে ভারতীয় বিভাগের প্রধান নাকভি সাহেবের সহকারি রিজভি সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। রিজভি সাহেব প্রয়াগ-শাহগঞ্জ অঞ্চলের লোক, সেই হিসেবে তিনি এবং আমি একই অঞ্চলের, একই প্রদেশের বাসিন্দা। পরিচয়ের পর তিনি আমার সঙ্গে অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করলেন। ইরানবাসের পরবর্তী সাতটা মাস তাঁর সঙ্গে তেমনই সৌহার্দ বজায় ছিল। রিজভি সাহেবই আমাকে বলেছিলেন সোভিয়েট ভিসা পাওয়া অত সহজ নয়।

আমার প্রধান সমস্যা ছিল জমা একশো বিরানব্বই তুমান এবং খরচ প্রতিদিন কুড়ি তুমান, এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা। এখানেই আব্বাসী ওরফে বোস মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ। তিনি ইরানে এসেছিলেন তাঁর বিবি-বাচ্চাকে (ইরানী) দেশে নিয়ে যাবার জন্য কিন্তু কয়েকমাস কেটে যাওয়া সত্ত্বেও সে বিষয়ে কোনো সুরাহা করে উঠতে পারেননি। আমার আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা জেনে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এবং তাঁর মাসিক তিরিশ তুমানের ভাড়া বাড়িতে আমাকে থাকতে আমন্ত্রণ জানান। আমি তো প্রায় আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। একশো পঞ্চাশের জায়গায় মাত্র তিরিশ তুমান, অনেক সাশ্রয়। তাড়াতাড়ি মালপত্র একই ট্যাক্সিতে উঠিয়ে খয়াবান ফরিস্তায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বন্ধু দিমিয়াদ সাহেবের বাড়িও ওখান থেকে কাছেই। সেটাও বেশ স্বস্তির বিষয় ছিল। ৯ নভেম্বর রাতটা স্বস্তিতেই কাটল।

আর্থিক চিন্তা পরদিন দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিলো, যখন জানলাম আব্বাসী দুমাস ধরে এই বাড়ির ভাড়া দেয়নি। তবে মানুষ আশা নিয়েই বাঁচে। আমি হিসেব কষে দেখছিলাম, খাওয়া খরচ দৈনিক চার তুমানের বেশি হওয়া চলবে না, সেজন্য বুটি, মাখন আর খেজুর দিয়ে চালিয়ে নিতে হবে। একশো ষাট তুমানে যদি ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালাতে পারি তাহলে ষাট তুমান বাঁচবে। তারপর হাতের আংটি এবং তিনতোলা সোনার ঘড়ির চেনের ওপরে নির্ভর করে আরও তিন

মাস পর্যন্ত কাটানো যেতে পারে। কিন্তু তারপরও যদি ভিসা না পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ তখন অনিশ্চিত।

পরদিন (১১ নভেম্বর) দশ পাউন্ড ভাঙানো দরকার হয়ে পড়ল। আব্বাসীর কাছে পনেরো তুমান ধার ছিলো। পাউন্ড ভাঙিয়ে একশো আঠাশ তুমান পেয়েছিলাম, যা থেকে আব্বাসীর ধার শোধ করলাম। আব্বাসী তাঁর কোনো তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কথা বলে আরও পঞ্চাশ তুমান চেয়ে নিল, আমিও সহজভাবেই দিয়ে দিলাম। এরপর হাতে মাত্র তেষাট্টি তুমান এবং পাঁচ পাউন্ডের চেক। ভিসার ব্যাপারে সেদিনও প্রচুর দৌড়ঝাঁপের পর ব্যর্থ হয়ে ডায়েরিতে লিখেছিলাম—
নিজের সম্বন্ধে কোনো আশার আলোই দেখতে পাচ্ছি না।

দৈনিক খরচ দেড় তুমানে নামিয়ে আনব বলে মনস্থ করেছিলাম কিন্তু ১২ নভেম্বর—
গর্মাবা অর্থাৎ স্নানাগারে দিতে হলো তিন তুমান। ১৩ নভেম্বর আব্বাসীর সঙ্গে পরিচয়ের পর চারদিন কেটে গেছে, কিন্তু তাঁকে দেওয়া পঞ্চাশ তুমান ফেরত পাবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, উপরন্তু তাঁর দুমাসের বাড়ি ভাড়ার দায় আমার ওপরে বর্তাবার একটা সম্ভাবনাও বুলে ছিল। তবে আব্বাসীর জীবনের অন্য দিকও ছিল, যার নিরিখে তাঁকে প্রকৃত মানবপুত্র বলা যায়। ৯ নভেম্বর আব্বাসীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আর তার পরদিন বন্ধু দিমিয়াদ সাহেবের বাড়িতে আর-এক মানবপুত্র মির্জা মহম্মদ ইস্পাহানীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

তেহরান

১৯৪৪-এর শীতে তেহরান পৌঁছেছিলাম। ৭ নভেম্বর থেকে ১৯৪৫-এর ২ জুন পর্যন্ত ওখানেই থাকতে হয়েছে এই আশায় যে সোভিয়েট যাবার ভিসা যে কোনো দিন পেয়ে যেতে পারি। এই সাত মাসের প্রতীক্ষা ছিল একাধারে বিরক্তিকর ও ক্লান্তিকর, কিন্তু বিকল্প কোনো কিছু সামনে ছিল না। ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হবার পরই সোভিয়েট ভিসা পেয়েছিলাম। তবে এই দীর্ঘ সাত মাস প্রতীক্ষাকালকে আমি একেবারে নিষ্কল যেতে দিইনি। তেহরান সে সময়ে আন্তর্জাতিকভাবে এবং সামরিক দিক থেকেও এক গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। তবে রাজনৈতিকভাবে ইরান সম্পূর্ণভাবে অমেরিকার বশবশ্বে পরিণত হয়েছিল। তেহরান শহরের বেড়ে ওঠা পর্বটা অনেকটাই আমার দেখা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর শহরের লোকসংখ্যা ছিল সাকুল্যে এক লক্ষ। বাড়িঘরের অধিকাংশই ছিল পুরানো ধাঁচের, রাস্তার অনেকটাই ছিল গলি এবং সেগুলো ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অন্ধকার, পাকা রাস্তা প্রায় ছিল না বললেই হয়। যুদ্ধশেষের বেশ কয়েকবছর পর, ১৯৩৫ সালে আমি যখন প্রথম তেহরানে আসি তখন শহরের লোকসংখ্যা দুই লক্ষ। রাজপথগুলো তখন পাকা, প্রশস্ত এবং সরল। রাস্তার দুধারে আধুনিক ধাঁচের বাড়ি তৈরি আরম্ভ হয়েছিল। ১৯৩৭-এর দ্বিতীয় যাত্রার সময় সেই লোকসংখ্যা আরও কিছু বেড়েছিল। আমার বন্ধু ভারত প্রত্যাগত আগা দিমিয়াদ শহরের একধারে তাঁর বসতবাড়ি বানিয়েছিলেন। তখনও তাঁর বাড়ির চারদিকে প্রচুর খালি জায়গা পড়ে ছিল। সাত বছর পর আমার তৃতীয় দফা ইরান ভ্রমণের সময় দেখলাম আগা সাহেবের বাড়িটির অবস্থান একটা ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে এবং শহরের জনসংখ্যা আট লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে এবং মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর উপস্থিতি সেই সংখ্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। যদিও ব্রিটিশ, আমেরিকান ও রুশ সৈন্যদের জন্য শহরের বাইরে আলাদা আলাদা ব্যারাক গড়া হয়েছিল তা

সন্ত্বেও শহরের সঙ্গে সৈন্যদের সম্পর্কে একেবারে ছিন্ন হয়নি। সাধারণ না হলেও শৌখিন জিনিসপত্রের কেনাকাটা কিংবা সিনেমা ইত্যাদি বিনোদনের জন্য তাদের শহরে আসতেই হতো। যার ফলে তেহরানে সর্বদাই বিভিন্ন দেশের সামরিক উর্দি পরা সৈনিকদের ঘুরতে ফিরতে দেখা যেত।

উঁচুদের রাজনীতি আগের মতোই ছিল— রজা শাহ যাকে আধুনিক ইরানের নির্মাতা বলা যায়— নাতসি জার্মানির পক্ষপাতী ছিলেন। মোম্লাদের বিরুদ্ধে তিনি ইরানের প্রাচীন জাতীয় গর্বকে সামনে তুলে ধরেছিলেন। প্রত্যেক রজাশাহী ইরানী তবুগ তখন আরব এবং আরবি সংস্কৃতির ওপরে চার লাখি মেরে, নিজেদের কোরোশ ও দারয়োশের আর্ষত্বের উত্তরাধিকারী মনে করতে শিখেছিল। হিটলারের আগেই রজা শাহ তাঁর দেশে আর্ষত্বের পতাকা পুঁতেছিলেন, এবং বোধহয় সেই কারণেই রজা শাহ হিটলারের নীতির সঙ্গে নিজের ভাবনার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তবে শুধুমাত্র আর্ষত্বের প্রশ্নে উভয়ের মিল হয়নি, জার্মানি যেভাবে ইওরোপের প্রায় সবটাই গ্রাস করে ফেলেছিল, তাতে রজা শাহর ধারণা হয়েছিল, যে যুদ্ধে অস্তিম বিজয় হবে জার্মানির। সেইজন্য তিনি জার্মানির দিকে সৌহার্দের হাত বাড়াতে চেয়েছিলেন। যদিও আফ্রিকার বৃকে জার্মান অগ্রগতি থামাতে ব্রিটিশ-আমেরিকান শক্তি ব্যর্থ হচ্ছিল, কিন্তু এক ঝটকায় ইরান দখল করে নিতে তাদের বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। তাছাড়া হিটলারের বাহুও অত দীর্ঘ ছিল না যে সে তেহরানকে রক্ষা করে। রজা শাহকে মিত্রশক্তি বন্দী করে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাসনে পাঠায়। এক সাধারণ তুর্ক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পরবর্তী কালে রজা শাহ এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি কোনো বংশানুক্রমিক রাজা ছিলেন না, সেজন্য তাঁর গদিচ্যুতি সেরকম কোনো বড়ো বিষয় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাঁর পুত্র সে তো জন্ম থেকেই রাজপুত্র, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। হিটলারের বিরুদ্ধে সোভিয়েট সহায়তা যতই জরুরি হোক, তার শাসন ব্যবস্থাকে ইংলন্ড আমেরিকা সংক্রামক রোগের মতোই ভয় পেত। ইরানে যখন রজা শাহ কাণ্ড ঘটছিল তখন রাশিয়ার অভ্যন্তরে জার্মানদের বিজয় অভিযান অব্যাহত ছিল, সে জন্য তারা তাদের এই প্রতিবেশী দেশের ঘটনায় আমেরিকা ইংলন্ডের ওপরে কোনো চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি। ইংলন্ড-আমেরিকা তখন শুধু যুদ্ধ জেতার বিষয় নিয়েই মাথা ঘামায়নি, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে তাদের সাম্রাজ্য যাতে বহাল তবিয়ে থাকে সেই কৌশলও ছকে ফেলেছিল। সেই বিষয় মাথায় রেখে ইরানে তারা কোনো বড়ো ধরনের ঝুঁকি নেয়নি, রজা শাহ যুদ্ধের বলি হলেন, কিন্তু ইরানের বৃকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে টিকিয়ে রাখা হলো।

তেহরানের রাজপথে শত শত বিদেশি সৈনিকের উপস্থিতি দেখেই বোঝা যেত যে ইরানের প্রকৃত মালিক ইরানীরা নয়, যদিও নিত্যদিনের শাসনব্যবস্থার ভার ইরানীদের হাতেই ছিল। রজা শাহর শাসনব্যবস্থা ছিল এক অভিজাততান্ত্রিক স্বৈরাচার। যেখানে আম জনতা কিংবা বুদ্ধিজীবীদের কোনো ভূমিকাই ছিল না। সমগ্র দেশে গুপ্ত পুলিশের জাল বিছানো ছিল। যে কোনো ইরানী নাগরিক ইরানেরই মধ্যে এক শহর থেকে অন্য শহরে কোনো কারণে গেলে গ্রেপ্তার হতো যদি তার কাছে সচিচ্চ জবাজ (পাসপোর্ট) না থাকত। সমস্ত দেশটা ছিল এক বৃহত্তর কারাগার। শাহের দমন নীতির ফলে তাঁর সমস্ত শত্রুই যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এমন নয়, মাঝে মধ্যে কেউ কেউ

সাহসিকতার পরিচয়ও রাখতেন। ১৯৩৭-এ একবার আমি হেঁটে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন ক্যানভাসের হুড় লাগানো সাধারণ একটা মোটর গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসে একজনকে যেতে দেখলাম। শাহর ছবি আমি আগে দেখেছিলাম, তাই ভাবছিলাম, ইনিই কি শাহ? পর মুহূর্তেই আমার সন্দেহের নিরসন হলো কারণ তখন অন্য পথচারীরা ‘আলা-হজরত’ ‘আলা-হজরত’ বলে একে অপরকে সজাগ করছিল। এখনও ববললরজা শাহর আমলের আইন-কানুনই বলবৎ আছে তবে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তার কড়াকড়ি অনেক শিথিল হয়েছে। দশ বিশ বছর কারাবাস করে অনেক দেশভ্রম্ণ এখন জেলের বাইরে এসেছেন। নিকটে সোভিয়েট সৈন্যের উপস্থিতি এখন মজুর ও বুদ্ধিজীবীদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের সংগঠন তুদে (জনতা) দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। বুদ্ধিজীবীদের ওপরে তুদে পার্টির প্রভাব অসীম, যদিও পার্টি এখনো বে-আইনি। সাম্যবাদী প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে অ্যাংলো-আমেরিকান শক্তি দম্বর মতো ভীত, ঘাড়ের ওপরে সোভিয়েট সৈন্য উপস্থিত থাকার জন্য তারা তাদের মতো করে ইরানীদের ওপরে দমন পীড়ন চালাতে পারছে না। ইরানী আজারবাইজান—ককেশাস পর্বতমালা ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত আজারবাইজানেরই এক অংশ। উত্তর ভাগের সোভিয়েট আজারবাইজান এক স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক দেশ, যে দেশ যৌথ কৃষিব্যবস্থা এবং শিল্পোন্নতির মাধ্যমে নিজেই এক সম্পন্ন, সুশিক্ষিত রাষ্ট্রে পরিণত করেছে, অন্যদিকে ইরানী আজারবাইজান সবদিক থেকে পিছিয়ে থাকা এক প্রদেশ। যুদ্ধের সময় আজারবাইজানের উভয় অংশের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারা দেখেছে যে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীতে কিভাবে আজারবাইজানী, তুর্কমান, উজবেক, রুশি, ইউক্রেনীয় প্রভৃতি সকলে এক সঙ্গে মিলে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বাস করে। এর প্রভাব ইরানী আজারবাইজানীদের ওপরেও ভালোমতোই পড়েছিল। ইরানী আজারবাইজানীরা কোনো স্বাধীনতার দাবি তোলেনি, তারা ইরানের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই স্বশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা করেছিল কিন্তু আমেরিকার মদতে ইরান সরকার সেই প্রচেষ্টাকে কঠোরভাবে দমন করে।

মিত্রশক্তির, সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে সাধারণ ইরানীদের মনোভাব কিরকম তা বোঝাবার জন্য আমি এক ইরানী মহিলার মস্তব্য উদ্ধৃত করছি। ভদ্রমহিলার বাবা বহুকাল ভারতে বসবাস করেছেন এবং শিক্ষা সংস্কৃতির বিচারে মহিলাকে আধা ভারতীয় বলা চলে। তাঁর বক্তব্য—হয়তো কোনো ফুটপাথ ধরে আমি চলেছি, উলটোদিক থেকে যদি সেই ফুটপাথ ধরে কোনো আমেরিকান কিংবা ইংরেজ সৈন্যকে আসতে দেখি, তৎক্ষণাৎ আমি সেই ফুটপাথ ছেড়ে অন্যদিকের ফুটপাথে চলে যাব, কিন্তু কোনো রুশ সৈনিককে আসতে দেখলে অমন করব না। আমি হেসে বলেছিলাম—তাহলে কী আপনি তাকে ধাক্কা মারবেন? মহিলা বললেন ঠিক কথা, তবে ধাক্কা মারলেও ভয়ের কিছু নেই, রুশ সৈনিকদের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা এখানে চালু আছে। সাধারণভাবে লোকে রুশ সৈন্যদের দুর্নীতি-মুক্ত মনে করে। আমেরিকান সৈন্যরা এখানে দুহাতে পয়সা খরচ করে। যার জন্য ইরানীরা এবং তাদের চেয়েও বেশি শ্বেত রুশিরা (যারা সোভিয়েট বিপ্লবের পর পালিয়ে এদেশে চলে এসেছে) ভাবত প্রতিটি আমেরিকান সৈন্যই বোধহয় কোনো না কোনো সোনার খনির মালিক। তেহরানে প্রথম ছমাস যেখানে ছিলাম, তার পাশের বাড়িতে এক শ্বেত রুশি বৃদ্ধা

এবং তার মেয়ে বাস করত। তার বাড়িতে নিতাদিন আমেরিকান সৈন্যদের আনাগোনা লেগেই ছিল। বৃদ্ধা হয়তো মনে মনে ভাবত, যদি তার মেয়ের কোনোক্রমে কোনো আমেরিকান সৈনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে তার বরাত খুলে যাবে।

তেহরানে হাজার খানেক ভারতীয় সৈন্যও ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও ইরানে অনেক জায়গায় ভারতীয় পলটনের ছাউনি ছিল, তবে তখন সবই ছিল সাধারণ সৈন্য, এখন তো এখানে সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে অনেক ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্নেল পদের লোকও আছে। তবে ভারত এখনও ইংরেজদের অধীন, তাই ভারতীয় সৈন্যদের কোনো স্বাধীন ভূমিকা এখানে নেই, তাদের নিয়ে ইরানীদের কোনো ভাবনাও ছিল না। তাছাড়া তাদের মাইনেও ছিল কম, আমেরিকান সৈন্যদের মতো মুক্তহস্ত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

আগেই বলেছি যে যুদ্ধের ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণ নাগরিকদের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। ১৯৩৫ সালে ছ পয়সা, দু আনা সের দরে উৎকৃষ্ট আঙুর পেয়েছিলাম। এখন সেই আঙুর যে দামে বিক্রি হচ্ছে তা লাহোর, বোম্বাইয়ের দামের সমান। বিদেশি সৈন্যরা প্রচুর খরচ করত বলে বাজারে অর্থের যোগান কম ছিল না। তদুপরি যুদ্ধের কারণে বেকারিও অনেকটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় জিনিসপত্রের যোগান ছিল কম। বাজারে ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফরাসি ইত্যাদি সব দেশের সিগারেট পাওয়া যেত। সিনেমা হল খোলার ব্যাপারে সমস্ত দেশের মধ্যেই হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। অনেক সিনেমা হল আমেরিকানরা ভাড়া নিয়ে তাদের দেশের ফিল্ম দেখাত। ইংরেজদের এবং রুশদেরও একটি-দুটি হল ছিল। তেহরানের অন্য কয়েকটি সিনেমা হল ভারতীয় সিনেমা দেখানো হতো, তবে ভারতীয় সিনেমার অধিকাংশই ছিল ‘পিস্তলওয়ালা’ কি ‘হান্টারওয়ালা’ ধরনের। যদিও এধরনের সিনেমা দেখার জন্য হলগুলিতে ভীড় লেগেই থাকত। কিন্তু ভারতের পক্ষে এটা কোনো গর্বের বিষয় নয়।

অযাচিত বন্ধু

৮ নভেম্বর, ১৯৪৪-এর সন্ধ্যায় ইরানের রাজধানী তেহরানে প্রায় রিক্তহস্তে অথচ মনে প্রভূত আশা নিয়ে পদার্পণ করেছিলাম। ভেবেছিলাম সহজেই সোভিয়েট ভিসা পেয়ে যাব এবং অবিলম্বে লেনিনগ্রাদ রওনা দেবো। তখন কী আর জানি যে এই শহর থেকে বের হতে আমার পরবর্তী বছরের জুনমাস পর্যন্ত লাগবে। তেহরানে পদার্পণ করার পর প্রথম যে ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর নাম অভয় চরণ বোস কিন্তু এখানে তার নাম ছিল আবদুল্লাহ ওরফে সুকুরুল্লাহ আব্বাসী। সেই দুঃসময়ে আমার অনেক কষ্টের সঞ্চয় থেকে নানা ভুজুংভাজুং দিয়ে পঞ্চাশ তুমান হাতিয়ে নিয়ে আর ফেরত দেয়নি বলে তার সম্বন্ধে কোনো একপেশে ধারণা পোষণ করা ভুল হবে। তার মধ্যে এক পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তির সমন্বয় ছিল। কখনও তার ব্যবহারে তাকে দেবতুল্য মনে হতো আবার কখনও শয়তানের প্রতিমূর্তি। তার সম্বন্ধে পরবর্তী পর্যায়ে আরও বিশদভাবে জানাব। এর আগের ইরান ভ্রমণের সময় আগা আমির আলি দিমিয়াদ সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। এবার তাঁর বাড়ির কাছেই আর-একটি বাড়িতে আব্বাসী আমায়

এনে তুলেছিল। দিমিয়াদ সাহেবের বাড়িতে এক গৌরবর্ণ শ্রীচ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁর কৃষ্ণবর্ণের চোখের মধ্যে এক বিশেষ চমক ছিল এবং সেখানে একাধারে বুদ্ধিমত্তা ও সহানুভূতির প্রকাশ ছিল। দিমিয়াদ সাহেব, তাঁর মেয়ে তাহিরা এবং সেই ভদ্রলোকের (মির্জা মহম্মদ ইস্পাহানী) সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক জমিয়ে আড্ডা হলো। যে দুঘণ্টা ওখানে ছিলাম, সেই দুঘণ্টা আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গার হাত থেকে মুক্ত ছিলাম। ওখান থেকে বেরিয়ে মির্জা মহম্মদের সঙ্গে সৈয়দ মুহম্মদ আলি দাইউল ইসলাম সাহেবের বাড়ি গেলাম। দাইউল ইসলাম অনেক বছর হায়দ্রাবাদে ছিলেন এবং ওখানে থাকতে ‘ফরজঙ্গে-নিজাম’ নামে একখানা ফারসি ভাষায় বই লিখেছিলেন। তাঁর তিন মেয়ে যারা প্রচণ্ড ইরানপ্রেমী, সাম্প্রতিক কালেই ইরানে এসেছে। তাদের চেহারা, শিক্ষা, সংস্কৃতি থেকে ভারতীয়ত্বের সুবাস আসছিল এবং ওই ইরানপ্রেমী মেয়েরা তাদের এই ভারতীয়ত্বটুকুকে বিসর্জন দিতে রাজি ছিল না। বড়ো মেয়ে এম. এ., দ্বিতীয় জন এম.এস.সি.। কনিষ্ঠটি জুনিয়র কেম্ব্রিজ উত্তীর্ণ। দাইউল সাহেবের ইচ্ছে যে মেয়েদের বিয়ে ইরানেই হোক। মির্জা মহম্মদ ইস্পাহানী ইরানী বংশোদ্ভূত ভারতীয় ছিল এবং সেজন্য ওই পরিবারের জামাই হবার উপযুক্ত ছিল। মির্জা মহম্মদের ভারতীয় বিবির মৃত্যু হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহে তাঁর আগ্রহ যথেষ্টই ছিল। কিন্তু এই পরিবারের বড়ো মেয়েটি তাঁর পছন্দ নয়, তাঁর পছন্দ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মেয়ে। কিন্তু দাইউল ইসলাম সাহেব বড়ো মেয়ের বিয়ে না দিয়ে অন্য মেয়েদের বিয়ে দিতে অরাজি। বড়ো মেয়েটি বড়ো বেশী ধর্মপরায়ণা এবং রোজ নামাজে নিবেদিতা মনপ্রাণ। তাছাড়া চেহারার বিচারেও সে অন্য দুই বোনের তুলনায় বেশ খানিকটা পিছিয়ে। এমন মেয়েকে মির্জা সাহেবের পছন্দ না হবারই কথা। শেষ পর্যন্ত মির্জা মহম্মদ তাঁর বিমাতার ছোট বোনকেই বিয়ে করেছিলেন এবং সে অনেক পরের কথা। সেদিন আমি আর মহম্মদ প্রায় আট-দশ ঘণ্টা একসঙ্গে ছিলাম। মানুষ চেনার পক্ষে ওটুকু সময় হয়তো পর্যাপ্ত নয় তবে এই সময়ের মধ্যে একের প্রতি অন্যের বিশ্বাস স্থাপনের একটা ভূমিকা অবশ্যই তৈরি হয়। মির্জা মহম্মদের বাবা ছিলেন একজন বড়ো ব্যবসাদার। কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানী ব্রাদার্সের অন্যতম অংশীদার ছিলেন। ইস্পাহানী ব্রাদার্সের ব্যবসা বিলেত পর্যন্ত ছড়ানো ছিল। টাকা রোজগার এবং তা ওড়ানো, দুটো ব্যাপারেই মহম্মদের বাবা ওস্তাদ লোক ছিলেন। যথেষ্ট উড়িয়েও মৃত্যুকালে চার পাঁচ লক্ষ টাকা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় চিনির দাম এমনিতেই বৃদ্ধি পেয়েছিল, আর ইরানে তো তা সোনার দামে বিক্রি হচ্ছিল। বৃদ্ধ ইস্পাহানী এরকম একটা অবস্থার কথা আগেই আন্দাজ করে ভারত থেকে দশ হাজার বস্তা চিনি আমদানি করে রেখেছিলেন। এই ব্যবসায় তাঁর তের-চোদ্দো লক্ষ টাকা মুনাফা হয়। চিনির বস্তা ইরান সীমান্তের নেককুন্ডি স্টেশনে আটকে ছিল। সেখান থেকে ওগুলোকে উদ্ধার করার জন্য কলকাতা থেকে ছেলে মহম্মদকে ডেকে পাঠান। মহম্মদ এসে চিনির বস্তা উদ্ধার করে তেহরান নিয়ে আসে। তাঁর কথায়, আজও যদি ওই চিনি ধরে রাখা যেত তাহলে মুনাফা এক কোটি ছাড়িয়ে যেত। মহম্মদ তেহরান আসার পাঁচ মাস পরেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। এখন বাবার সম্পত্তি থেকে নিজের ভাগ বুঝে নেবার সময় এসে পড়েছিল। মহম্মদের ভাই বোনের সংখ্যাও খুব কম নয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতে আবার কেউ কেউ ইরানে বাস করে।

১৭ নভেম্বরের মধ্যে আমার আর মহম্মদের পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মানুষ

হিসাবে মহমুদ ছিল অত্যন্ত দিলখোলা, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সে বুদ্ধিহীন ছিল। আমার মধ্যে তিনি বোধহয় এমন কিছু দেখেছিলেন যা তাঁর স্বাভাবের সঙ্গে মিল খায়। আমার আর্থিক দুরবস্থার কথাও তাঁর অজানা ছিল না। আমার কাছে তিন ভরির মতো সোনা এবং অন্য কিছু জিনিস ছিল যেগুলিকে বিক্রি করার কথা ভাবছি। এমন সময় মহমুদ বলল— নিঃসঙ্কোচে এই গরিবের কুটিরে চলে এসো। থাকার কোনো অসুবিধা হবে না। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটা তিনতলা বাড়ির ওপর তলায় তাঁর দুটো ঘর নেয়া ছিল। ঘরে জিনিসপত্র বলতে কিছুই ছিল না। একজন বুক্কেয়া (চাকরানি) রান্নাবান্না করে দিত। মহমুদ সকালে নটার মধ্যে অফিসে চলে যেতেন। সম্প্রতি একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তিনি কিছু কাজ-কারবার আরম্ভ করেছিলেন। আমি সারাদিন ভিসার জোগাড়ে একবার ব্রিটিশ দূতাবাস আর-একবার সোভিয়েট দূতাবাস, এই করতাম। কখনও বা দু-চার খানা বই যোগাড় করে পড়তাম। মহমুদ ফিরলে কখনও যেতাম দিমিয়াদ সাহেবের বাড়ি বা দাইউল-ইসলাম সাহেবের বাড়িতে। কখনও কখনও মহমুদের সঙ্গে তাঁর বিমাতার বাপের বাড়িও গিয়েছি। যুদ্ধের জন্য তেহরানে যে কয়েক হাজার ভারতীয় সৈন্য উপস্থিত ছিল, তাদের কয়েকজনের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হয়েছিল। মাঝে মধ্যে সেটাকে ঝালিয়ে নেবার জন্য তাদের কাছে যেতাম।

দু এক সপ্তাহ পর আমার মধ্যে একটা অপরাধ বোধের জন্ম হতে লাগল। আমি নাহব আমার ভার আমার নবলক্স বন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মহমুদের আন্তরিক ব্যবহারে সেটা দূর হয়ে যেতে সময় লাগেনি। দাইউল-ইসলাম সাহেবের বড়ো মেয়ে জাহিরা একদিন তার ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য লিখিত প্রবন্ধ পড়ে শোনাল। প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে 'সম্রাট অশোক একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁর জন্ম ইরানের অখামনশী বংশে, যে বংশে মহান সম্রাট দারয়োশ জন্মেছিলেন। তিনি ইরানের পর্সোপলিস (আধুনা তখত-এ-জমশীদ) থেকে কারিগর আনিয়ে ভারতবর্ষে অনেক ইমারত তৈরি করেছিলেন। আশোকের পিতা চন্দ্রগুপ্ত ইরানেরই এক নগর মুরু থেকে ভারতে গিয়েছিলেন। অশোক বৌদ্ধ ছিলেন না, অজন্তার গুহা ও কোনো বৌদ্ধ বিহার ছিল না, ওগুলো পুলকেশী ও অন্যান্য দাক্ষিণাত্যের সম্রাটদের চিত্রশালা, যেখানে তাঁদের জীবনের ঘটনাপঞ্জী চিত্রাকারে সাজানো রয়েছে, বুদ্ধ কিংবা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে ওগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। বুদ্ধ তো ছবি আঁকতে এবং মূর্তি গড়তে নিষেধ করেছিলেন, তাহলে ওগুলো কি করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সৃষ্টি হয়? তাছাড়া ও সমস্ত শৃঙ্গার রসের মূর্তি বা চিত্র কখনও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হতে পারে না।' আমি অনেক ধৈর্য ধরে জাহিরা খানমের নিবন্ধটি শুনলাম। আমি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপকটির কথা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলাম যাঁর তত্ত্বাবধানে এই নিবন্ধটি লেখা হয়েছে।

দাইউল সাহেব শুধু আরবি, ফারসি নয়, ভালো সংস্কৃতও জানতেন। তাঁর যা বিদ্যা তাতে অনায়াসে তিনি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক হতে পারতেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা ছিল সেই প্রবাদের মতো— 'দিগম্বরদের গ্রামে ধোপার কি দরকার?' তাঁর হাতে পর্যাপ্ত সময় ছিল, আর আমারও তেমন কোনো কাজ ছিল না, আর মহমুদের কাজ থাকলেও সামান্য সময় তাঁর পিছনে দিলেই যথেষ্ট ছিল। এজন্য প্রতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে আমরা দাইউল সাহেবের বাড়িতে হাজিরা দিতাম। পাত্র হিসাবে মহমুদের বাজার-দর ভালোই ছিল। তাঁর প্রথমা স্ত্রী গত হয়েছেন এবং তাঁর একটি পুত্রসন্তান আছে। যে কলকাতায় বাস করে এবং মহমুদ তাঁর ছেলেকে

খুবই ভালোবাসেন। এ সমস্ত কিছু সত্ত্বেও বিয়ের বাজারে তাঁর চাহিদা ছিল। মহম্মদ প্রথমে এক পরীর মতো সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পাগল হয়েছিলেন। সুন্দরীও মহম্মদকে কিছুদিন আশায় রেখে, ক্ষান্তি দেয়। কারণ তার বাবামায়ের অমত ছিল। এখন মহম্মদের সামনে পাঁচ পাঁচটি অনুচা যুবতী। দাইউল সাহেবের মেজ মেয়ে তাহিরার প্রতি তাঁর দুর্বলতা বেশ প্রকট ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁর বোধোদয় হলো যে অত স্বাধীনচেতা মেয়েকে নিয়ে ঘর করা তাঁর মতো লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। বড়ো মেয়ে জাহিরা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য— ‘ও মেয়ে তো নয় এক কাঠের গুঁড়ি। সারাদিন নামাজ পড়তেই কাটিয়ে দিলে ঘর সংসার করবে কখন? জাহিরার প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল। মহম্মদের বয়স পঁয়ত্রিশ, এব্যসে বিয়ে না হলে বয়স বেড়ে যাবে এবং পছন্দমতো পাত্ৰী জোটানো আরও কঠিন হবে। মহম্মদের এক খুড়তুতো ভাই যে ছুতোরের কাজ করত, মহম্মদ চেপ্টা করলেন তার সঙ্গে জাহিরার বিয়ে দিতে। কিন্তু জাহিরা রাজি হলো না। মেজ মেয়ে সিদ্দিকা, যে ছিল এম.এস.সি. পাস, সে চাইত তার স্বামী হবে শুদ্ধ ইরানী রক্তের। এদিকে দাইউল সাহেব বড়ো মেয়ের বিয়ে না দিয়ে অন্য মেয়েদের বিয়ে দেবেন না, আরেক দিকে মহম্মদের সৎমায়ের ছোটবোন, বেশি লেখাপড়া জানে না, কিন্তু তার বয়স আঠারো এবং দেখতে সুন্দরী, রং ফর্সা। প্রথমে মহম্মদের দৃষ্টি ওদিকে যায়নি তার কারণ সৎমার বাপের বাড়ির প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল না, তাছাড়া পঁয়ত্রিশ আর আঠারোর ব্যবধানটাও তাঁকে ভাবাত। আমি তাঁকে আমার মত জানিয়ে বলেছিলাম, ‘শিক্ষা, সংস্কার, বয়স সবদিক থেকে জাহিরা খানমই হবে আপনার উপযুক্ত স্ত্রী’। কিন্তু চোখের সামনে উদ্ভিন্ন যৌবনারা ঘোরাফেরা করলে, প্রায় যৌবন উদ্ভীর্ণা কুমারীকে কার আর পছন্দ হয়? দাইউল সাহেবের প্রতিবেশী ছিলেন এক সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং বুচিশীল মহিলা। এক কথায় তাঁর সঙ্গে কাব্যের নায়িকাদের উপমা চলত। কিন্তু তাঁর বিয়ে হলো এমন একজনের সঙ্গে, যাকে দেখে মহম্মদ যারপরনাই বিস্মিত। আমি তাঁকে সাবুনা দিয়ে বলেছিলাম— ‘আম্মা মিএগ যদি তাঁর গাধাকে আঙুর খাওয়ান, তাতে আপনার আমার কি বলার থাকতে পারে?’

আমার আসার মাস খানেকের মধ্যেই মহম্মদের সঙ্গে তাঁর বিমাতার সন্ধি হয়ে গেলো। মহম্মদ চেয়েছিল তাঁর পিতৃসম্পত্তির একটা ন্যায্য বাঁটোয়ারা করতে যাতে কেউই বঞ্চিত না হয়, কিন্তু ভাই বোনদের কাছ থেকে তিনি এ ব্যাপারে আশানুরূপ সহযোগিতা পাননি। যাইহোক সন্ধি হয়ে যাওয়ার ফলে, একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেলো যে বিয়েটা তাহলে ধুমধাম করে পাঁচজনকে ডেকেই হবে। এতদিনে মহম্মদ স্বীকার করলেন যে যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হতে যাচ্ছে, সে প্রকৃতপক্ষেই সুন্দরী এবং লেখাপড়া বেশি না জানলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু সিরাজে বসবাসকারী শ্বশুরকুল সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহের ভাব থেকেই গিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে কে বোঝাবে যে আপনার বাবা মরহুম আগা হাশিম ইম্পাহানী ওই বংশেই তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে আমার আর্থিক দুরবস্থা প্রায় দূর হয়ে গেলো বলা যায়। বোম্বাই থেকে আমার বন্ধু সর্দার পৃথ্বী সিং এক হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন, অন্যদিকে আমার প্রকাশকও পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছিলেন। প্রয়োজন পড়লে আরও টাকা পাবার ব্যবস্থাও ছিল। মহম্মদের সঙ্গে তাঁর সৎমায়ের মিটমিট হয়ে যাবার পর তাঁর মা তাঁকে বলতে লাগল, আমার কাছেই চলে এসো, এখন আর আলাদা থাকার দরকার কী? ইত্যাদি ইত্যাদি। ১০ ডিসেম্বর তেহরানে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছিল, বেলা এগারোটার সময় মালপত্র একটা ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে আমরা নাজিমুদ্দজার

আগা হাশিম আলি ইস্পাহানীর বাড়ি চলে এলাম। সেদিন থেকে পরবর্তী পাঁচমাস ইসমত খানমের ওই বাড়ি আমারও বাড়ি হয়ে উঠেছিল। মহমুদ যত দিন একা ছিল, ততদিন তাঁর সঙ্গে থাকতে কোনো অসুবিধা হয়নি, কিন্তু এবার নতুন সমস্যা, অনিশ্চিত কালের জন্য এই পরিবারের অতিথি হয়ে কী করে থাকি? ভারতীয় শিষ্টাচারের মতো ইরানেও পয়সার বিনিময়ে অতিথি রাখাটাকে মর্যাদা বিরোধী ভাবা হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ কে খণ্ডাবে? ইসমত খানমের ঋণ আমি টাকা পয়সা দিয়ে শোধ করতে পারব না। অল্প কালের মধ্যে আমিও ওই পরিবার ভুক্ত হয়ে পড়লাম। আমার প্রতি গৃহস্বামীর ব্যবহার ছিল একাধারে রাশভারী এবং মধুর। সেই পাঁচমাস ইরানের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে কাটিয়ে খুব কাছ থেকে তাদের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি। ইসমত খানম খুব সুন্দর সেতার বাজাতেন, এবং প্রায় প্রতিরাত্রিতে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে সংগীতের আসর বসত। ইসমত খানম সেতার বাজাতেন। বিয়ে যখন একেবারে ঠিকঠাক ঠিক সেই সময় মহমুদের সঙ্গে তাঁর বিমাতার দেনা পাওনা নিয়ে মতভেদ শুরু হলো। ইসমত খানমকে আমি খুব একটা দোষ দিই না, কারণ যে দেশে পুরুষেরা যে কোনো সময় তালাক দিয়ে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে সেখানে কন্যাপক্ষ কিছু আর্থিক নিরাপত্তার দাবি অবশ্যই করতে পারে। ডিসেম্বরের শেষদিকে পবিত্র মহরম মাস এসে গেলো। ইরানের অধিকাংশ লোকই শিয়াপন্থী, সেজন্যই হজরত ইমাম হোসেনের শাহাদতের দিনটিকে স্মরণ করে যথেষ্ট শোক উদ্‌যাদনা দেখানো হয়। সে বছর মহরমের শেষ দিন পড়েছিল ২৫ ডিসেম্বর, খ্রিস্টানদের বড়োদিন। ইরানে এখন মহরমের দিন মেয়েদের ‘গিরিয়া’ অর্থাৎ কান্না এবং পুরুষদের ‘সীনাজনি’ অর্থাৎ বুক চাপড়ানো আইন করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইসমত খানমের ঘরে একদিন এক মোম্বা মিনিট পনেরোর জন্য এল, এসে কিছু মার্সিয়া গাইল আর খানম তা শুনে কাপড়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদল।

এখন আমার দিনচর্যা ছিল এরকম। সকাল সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে উঠে মুখটুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে, প্রতরাশের টেবিলে বসা। সেখানে পনির, মাখন সহযোগে বুটি খাওয়া এবং তারপর গ্লাস তিন বিনা দুধের মিষ্টি চা খাওয়া। বেলা আটটা থেকে নটার মধ্যে পরিবারের সকলেই কুরসি ঘরে পৌঁছে যেত। ইরানে ঠান্ডার প্রকোপ এতই বেশি যে ঘর গরম রাখতে হয়। কিন্তু মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান ও ইরানে কাঠের অভাব থাকায় লোকে কুরসির কায়দা চালু করেছে। এক বর্গগজ আয়তনের একটি চৌকি, মেঝে থেকে যার উচ্চতা একহাত তাকেই বলে কুরসি। যার ওপরে মোটা করে বড়ো লেপ বিছানো থাকে। চৌকির চারদিক থেকেই লেপ হাত দুয়েক বেরিয়ে থাকে। চৌকির নীচে আংটার কাঠকয়লার আগুন জ্বলে যাতে কুরসি গরম হয়ে ওঠে এবং উত্তপ্ত কুরসির ওপরে বিছানো লেপের মধ্যে তার খানিকটা তাপ সঞ্চারিত হয়ে যায়। সকলে ওই চৌকিকে ঘিরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে, লেপের ঝোলা অংশ যতটা সম্ভব শরীরের ওপরে ঢাকা দেয়। কম খরচে ঘর গরম রাখার এক উত্তম প্রক্রিয়া। কুরসির নীচে বসে বইপত্র পড়া না হলে নিছক গল্পগুজব করা এটাই ছিল কাজ। এই গল্পগুজবের আড্ডাটা আমার পক্ষে খুব উপকারী ছিল, কারণ এখানে কথাবার্তা যা হতো সবই ফারসিতে। বেলা একটায় বুকেয়া রান্না করে আনত, যার মধ্যে থাকত মোটা মোটা তন্দুরী বুটি, ভাত কিংবা পোলাও, মাংস, সবজি, কিছু কুচো সবুজ পাতা আর জারানো পেরঁয়াজ ছিল প্রধান। যেদিন বাইরে কাজ না থাকত, সেদিন খাওয়ার পর ওখানেই খানিক গড়ানো। বেলা তিনটে চারটের সময় আবার কয়েক গলাস মিষ্টি চা পান। নৈশ আহার হতো সঙ্গে সাতটা

থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। তখন থাকত ভাত, মাংস, সবজি, আচার, বুটি, কলবাসা (সসেজ)। এরপর থাকত পর্তুগাল (মুসম্বি) কিংবা অন্য কোনো ফল। তারপর রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত গান বাজনা, আড্ডা চলত। মহম্মদের স্বাভাব্য এত দিনে আমার ভালো করে চেনা হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের ব্যাপারে কোনো গণ্ডগোল দেখা দিলে তিনি খুব ঘাবড়ে যেতেন।

সে বছর জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত ঠান্ডা দাপিয়ে বেড়াল। ইরানী বাচ্চারা সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করত।—

খুর্শীদ খানম আফতাব কুন। রকসের বিরঞ্জ তুয়ে-আব কুন।

(সূর্য দেবী রোদ্দুর দাও, একসের চাল জলে দাও)

মা বচ্চ হয়ে-গুর্গ এম্। অজ-সরমায় মী-মুরেম

(আমরা নেকড়ে শাবক — ঠান্ডায় মরতে বসেছি,)

কিন্তু বাচ্চাদের আফতাব অর্থাৎ রোদ্দুর দেবার ক্ষমতা খুরশিদ খানমের তখনও হয়নি, হতে হতে এপ্রিল পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ৬ এপ্রিলের পর থেকে গাছে গাছে নব মঞ্জুরীর আবির্ভাব হতে লাগল।

মহম্মদ নিয়মিত নামাজ পড়ে না বলে ইসমত খানম অনেক অনুযোগ করছিলেন।—‘গুনাহ অস্ত বরায় হর মুসলমান নামাজ লাজিম অস্ত (এটা পাপ। সমস্ত মুসলমানেরই কর্তব্য নিয়মিত নামাজ পড়া)। আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলো—‘হর কসে কি শরাব ন মীখুরদ, বরায় উন নামাজ মাফ অস্ত’ (যারা মদ খায় না, তাদের জন্য নামাজ মাফ)। আমি সেই মুহূর্তে বুঝতে পারিনি যে আমার কথা খানমের কোনো মর্মস্থানে আঘাত করে ফেলেছে। তিনি দাবুণ উত্তেজিত হয়ে বললেন—‘তু পয়গম্বর অস্তি?’ (তুই কি পয়গম্বর?) ইসমত খানম তখন চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের সুন্দরী, তাঁর রাগান্বিত মুখের ভাবটি ছিল দেখার মতো। তখন সকালের চায়ের সময়, তখনও ইসমত খানমের ঠোঁটে গালে প্রসাধনের প্রলেপ চড়েনি। তপ্ত লোহার সাহায্যে কৃত্রিম ভাবে কৌকড়ানো চুলে চিবুনির সযত্ন ছোঁয়াও পড়েনি। গলার দুদরী মুস্তার মালাটিও ছিল অদৃশ্য আর বুকের ওপরে একগুচ্ছ হীরে বসানো ব্রোচও ছিল অনুপস্থিত। চেহারার মধ্যে ঔজ্জ্বল্যও ছিল না। কারণ সকালবেলার চা পান সেরেই ইসমত খানম তাঁর শৃঙ্গার পর্ব শুরু করতেন। খানমের দুই চোখ তখন রাগে লাল এবং দুঃখে জলপূর্ণ। তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠে প্রচণ্ড ক্রোধের প্রকাশ ছিল। প্রকৃত পক্ষে তাঁর বলা উচিতছিল যে শুভা (আপনি) আর আমি তো খোদা নই, নামাজ মাফ করার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। কিছুক্ষণ পর সামলে নিয়ে নরম গলায় খানম বলতে লাগলেন—‘বিশ্বে ইসলাম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অস্তিম ধর্ম’। তারপর খোদা এবং ইসলাম বিষয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিতে লাগলেন। আমি যে আপাদমস্তক নাস্তিক সেটা আগা দিমিয়াদ জানতেন, কিন্তু ইসমত খানমের জানা ছিল না। মুখ ফসকে বলে ফেলা কথার জন্য স্বভাবতই অনুতাপ হচ্ছিল। কারণ পরে আমার মনে পড়ল শৌখিন এবং বিলাসিনী ইসমত খানম সরাবের প্রতি বিশেষ দুর্বল। যদিও দিনে বার দুয়েক নামাজ তিনি অবশ্যই পড়তেন। খানম জানতেন মদ্যপানে আমার বুটি নেই এবং বুদ্ধের অনুগামী। তবে বুদ্ধের ধর্ম কী বস্তু তা খানমের জানার বাইরে ছিল। যে নিয়মিত নামাজ পড়ে তার অল্প বিস্তার মদ্যপান খোদা মাফ করে থাকেন, এ জাতীয় কিছু বললে খানম খুশি হতেন। বস্তুত খানম একজন কোমলহৃদয়া মহিলা ছিলেন। ইমাম হোসেনকে নিয়ে গাওয়া মার্সিয়া

শুনে তাঁর চোখে জল আসত। তেহরানে আসার পাঁচ মাস পরও যখন আমার ভিসার সমস্যা মিটল না, তখন আমি তাঁর আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র থাকা স্থির করেছিলাম। তখনও আমার জন্য খানমের চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখেছি। একদিন আমার সামান্য জ্বর হয়েছে শুনে বুকেয়াকে (চাকরানি) আমার সেবার জন্য পাঠিয়ে নিজে গৃহস্থালীর কাজ করতে লেগেছিলেন, যেটা তাঁর মতো একজন শৌখিন মহিলা কদাপিই করতেন।

দুই বন্ধু

দুই বন্ধু কথাটার অর্থ এই নয় যে তাঁরা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। এমনকি আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে তাঁরা একে অপরকে দেখেনওনি। দুজনেরই জন্ম বাংলায়, একজনের কলকাতায়, অন্য জনের হুগলিতে। দীর্ঘকাল ধরে আমার সমস্ত ভ্রমণযাত্রার সঙ্গী ক্যামেরাটিকে যুদ্ধের কড়াকড়ি নিয়মের জন্য কোয়েটাতে রেখে আসতে হয়েছে, সেজন্য আমার বন্ধুদের কোনো ছবি তুলে রাখতে পারিনি।

১) দিমিয়াদ — আমার এই দুই বন্ধুর মধ্যে একজন সত্তর অতিক্রান্ত অন্যজন সদ্য তিরিশ পার করেছেন। বৃদ্ধ আগা আমীর আলি দিমিয়াদ, সৌজন্য এবং সারল্যের এক বিরল দৃষ্টান্ত, এবং সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে ছিল এক ধরনের আদর্শবাদ যার জন্য বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে ভারত ছেড়ে ইরানে চলে আসতে হয়েছে। আগা দিমিয়াদ একজন ইরানী এবং তাঁদের বংশের ইরানী সত্তা বজায় রাখার জন্য তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন, বলতে পারি না। হয়তো ভারতবর্ষে থাকার সময় তাঁরা বাড়িতেও ফারসিতেই কথাবার্তা বলতেন। দিমিয়াদ সাহেবের স্ত্রীকে দেখলে মনে হতো ভদ্রমহিলার বয়স তাঁর স্বামীর চেয়ে অন্তত বিশ বাইশ বছর কম। হতে পারে দুজনের বয়সের পার্থক্য অত নয়, খানম সাহেবা বেশ কৃশাঙ্গীনি ছিলেন, সেজন্যও ওরকম মনে হতে পারে। খানমেরও ভারতবর্ষে জন্ম। আমি তাঁদের বাড়ি গেলেই মহিলা আমাকে কোনো একটা ভারতীয় রান্না রন্ধ খাওয়াতেন। একদিন খানম হাসতে হাসতে বলছিলেন—‘জানেন, আমার এক অযোধ্যার তালুকদারের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল।’ তরুণী বয়সে খানম নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ছিলেন, না হলে ওরকম উঁচু ঘরানা থেকে সম্বন্ধ আসবে কেন? দিমিয়াদ দম্পতির একটি ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের শিরায় বাবা মায়ের চেয়েও বেশি ইরানী রক্ত দাপিয়ে বেড়াত। যখন সে খবরের কাগজে পড়েছিল যে রজা শাহ নতুন ইরান গড়েছেন, অখামনশী এবং সাসানীয় ইরান আবার ফিরে আসছে তখন সে আর ভারতে থাকতে চায়নি। বস্তুত ইরানে চলে আসার পিছনে নিজের জাতীয়তাবোধ এবং সম্ভানদের আগ্রহ, দুটোই কাজ করেছিল। ভারতবর্ষে তাঁদের যা সম্পত্তি ছিল, এদেশে আসার আগে সে সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিয়েছেন, ভদ্রলোকের বিষয়বুদ্ধি কিরকম ছিল সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবে কাজের মধ্যে একটা কাজ করেছিলেন। তেহরান শহরে একখানা বাড়ি কিনিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে যখন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখনও তাঁর বাড়ি সম্পূর্ণ হয়নি এবং তাঁর বাড়ির চারদিকে অনেক খালি জায়গা পড়েছিল। তারপর নয় বছর কেটে গেছে। তেহরান শহর আয়তন ও জনসংখ্যা দুদিক থেকেই বেড়েছে। আজ যখন আমার ভ্রমণ

বৃত্তান্ত ছেপে বের হতে যাচ্ছে, তখন হয়তো দিমিয়াদ সাহেব ইহজগতে নেই। ভালো মানুষ দিমিয়াদ সাহেবকে তাঁর খোদা নিশ্চয়ই বেহেস্তে ভালো জায়গাতে ঠাই দিয়েছেন, যা অন্তত তাঁর তেহরানের বাড়ির চেয়ে খারাপ হবে না। আমার সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল, যদিও আমাদের দুজনের ভাবনা চিন্তার মধ্যে জমিন আসমান ফারাক ছিল। তাঁকে কটুর মুসলমান বলা যাবে না, কারণ তাঁর মধ্যে কখনও কোনো অসহিষ্ণুতা দেখিনি, কিন্তু তিনি সাক্ষা খোদার বান্দা ছিলেন। বুড়ো বয়সে তাঁর চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারই মধ্যে তিনি নামাজ পড়া চালিয়ে যেতেন, কচিং কখনও বাদ পড়ত। অন্যদিকে আমি তো খোলাখুলি খোদার ওপরে অবিশ্বাস প্রকাশ করতাম। তিনি জানতেন, যদি সত্যি সত্যি কখনও তাঁর খোদার মুখোমুখি আমি হই, তাহলে নির্ঘাত তাঁকে দুকথা শুনিয়ে ছাড়ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে আত্মীয় বলে গণ্য করতেন। সাত মাসের প্রতীক্ষার পর যখন রাশিয়ায় যাই, তখন তিনি চুপিসাড়ে একটা খাম আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। খামের মধ্যে ছিল তাঁরই লেখা একটা ইংরেজি কবিতা, যাতে আমার সম্বন্ধে অনেক অতিশয়োক্তি ছিল।

দিমিয়াদ সাহেবের চেহারা ছিল সুগঠিত এবং সুন্দর এবং সেই সঙ্গে তাঁর ছিল এক বুচিশীল মন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন নামকরা চিকিৎসক এবং বেশ উঁচু সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ছেলে দিমিয়াদকে তিনি ব্যারিস্টার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পিতার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ব্যারিস্টারি পড়া অসমাপ্ত রেখে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়। প্রথমে তাঁরা কলকাতায় ছিলেন, পরে লক্ষ্ণৌতে চলে আসেন। অনেক বেশি বয়সে তাঁর খেয়াল চাপল যে তিনি উর্দুতে এম.এ. করবেন। আগ্রা অথবা লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. দেবার কিছু অসুবিধা থাকায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দেওয়া স্থির করলেন। তাঁর কথায়—‘পড়াশোনা যা হয়েছিল, তা বলার মতো নয়। তবে ওখানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম থাকায় অধ্যাপকরাই উদ্যোগী হয়ে ছাত্রদের পরীক্ষায় বসার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। ছাত্র সংখ্যা একেবারে না থাকলে বা কমে গেলে অধ্যাপকদের অবস্থা কী হবে সেই আশংক্যতেই হয়তো তাঁরা এতটা করেছিলেন।’ যাই হোক, লেখাপড়া ছাড়ার কুড়ি বছর পর দিমিয়াদ সাহেব এম. এ. পাস করলেন। একদিন তিনি বলছিলেন, ‘বোকামি হয়ে গিয়েছে ব্যারিস্টারি না হয় নাই বা হলো, হল্যান্ড কিংবা জার্মানি থেকে অন্তত যদি একটা পি-এইচ. ডি. তকমা আনতে পারতাম।’ বলে তিনি জার্মানি ও হল্যান্ডের দুটো শহরের নাম করলেন যেখানে পি-এইচ. ডি. কেনা ডাকঘর থেকে ডাকটিকিট কেনার মতোই সহজ।

নয় বছর আগে যখন দিমিয়াদ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তখন তিনি অনেক বেশি শক্তপোক্ত ছিলেন। তখন দুমাইল পথ হেঁটে আমার কাছে সংস্কৃত শিখতে আসতেন। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষাও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাঁর ওরকম আগ্রহ হয়েছিল। এখন তিনি প্রায় অশক্ত, চোখে মুখে বার্ধক্যের ছাপ, স্মৃতিশক্তি প্রায়শই বিশ্বাসঘাতকতা করে, ইন্দ্রিয়াদিও এত শিথিল হয়ে পড়েছিল যে সামান্য প্রশ্নবও রোধ করতে পারতেন না। যুদ্ধের দিনে তেহরান ছিল অত্যন্ত দুর্মূল্য শহর। সেই দুঃসময়ে তিনি কিভাবে জীবনযাত্রা চালিয়েছেন জানি না। তাঁর ছেলে বিয়ে করে দূরে অন্য এক শহরে থাকত। ইংরেজি জানার জন্য অ্যাংলো-ইরানীয়ান পेट্রোল কোম্পানীতে তার একটা কাজ জুটে গিয়েছিল। মেয়ে তাহিরা লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ.

পাশ করেছিল। কিন্তু এখানে এসে তাকে আবার সব নতুন করে পড়তে হচ্ছে। কারণ এখানে পড়াশোনার মাধ্যম ফারসি। তাহিরা তার কৈশোরের স্মৃতিধন্য 'বৃদ্ধগোমতী' (গোমতী নদী) নামে এক কবিতা লিখেছিল, সেটা আমি তেহরানের এক ইরানী সাময়িক পত্রিকায় পড়েছিলাম। ছেলে এখানে বিয়ে সাদি করে সম্পূর্ণ ইরানী হয়তো হয়ে গেছে কিন্তু তাহিরা খানম দশ বছর তেহরান কাটিয়েও ত্রিশকু অবস্থায় আছে। সম্প্রতি সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সে ইরানে বিয়ে করবে না। আমি তেহরানে থাকতে থাকতেই হায়দ্রাবাদের এক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। দিমিয়াদ সাহেবের জন্য আমার খুব কষ্ট হতো। ভারতবর্ষে তাঁর জীবনকাল বিলাস বৈভবে না কাটলেও সুখে স্বচ্ছন্দে কেটেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি নিজেকে এক নিঃসহায় নিঃস্বল মানুষ হিসেবে দেখেন। তাঁর বেশভূষায় পরিপাট্যের অভাব ছিল কিন্তু প্রখর আত্মমর্যদাবোধ সম্পন্ন দিমিয়াদ সাহেব সেই সব বন্ধুদের সঙ্গেই পছন্দ করতেন, যাঁরা তাঁর বেশভূষা না দেখে, তাঁর হৃদয়কে দেখবে।

(২) আব্বাসী — এ আমার দ্বিতীয় বন্ধু। যার সঙ্গে তেহরান পৌঁছানোর পরদিনই পরিচয় হয়েছিল। ব্রিটিশ দূতাবাসের রিজিডি সাহেব আমাকে আব্বাসীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা দুজনে একই সঙ্গে ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে বাইরে এসেছিলাম। তখন তার হাতেও কোনো কাজ ছিল না, আর আমি ছিলাম তখন নেহাতই বেকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দুজনেও বন্ধু হয়ে গেলাম। কথাবার্তার ফাঁকে আব্বাসী জানাল যে তার স্ত্রী বাপের বাড়ি থাকে এবং আব্বাসী নিজেও সেখানেই থাকছে। যার ফলে ওর ভাড়া নেওয়া বাড়ি এখন খালি পড়ে আছে, ভাড়া মাসিক ত্রিশ টাকা। হোটেলওলাকে এক রাত্রির পাওনা তেরো তুমান মিটিয়ে মালপত্র একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে চলে গেলাম খয়্যাবান ফরিস্তার (রাস্তার নাম) সেই বাড়িতে। সে রাত্রিটা খুব স্বস্তিতেই কেটেছিল। কম খরচে দিন যাপনের একটা ভাবনাও ভেবে রেখেছিলাম। ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙানো টাকা থেকে আব্বাসী তার পাওনা পনেরো তুমান ছাড়াও পঞ্চাশ তুমান ধার নিয়ে আমাকে প্রায় অঁঠে জলে ফেলে দিয়েছিল। পরিচয়ের প্রাথমিক পর্যায়েই আব্বাসীর এই ব্যবহার আমার ভালো লাগেনি।

আব্বাসীকে কেউ কেউ শয়তান টাইপের মানুষ ভাবতেই পারে, কারণ তার অধিকাংশ কাজকর্মই ছিল অন্ধকারে লাফ মারার মতো। সে ভেবেও দেখত না যে তার এই লাফের ফলে অন্য কেউ অন্ধকারে পড়ল কিনা। আব্বাসীর বয়স ত্রিশ বত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু তার এই স্বল্পকালের জীবন কাহিনি নানা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ। আব্বাসীর কথাবার্তার মধ্যে কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা, এটা নিবুপণ করা সত্যি কঠিন কাজ ছিল। সে ছিল দ্বৈত সত্তার মানুষ। একদিকে মনে হতে পারে সে শয়তানেরই এক প্রতিরূপ, আবার অন্য দিকে তার মধ্যে দেবত্বেরও প্রকাশ ছিল। সাত আটা মাস একত্রে থাকার ফলে তার চরিত্রের ভালো মন্দ দুটোই যাচাই করে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আব্বাসীর অর্থের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অর্থের লোভ তার ছিল না। যদি তার মধ্যে 'পরদ্রব্যোসু লোষ্ঠবৎ' ভাবনার প্রকাশ কেউ দেখে, তাহলে বলতে হবে নিজের জিনিস সম্বন্ধেও তার ওই ধারণা ছিল। কারও অসুখ বিসুখ করলে তাকে দেখেছি জীবনপাত করে তার সেবা করতে। আব্বাসী তার প্রকৃত নাম নয়। সে ছিল বোস (বসু-বাঙালি)। ফৌজে ভর্তি হয়ে, তাদের চিকিৎসক দলের সঙ্গে জমাদার পদে বহাল হয়ে প্রথম তেহরান এসেছিল। সে সময়

যুদ্ধের বাজারে পয়সা উড়ছিল, কেবল হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষা। হাসপাতালের ওষুধপত্র কালো-বাজারে সোনার দামে বিকোচ্ছিল। ব্যবসায়ীরা হাসপাতালের ওষুধপত্র মোটা দামে কিনে আরও বেশি দামে বাজারে বেচত। আব্বাসী এই চক্রের একটা ছোট নাটবন্টু গোছের ছিল। যাইহোক, ওই কারবারে আব্বাসীও কয়েক হাজার টাকা কামিয়ে ফেলে। তার কথায় টাকার পরিমাণটা লাখের কাছাকাছি। আবার কারও কারও মতে সেটা হাজার বিশেক। তবে টাকা যেমন কামিয়েছিল তেমনই মুক্ত হস্তে খরচও করেছিল। আব্বাসী স্থানীয় এক তরুণীর প্রেমে পড়ে তাকে তেহরানে একটি বাড়ি করে দিয়েছিল। তবে এভাবে বেশি দিন চলেনি। ফৌজ থেকে তার নাম কাটা যায় এবং সে কলকাতা ফিরে যায়। তবে বেশি দিন কলকাতায় তার ভালো লাগেনি। প্রথমত তেহরানে তার একটি মেয়ে ছিল, তাছাড়া প্রেমিকার সুবাসও অত দূরে গিয়ে তাকে বিব্রত করছিল। অতএব সে ইরানে গিয়ে স্ত্রী কন্যাকে দেশে নিয়ে আসবে বলে ঠিক করল। কিন্তু যতদিন তার নামের পিছনে বোস পদবি থাকবে, ততদিন তার বিয়ে বৈধ বলে স্বীকৃতি পাবে না। অতএব কলকাতাতেই সে ধর্ম পালটিয়ে মুসলমান হলো। তার এই ধর্ম পরিবর্তনের খবর গেজেটেও ছাপা হয়েছিল। আব্বাসী হলো তার নতুন নাম। এই নামে সে নতুন করে পাসপোর্ট তৈরি করল তারপর শ'পাঁচেক টাকা এবং কিছু কাপড় চোপড় নিয়ে আবার ইরান পাড়ি দিলো। আব্বাসীর স্ত্রী কখনও ভারতে যেতে রাজি হয়, আবার কখনও বেঁকে বসে। এরকম দোটানার মধ্যেই তার চার পাঁচ মাস কেটে গেছে। সঙ্গের টাকা পয়সাও নিঃশেষ। বাড়ি ভাড়া বাকি। আর ঠিক ওই সময়ে ভাগ্যের ফেরে আমিও তেহরানে উপস্থিত।

এবার আব্বাসীর অতীত জীবনের দিকে তাকানো যাক। তবে আমি তো আগেই বলেছি যে আব্বাসীর সমস্ত কথার মধ্য থেকে সত্য মিথ্যার পরিমাণ নিরূপণ করা যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার। এমনও হতে পারে যে সত্য ভেবে যে জীবন কাহিনি লিখছি তার আগাগোড়াই মিথ্যা। বোস ম্যাট্রিক পাস করে, কলকাতার কোনো এক কলেজে পড়ত। কিন্তু তার মধ্যকার ভবঘুরে প্রবৃত্তি তাকে বেশিদিন পাঠ্য বইতে মনোনিবেশ করার সুযোগ দেয়নি। বোসের পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। বাড়ি থেকে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে সে সিঙ্গাপুর পাড়ি দেয়। শারীরিক শ্রমের কাজে সে তত উৎসাহী না থাকলেও যে কোনো কাজকেই উতরে দেবার মতো একটা ব্যাপার তার মধ্যে ছিল। আব্বাসী যে খুব কম কথা বলত এমন নয়, আবার তাকে বাচাল বলাও ঠিক নয়। তার চেহারার মধ্যে একটা সারল্যের ভাব ছিল। সমস্যা তার ছিল একটাই— অর্থান্ধ। কয়েক মাস সিঙ্গাপুরে কাটিয়ে আবার সে সিন্দবাদ নাবিকের মতো জাহাজে চড়ে ভাগ্যস্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সমস্ত অঞ্চল, জাভা ফিলিপাইনস, হংকং, সাংহাই তার ঘোরা হয়েছে। এই পর্যায়ে সে কখনও সেলসম্যান, কখনও ফেরিওয়ালা আবার কখনও কেরানিগিরি করেছে, হাতে যখন টাকা থাকত তখন তার চতুর্দিকে ভালোমন্দ বন্ধুদের ভীড় জমে যেত। তার সমস্ত আয়ই যে বৈধ উপায়ে হতো না, এটা তো স্বতঃসিদ্ধ। সেলসম্যান থাকার সময় দুজায়গায় মোটা রকমের অর্থ তছরূপ করে এবং অল্পদিনেই তা উড়িয়ে দেয়। এভাবে পাঁচ বছর জাহাজে জাহাজে সিন্দবাদ নাবিকের ভূমিকা পালনের সময় সে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছে এবং সে-ভাবেই ব্যয় করেছে। দুনিয়া সম্বন্ধে একবছরে সে কিছু তিস্ত মধুর অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিল।

যুদ্ধের ঠিক আগে সে রিজহস্তে কলকাতায় ফিরে এসেছিল। কিন্তু এক জায়গায় বাঁধা থাকার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। তখন যৌজে লোক নেয়া হচ্ছিল। আব্বাসী সেখানে নাম লিখিয়ে চলে আসে লক্ষ্মীতে। সেখানে কিছুদিন শিক্ষানবিশির পর তেহরানে।

আমি যখন আব্বাসীর সমস্ত কিসসা শুনি, তখন ভেবেছিলাম এই মজনুর লায়লা না জানি কোন হুরী পরী হবে। ভাগক্রমে কিছুদিনের মধ্যেই খানম আব্বাসীর সঙ্গে পরিচয় হলো। আমি তো তাকে দেখে হতবাক। আব্বাসীর মতো মজনু, যে এর আগে কম করেও অন্তত পঁচিশ ঘাটের জল খেয়েছে, সে এরকম এক কুৎসিত মহিলার জন্য দিওয়ানা হয়ে গেলো? খানমের মুখমণ্ডল শরীর আন্দাজে বড়ো এবং তেলরাখার চামড়ার মশকের মতো স্ফীত, তার ওপর সারা মুখে বসন্তের দাগ মুখটাকে একটা বাটনা বাটা শিলে পরিণত করেছিল। তবে গায়ের রং যে ফর্সা ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

অল্প দিনের মধ্যেই আমি আব্বাসীর ডেরা ছেড়ে মহমুদের কাছে চলে যাই কিন্তু আব্বাসী বরাবর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। তেহরানের মতো শহরে সে কিভাবে দিন গুজরান করত আমি জানি না, তবে তেহরানে নেমে তার যে অবস্থা দেখেছিলাম, সাতমাস পর তেহরান ছাড়ার কালেও তার একই অবস্থা দেখেছি। তার তখনো আশা বউ মেয়ে নিয়ে দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু তার স্ত্রী যেতে রাজি হবে এ বিশ্বাস আমার ছিল না। আব্বাসী কলমজীবী বাঙালি পরিবারের সন্তান, বেচাকেনার কাজ করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। না হলে তেহরানে না খেয়ে মরার কথা নয়। তেহরান বাসের শেষ দিকে আমি মহমুদের বাসা ছেড়ে একটা হোটেলে এসে বাস করছিলাম, ভারত থেকে টাকা আসায় আমার আর্থিক অবস্থাও মোটামুটি স্বচ্ছল হয়ে গিয়েছিল। এরকম অবস্থায় একদিন আমার জ্বর জ্বর ভাব দেখা দিলো। হোটেলে দেখা শোনার কেউ নেই। খবর পেয়ে আব্বাসী আমাকে জোর করে তার শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে তুলল। সেখানে একখানা মাত্র ঘরে সে তার স্ত্রী, শাশুড়ি এবং এক শ্যালিকা থাকত। আমার কোনো বারণ সে শোনেনি। আমার সেবা করার সময় তার রূপ ছিল দেখার মতো। আমি কয়েকটা দিন এক দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ইরানী পরিবারকে দেখলাম। কয়েক সপ্তাহ আগেই তার শ্যালিকার বিয়ে হয়েছে। বিয়েতে আমিও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলাম। আব্বাসী তার শ্যালিকাকে ওরকম একজন আফিংখোরের সঙ্গে বিয়ে দিতে যথেষ্ট বারণ করেছিল। কিন্তু তার শাশুড়ি শোনেনি। সে বেচারাই বা কি করে? যে কোনো-ভাবে সে অবিবাহিত মেয়ের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে চেয়েছে। আব্বাসীর শ্যালিকা মেহরী খানমের মাত্র দুমাস হলো বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ গালিগালাজের স্তরে পৌঁছে গেছে। আমার তেহরান ছাড়ার সময় অবস্থা তালুক পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল। প্রথমদিকে আমার দুঃসময়ে আব্বাসী আমার থেকে পঞ্চাশ তুমান নিয়েছিল, সেটা আমার তখন ভালো লাগেনি। কিন্তু আজ একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে তার বন্ধুত্বের উষ্ণতা, সেবাপরায়ণ মনের মূল্য ওই পঞ্চাশ তুমানের চেয়ে অনেক বেশি।

ইরানী বিয়ে

আমি যখন বন্ধু মির্জা মহমুদের বিমাতার বাড়িতে অতিথি ছিলাম তখন মহমুদের দ্বিতীয়বার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। পাত্রী ছিল বিমাতা ইসমাত খানমের ছোট বোন। মহমুদের দৌলতে

আমিও ওই পরিবারের একজন বলেই বিবেচিত হতাম। তবুগী বয়সে ইসমত খানম তেহরানের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের একজন ছিলেন, সন্দেহ নেই। বয়স চল্লিশের দিকে চললেও তাঁর সেই সৌন্দর্য এখনো যথেষ্টই বর্তমান ছিল। মহমুদের সঙ্গে তাঁর ছোট বোনের বিয়ের ব্যাপারে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী, যদিও তাঁর অনেক শর্ত ছিল। যার ফলে একদিন শূনি বিয়ে একেবারে ঠিক আবার পরদিন শূনি নতুন কোনো শর্ত এসে পাকা কথা কাঁচিয়ে দিয়েছে। ৯ মার্চ বিয়ের দিন ঠিক হয়ে নিমন্ত্রণ চিঠি আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠানো হয়ে যাবার পর সন্ধ্যাবেলা গিয়ে শূনি, বিয়ে হচ্ছে না। দুটো শর্তকে কেন্দ্র করে যত আপত্তি। প্রথমত ইজ্জত খানমকে (পাত্রী) অন্য দেশে অর্থাৎ ভারতে নিয়ে যাওয়া চলবে না, দ্বিতীয় শর্ত, ছমাস পর্যন্ত খরচ খরচা না দিলে বিয়ে আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যাবে। মহমুদের বাবা ইস্পাহানের সওদাগর বংশের লোক হলেও কয়েক পুরুষ ধরে ভারতবর্ষের বাসিন্দা ছিলেন। তবে ইরানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন কখনওই হয়নি। মহমুদের জন্ম হয়েছে ভারতে। তার মা ভারতীয় এবং সেও মানসিকভাবে চিরকালের জন্য ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে অনিচ্ছুক ছিল। সেজন্যই সে বিবাহপত্র বা কব্বালাতে ওই দুই শর্তের উল্লেখ আপত্তি জানাল। মহমুদের জেদ দেখে ইসমত খানম খানিকটা পিছু হটলেন, শর্তের কিছু পরিবর্তন করা হলো। নতুন শর্ত হলো যে ইজ্জত খানমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ১৩ মার্চ বিয়ের দিন ঠিক হলো।

ভারতবর্ষের মতো ইরানেও মধ্যবিত্ত পরিবারে বিয়ের ব্যাপারটা 'ঘর পুড়িয়ে হোলি খেলার' মতো। মহমুদ কৃপণ ছিল না, তাকে মিতব্যয়ী বলাই সঠিক। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মাথায় মুষলাঘাত হয়েছিল, অতএব খরচের বিষয়ে তার কিছুই করার ছিল না।

বিয়ের ঘর—বিয়ের ঘরের একদিকে বরকনের জন্য দুটো সাধারণ গোছের চেয়ার রাখা ছিল, আর একটা টেবিলে ছিল সুগন্ধি জিনিস। প্রসাধনী দ্রব্য, ব্রাশ, আয়না ইত্যাদি, আর টেবিলের টানায় ছিল গয়নাগাটির বাস্ক। চেয়ারের বিপরীত দিকের একটা টেবিলে ছিল একখানা কোরান শরিফ, তসবি (মালা) নামজ পাঠের মোহর, আর বাঁ-দিকে একটা পেয়ালায় ভালো শামশাদের (দেবদারুর মতো এক ধরনের গাছ) সবুজ পাতা আর ফুল ছিল। ডানদিকে একটা রেকাবিতে কিছু শিরিনি (বিস্কুট জাতীয়) ছিল। সেখানেই কাঠের তৈরি নৌকাকৃতির একটা লম্বাটে বারকোশও ছিল যেটিকে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছিল। বারকোশের চারকোণায় চারটি ফানুসের দীপাধার ছিল, মোমবাতি জ্বালার জন্য, আর তার কাছেই একটা ফুলদানিতে শামশাদের সবুজ পাতা ভরা ছিল। বিয়ের সময় এখানে শামশাদের পাতার ততটাই কদর যতটা আমাদের দেশে আমপাতার। বিয়েতে দর্পণ দানকে অত্যন্ত শুভ মনে করা হয়। চেয়ারের ঠিক সামনে, একটা টেবিলে ছিল একখানা আয়না যেটা আবার বুপোর ফ্রেমে বাঁধানো। আয়নার দুপাশে মোমবাতির আকারে বৈদ্যুতিক বাতিদান ছিল। ওখানেই ডানদিকে, ইরানে ইসলামি অনুপ্রবেশের আগেকার বিয়ের রীতি অনুসারে আরেকটি নৌকাকৃতি বারকোশে খড়্গের আকারের হাত দেড়েক লম্বা একটা বুটি ছিল। বুটির ওপরেও নানারকম কারুকাজ করা ছিল। বুটির ওপরে সবুজ রং দিয়ে ফুলপাতা এবং লাল রং দিয়ে মাটিকে বোঝানো হয়েছিল। সবুজ, শ্যামলকে জীবনের মূল হিসেবে চিহ্নিত করার প্রতীক ছিল সেটি। বুটির ওপরে নীচে শামশাদের গাছ আঁকার চেষ্টা হয়েছিল আর তার নীচে তিন

লাইনে একটি মঙ্গলবচন লেখা হয়েছিল —

শুক্ৰ ইজদ কি বখ্ত-যার আমদ! (ধন্য ভগবান! বন্ধুর ভাগ্য ফিরল)

মুবারক বাশদ (মঙ্গল হোক)

জোহা বা মুশতীর কনার আহমদ। (শুক্ৰদেবী আজ বৃহস্পতির কাছে)

দ্বিতীয় ঘরটি নতুন বরকনে এবং তাদের বাছাই করা আত্মীয় বন্ধুদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এখানে একটা বড়ো টেবিলে দশজন লোকের উপযুক্ত চামচ, কাঁটা, প্লেট ইত্যাদি ছিল। তৃতীয় একটি ঘরে বরকনের শয়নকক্ষ রচনা করা হয়েছিল। সেখানে ঘরের দরজায় সুন্দর রেশমি পর্দা, ঘরের ভিতরে নতুন খাট, বালিশ, তোশক, সিল্কের লেপ ইত্যাদিতে সাজানো শয্যা প্রস্তুত ছিল। চতুর্থ কামরাটি ছিল অন্যান্য অতিথি অভ্যাগতদের জন্য।

১৩ মার্চও বেশ ঠান্ডা ছিল। আমাদের দেশের মতো ইরানেও বিয়ের দিন কয়েক আগে থেকেই পরিবারের মধ্যে গান বাজনার আসর বসে। উদ্যোক্তা মূলত মেয়েরাই। তবে বর্তমানে ইরানে পর্দাপ্রথা ঘুচে যাবার ফলে পুরুষেরাও এতে অংশ নেয়। বাজনার মধ্যে ডাফলি, আর কলসির মতো মুখের একদিক খোলা চামড়ার ঢোলই প্রধান। ইরানী মেয়েরা কোকিলকণ্ঠী নয়, একথা বলা হয়তো অনুচিত, তবে তাদের গান বাজনা আমাদের ভারতীয় কানে কিছুটা কর্কশ লাগে। গান গাওয়ার সময় কখনও কখনও দুদলে ভাগ হয়ে চাপান-উতোর ঢঙে গাওয়া হয়। একটা গানের চরণ ছিল এরকম :

খানম অবু সে মগনা মিদুনী কী এ? (শ্রীমতী বধু, কে আমি জানি না।)

তার পরবর্তী লাইন এরকম

জুজা খবুমে - মগনা মিদুনী কী এ? (মুরগির বাচ্চা, কে আমি জানি না?)

আগা দামাদ - " (শ্রীমান বর ")

শাখে শামশাদ - " (শামশাদের শাখা ")

আগা সরহংগে - " (শ্রীমান মেজর ")

রইস এ-হংগে - " (যুদ্ধের সর্দার ")

আগা সরগুদে - " (শ্রীমান কর্নেল ")

দিলে মা বুর্দে - " (আমার হৃদয় হয়েছে ")

সরহংগে অর্থাৎ মেজর ছিল কনের ভগ্নীপতি এবং কর্নেল ছিল সম্বন্ধী। বলা বাহুল্য এভাবে বরকনের যত আত্মীয় পরিজন আছে তাদের সকলকেই গানের মধ্যে আনা হয় এবং গানের চরণ বেড়েই চলে। কিছুক্ষণ গান বাজনার পর, গান থামিয়ে শুধু বাজনা বাজানো হয়, আর কিশোরী বয়সের মেয়েরা নাচ দেখায়। নাচিয়েদের দলে মহমুদের ছোট বোন শামশী খানমের নাচ খুব সুন্দর হয়েছিল। গানের শেষে মেয়েরা সমবেতভাবে উলুধ্বনি দেয়। বাঙালিদের বিয়েতেও দেখেছি এই উলুধ্বনির একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। এখানে উলুধ্বনির উদ্দেশ্য, বিয়ের শুভ আসরে অনিষ্টকারী ভূতপ্রেতদের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আসতে না দেয়া।

বিয়ের দিনের প্রধান কাজকর্ম শুরুই হয় স্নান পর্বের মধ্য দিয়ে। সেদিন কনের জন্য বিশেষভাবে হামাম (স্নানাগার) সাজানো হয়েছিল। সাধারণভাবে সমস্ত ইরানীদের গায়ের রং ফর্সা।

আর সেদিন তো আঠারো বছরের তরুণী কনের গায়ের রং মনে হচ্ছিল গোলাপি। সদ্য স্নান সেরে আসার জন্য সেই গোলাপি রংও যেন আরও উজ্জ্বল লাগছিল। স্নানের পর তাকে বিশেষভাবে সাজানো হলো তবে বাসর সজ্জার সাজপোশাক তোলা ছিল পরের দিনের জন্য। সে দিন বড়ো নিমন্ত্রণ ও উৎসব পালনের দিন। আজকে স্নানের পর অবুস অর্থাৎ কনেকে পরানো হয়েছিল সাদা লম্বা রেশমি চোগা, মাথায় ছিল ফুল দিয়ে সাজানো অর্ধচন্দ্রাকৃতির এক তাজ। বরের পরনে ছিল কালো রঙের সুট। মাথায় টুপি না থাকায় মহমুদের টাক দৃশ্যমান ছিল। দুজনকে চেয়ারে বসাবার আগে খানিকটা আশ্বন্দ (ধূপ) কনের মাথার ওপরে ঘুরিয়ে আগুনে ফেলা হলো। এটা করার উদ্দেশ্যও ভূত প্রেত তাড়ানো। বরকনে চেয়ারে বসার পর মেয়েরা নাচ শুরু করল আর বাকিরা হাততালি দিয়ে তাল মেলাতে লাগল। এর মধ্যে ‘আগা দামাদ’ জাতীয় গানও বারকয়েক গাওয়া হলো।

বিবাহ বিধি— সন্ধের সময় অখুন(পুরোহিত) তাঁর সহকারিকে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে এলেন। যদিও ইরানের স্ত্রীপুরুষ সকলেই এখন ইওরোপীয় পোশাক পরতে অভ্যস্ত কিন্তু মোল্লা পুরোহিত এখনও তাদের পুরানো পোশাকেই কায়েম আছে। অখুনের পরনে কালো চোগা, মাথায় কালো পাগড়ি। দাড়ি সম্পূর্ণ কামানো নয়, খুব ছোট করে ছাঁটা। চেয়ারে বসে প্রথমেই তিনি পাত্রপাত্রীর জাবাজ (পাসপোর্ট) দেখলেন। তারপর দুটো ছাপানো রেজিস্টারে বয়ান লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। এর পর অখুন বিয়ের শর্তাদি পড়তে লাগলেন — একশো চল্লিশ হাজার রিয়াল — দেনমোহর — যার মধ্যে ত্রিশ হাজার রিয়াল (তিন হাজার টাকা) গলার হার এবং দশ হাজার রিয়াল কাঁচের ঝাড়বাতির জন্য এবং পঞ্চাশ রিয়াল কলামমজীদ অর্থাৎ কোরান শরিফের জন্য মূল্য ধার্য করা হলো। ইরানের বাইরে চিরকালের জন্য থাকা একান্তই পাত্রীর ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করবে। জিয়া ইমামী নকি এজিদ এবং সরহংগ (মেজর) আলি আকবর জাহাঙ্গিরী (কনের ভগ্নিপতি) বিয়ের সাক্ষি হলেন। বরের স্বীকৃতি হয়ে যাবার পর অখুন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনবার কনেকে জিজ্ঞেস করলেন— ‘অবুসে খানম, কুবলদারি?’ (শ্রীমতী কনে আপনি কি এই বিবাহ স্বীকার —করছেন?) কনে আনত স্বরে উত্তর দিল— ‘বালে’(হ্যাঁ)।

অখুন তার দক্ষিণা নিয়ে মুখমিষ্টি করে বিদায় নিল। মেয়েরা আবার ‘মুবারকবাদা’ আর ‘মগলা মিদুনী’ গাইতে শুরু করল। বরবধু দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে তাদের মাথার ওপরে লাজ বর্ষণের মতো রঙিন কাগজের টুকরো বর্ষিত হতে লাগল। এরপর বরবধু একে অন্যের মুখে মিষ্টি তুলে দিলো। এভাবেই বিয়ের এক প্রস্থ বিধি সমাপ্ত হলো।

এরপর অন্য এক ঘরে বসল জমজমাট মেহফিল। তিন তরুণী পোশাকে, সাজসজ্জায় যাদের অত্যাধুনিক বলা চলে তারা নাচ গান করে আসর জমিয়ে তুলল। তেহরানের প্রসিদ্ধ গায়ক আলিরজার গান আর তার বাদক শাহবাজীর সেতারের মূর্ছনায় ঘর ভরে উঠল। ওস্তাদি গানে আলাপ এক অপরিহার্য বিষয়। একে তো কর্কশ ইরানী আলাপ তার ওপর পুরুষ কণ্ঠ, আমার অসহ্য লাগছিল। তবে আলাপের শেষে হাফিজ খৈয়ামের গান সুন্দরভাবে গাওয়া হয়েছিল। ঘরের মধ্যে যত লোক বসতে পারে তার তিনগুণ লোক জমা হয়েছিল। তার ওপরে ছিল ধূপের ধোঁয়া। আমার তো প্রায় দমবন্ধ হবার যোগাড়। মেহফিলের পর খানাপিনা, তারপর আবার নাচ। এবার নাচে বরকনেও অংশীদার হলো। সেদিন ছিল ইরানী বর্ষের অন্তিম বুধবার, সন্ধের সময়

ছেলেরা ইরানের প্রাচীন হোলি উৎসব পালন করছিল।

বিয়ের অন্তিম বিধি ছিল দস্তবদস্ত অর্থাৎ পানিগ্রহণ। রাত্রিতে ঘরে বরবধূকে নিয়ে গিয়ে বধূর ভগ্নীপতি দুজনের হাত এক করে দিলো। ইদানীং কালে বিয়ের অনেক পুরানো বিধি আর পালন করা হয় না, যেমন হেনাবন্দী (মেহেদী লাগানো) ইত্যাদি।

পরদিন (১৪ মার্চ) বড়ো ভোজের আসর বসেছিল। কাজার রাজবংশের পুরানো বাড়িটাকে মহম্মদের বাবা হাশিম ইম্পাহানী কিনে নিয়েছিলেন। বহু উৎসবের সাক্ষি সেই বাগানবাড়ি আবার নতুন সাজে সেজেছিল। ছবি, ফুলের টব, বৈদ্যুতিক ঝাড়লিষ্ঠন এবং সুন্দর ইরানী গালিচা দিয়ে বাড়িটাকে সাজানো হয়েছিল। মেহফিলের জন্য একজন নামজাদা নর্তকীকেও আনা হয়েছিল। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ছিল স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে প্রায় একশোর মতো। খাওয়া দাওয়া, নাচগান, হৈ-হুম্রোড় চলল অনেকক্ষণ ধরে। উপস্থিত সমস্ত মেয়েদের মধ্যে ইজ্জত খানমকেই (কনে) সবচেয়ে সুন্দরী লাগছিল এবং তার পিছনে প্রসাধন সামগ্রীরও বড়ো একটা ভূমিকা ছিল। নতুন বধূর নাচও সকলকে মুগ্ধ করেছিল। এরপর বরবধূকে উপহার সামগ্রী দিয়ে অভ্যাগতদের বিদায় নেবার পালা চলল। আমি তো বরের একান্ত সহচর, এবং আমার এই স্বীকৃতি, বর ও কনে উভয় পরিবারের তরফ থেকেই ছিল।

ইরান থেকে বিদায়

৩ মে (১৯৪৪) হিটলার ও গোয়েবলস-এর আত্মহত্যার খবর পেলাম। ৮ মে জার্মানি নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করল। ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে আমার অনিশ্চিত অবস্থা তখনও কাটেনি, তবে এই ঘটনার পর থেকে দূতাবাস কর্মীদের কথাবার্তায় কিছু আশার বাণী শোনা যাচ্ছিল। এদিকে আমার পক্ষে আর তেহরান থাকাও সহজ ছিল না। খরচের ব্যাপার তো ছিলই তার ওপরে ছিল এখানকার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমার ইরানে থাকার অনুমতি পত্রের নবীকরণ করানোর ব্যাপার। ২৬ মে সোভিয়েট কনসাল অফিসে গেলাম। জানলাম ভিসার অনুমোদন এসে গেছে, ওইদিনই পাসপোর্টে ছাপও দিয়ে দিলো। ইনট্যুরিস্ট (সোভিয়েট ভ্রমণ নিয়ামক সংস্থা)-এর মাধ্যমে জানতে পারলাম যে তেহরান থেকে মস্কো পর্যন্ত বিমান ভাড়া ছয়শো ষাট তুমান অর্থাৎ সমপরিমাণ ভারতীয় মুদ্রা। একজন যাত্রী বিনা মাসুলে যতটা মাল নিতে পারে তার অতিরিক্ত মাল থাকলে কিলোগ্রাম প্রতি মাসুল ছয় তুমান। বিনা মাসুলে একজন যাত্রী ষোলো কিলোগ্রাম মাল নিতে পারে। আমার মালপত্রের পরিমাণ দেখে আন্দাজ করলাম যে নশো তুমান অতিরিক্ত মাসুল দিতে হতে পারে। আমি যখন রাশিয়া যাবার ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছি, এমন সময় আরেকটি বাধা এসে সামনে দাঁড়াল। এদেশ থেকে নির্গমনের ছাড়পত্র আনার জন্য বিভাগীয় দপ্তরে গেলাম। তারা আমাকে ইরান সরকারের রাজস্ব বিভাগ থেকে একটা স্বীকৃতি পত্র আনতে বলল, যাতে লেখা থাকবে যে এই দেশে থাকার সময় আমি যা কিছু উপার্জন করেছি তার জন্য সরকারের প্রাপ্য আয়কর যথাবিহিত মিটিয়ে দিয়েছি। গোলাম রাজস্ব বিভাগে, তারা বলল, দরখাস্ত জমা দিন। আমরা বিষয়টা তদন্ত করে দেখব, সময় লাগবে। এদিকে সব কিছু ঠিকঠাক ভেবে আমি ইনট্যুরিস্টের কাছ থেকে মস্কো পর্যন্ত বিমানের টিকিটও কেটে ফেলেছি। ৩১ মের মধ্যে ইরান ছেড়ে চলে যাব,

এমনই পরিকল্পনা। কিন্তু সবদেশের আমলাতন্ত্র যেমন শম্বুক গতিতে চলে, ইরানও তার ব্যতিক্রম নয়, বরং গতি আরো শ্লথ। এদিকে আমার ইরানে থাকার ভিসার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তারপরে থাকতে হলে ভিসার সময়সীমা বাড়াবার আবেদন করতে হবে, সে আর-এক ঝামেলা। ব্রিটিশ দূতাবাসের রিজিডি সাহেব কনসাল জেনারেলের হয়ে প্রমাণপত্র লিখে দিলেন যে এদেশে থাকাকালীন আমি অর্থোপার্জনের জন্য কোনও কাজকর্ম করিনি। রাজস্ব বিভাগ বলল, ইংরাজি চিঠিতে হবে না, আমাদের সব কাজকর্ম ফারসিতে হয়। আপনি চিঠির ফারসি তর্জমা করে আনুন। তর্জমা নিয়ে পরদিন দৌড়লাম রাজস্ব বিভাগে। প্রত্যেকদিন তিন তিনটে অফিসে ধর্না দিতে হচ্ছিল। একটাই রক্ষা যে সাত মাস এদেশে থাকার ফলে ভাষার বাধাটা ছিল না। অবশেষে সমস্ত ঝামেলা মিটতে মিটতে বিকেল হয়ে গেলো, বিমান ভাড়া চুকিয়ে বাকি যা তুমান বেঁচেছিল, তা রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া অর্থহীন, অতএব সেগুলোকে এদেশেই খরচ করে ফেলতে হয়। সোভিয়েটে ব্যয় নির্বাহের জন্য একশো পাউন্ডের চেক আলাদা করে রাখাই ছিল। অতএব উদ্বৃত্ত তুমানে একটা ওভারকোট ও অন্য কিছু কেনাকাটা করলাম।

৩রা জুন, বিমান ছাড়বে কিন্তু মালপত্র বুক করার কাজটা দুদিন আগেই সেরে রাখতে হবে, সেটাই নিয়ম। ষোলো কিলোগ্রাম বাদ দিয়ে অতিরিক্ত একান্ন কিলোগ্রামের জন্য তিনশো একশ তুমান মাসুল লাগল। জিনিসপত্রের মধ্যে অর্ধেক ছিল এমন জিনিস যা আগে জানলে সঙ্গে নিতাম না। প্রথমে ২ জুন বিমান ছাড়ার কথা ছিল, কিন্তু আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় তা একদিন পিছিয়ে যায়। আমার কাছে তখনো পঞ্চাশ তুমানের মতো থেকে গিয়েছিল। বিমান যাত্রা একদিন পিছিয়ে যাওয়ায় আমাকেও একদিন অতিরিক্ত তেহরান বাস করতে হলো।

৩ জুন খুব ভোরে ইন্ট্যুরিস্টের গাড়ি এসে আমাকে তুলল। আব্বাসী ঘর থেকে জিনিসপত্র বের করে গাড়িতে রাখল। তার সঙ্গে সাত মাসের পরিচয়। তার দোষ গুণ সবই আমার জানা। কিন্তু আমার চোখে তার দোষের চেয়ে গুণের পরিমাণ বেশি করে ধরা পড়েছিল, সেজন্য বিদায় নেবার সময় আমাদের দুজনেরই খুব কষ্ট হয়েছিল। বিমানবন্দর শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। সেখানে পৌঁছানোর পর এজেন্সির পক্ষ থেকে চা দেওয়া হলো। এরপর চলল বিমানে মাল বোঝাইয়ের কাজ। এটা কোনো সাধারণ যাত্রীবাহী বিমান ছিল না। এটা ছিল সামরিক বিমানের ধাঁচে একটি বিমান যাতে যাত্রী এবং মাল উভয়ই বহন করা যায়, এটাই আমার প্রথম বিমান যাত্রা, যার সম্বন্ধে এর আগে অনেক ভালোমন্দ কথা শুনেছি। বিমানের ভেতরে দুধারের দেয়াল ঘেঁসে দুসারি কাঠের লম্বা বেঞ্চ, যেখানে আমরা পনেরো জন যাত্রী গিয়ে বসলাম। বিমানে ত্রিশ জন যাত্রীর জন্য জায়গা ছিল, কিন্তু যাত্রীসংখ্যা ছিল তার অর্ধেক। যেখানে অত কাঠখড় পুড়িয়ে ভিসা সংগ্রহ করতে হয় সেখানে যাত্রীসংখ্যা কম হওয়াটাই স্বাভাবিক। যাত্রীদের অধিকাংশই ছিল মস্কোর বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাসের কর্মচারী। তাদের সঙ্গে মালপত্রও ছিল যথেষ্ট। আমার তো মনে হয় যাত্রী সংখ্যা পূরণ না হলেও মালপত্রের জন্যই বিমান তার ওজন বহনের পূর্ণক্ষমতায় পৌঁছে গিয়েছিল। বিমানের মধ্যেই সমস্ত যাত্রীদের পাসপোর্ট ভিসা আর-একবার পরীক্ষা করার পর বিমান ছাড়ল। বিমানের শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাবার অবস্থা, দেখতে দেখতে বিমান ইরানের মাটি, পাহাড় প্রভৃতি ডিঙিয়ে মস্কোর পথে ককেশাসের দিকে উড়ে চলল।